নবজীবন

৪র্থ ভাগ

মাঘ ১২৯৪

কলিকাতা

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } মাঘ ১২৯৪। { ৭ম সংখ্যা।

ভালবাসাবাসি।

(বাসন্তী গীতি)

প্রকৃতি গো—প্রকৃতি গো একি রীতি তোর!
যথা যাই এক ছাঁদ,
এক ঢালা, এক বাঁধ,
একই বাসন্তি তানে, বিশ্ব খানি ভোর;
অণু হ'তে হিমাচল,
শিশির, সাগর জল,
একই নিয়মে সব করিছে প্রয়াণ,
একটু ফুলের কোলে
"রজ-রাজ" হেলে,দোলে!
কে বুঝে এ লীলা খেলা—নিগূঢ় সন্ধান।
কা'র কাছে বল্ বল্,
শিখিলি এ প্রেম-ছল,
যা'র গুণে, নভে ভবে, করে দিলি মিল্!
কেন বা তপন করে,
কমলের হাসি ঝরে,
কোমলে কঠিনে কেন লেগে গেল খিল্!

চকোর চাঁদের লাগি
সারা নিশি থাকে জাগি !
কে দিল প্রেমের রাগ পাখীর পরাণে !
ক্ষুদ্রপ্রাণে রবি কর
ধরিয়ে, শিশির থর
হরষে মরিয়া যায় প্রেম-আলাপনে !
বুঝি না এ কোন খেলা ?
কেমন প্রেমের মেলা,
ছোট বড় এক ছাঁদে বুক বেঁধে যায়,
চাতক "দে জল" যাচে,
মেঘেতে বিজলি নাচে,
বসন্ত আসিবে বলি, পিক্ অই গায় !
মাধবী সোহাগে হায় ?
সহকারে মিশে যায়
পতঙ্গ আপনা ভুলি, অনলেতে ধায়,—
প্রেমের এ লীলা খেলা, বুঝা বড় দায় !
নির্ঝর ঝরিয়ে শেষে,
তটিনীর কোলে মেশে,
আবার তটিনী ধায় সাগরের পানে,
সকলি আপনা ভুলি,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
বেহুস—বিভোর সবে, পরস্পর টানে !
ফুল তোর একি ছাঁদ,
নভে ভবে দিলি বাঁধ,
কঠিন গাছেরে তুই, দিস্ চারু আলা,
হেরে তোর কম কায়
পাষাণ (ও) গলিয়া যায়,
ভাবে শেষে—"মানে মানে কেন হনু কালা ?"
পরিতাপ হৃদে উঠে,
অমনি সলিল ছুটে,

অভিমানী পাষাণের বুক্‌খানি চিরি;
ওরে ফুল কিবা তোর
প্রেমের কোমল ডোর!
বাঁধিয়াছ এ সংসার, সেই ডোরে ঘিরি।
যেখানে ফুটিস্ তুই
কিবা মরু—কিবা ভুঁই,
স্বরগের শশী তারা, দেয় সেথা চুম্,
মানুষ, আকুল প্রাণে,
তোরে রে হৃদয় টানে,
বুকে করি, দুখ ভুলি সুখে যায় ঘুম্।
প্রকৃতি গো, জননী গো,
জগতের জুড়নী গো—
এই ভরা ভোরে, লইনু তুহাঁরি কোল্,
ফেলো না শিশুরে ভুমে,
তুলে লও চুমে চুমে,
দাও দাসে, জননী গো, মৃদু মৃদু দোল!
প্রকৃতি গো তোর ধারা,
দেখে শুনে দিশে হারা!
আদি নাই—অন্ত নাই,—ধীরা স্রোতস্বতী,
মহান্ তুহাঁর তান্,
মহান্ তুহাঁর গান,
প্রেমের পাথার লীলা সুন্দরে মহতী।
সাধে কি "বিবর্ত্ত—বাদ"!—
বিজ্ঞানের অবসাদ!
অবাক্ জ্ঞানের কণা, প্রকৃতি ছটায়!
ধন্য ধন্য জননী গো,
কৈলাশের কামিনী গো!
প্রেম প্রবাহিণী তোর চরণে লুটায়!
স্বর্গ মন্দাকিনী-ধার
মন্দার-কুসুম হার,

রজত চন্দ্রমা রশ্মি, পূত পরিমল,
প্রেম বিনে সকলিত গরল—গরল।
প্রেমের কুসুম তুলে,
যেই জন সেই ফুলে,
পূজে নাই একদিন সোনার পুতুল,
ভালবাসা—ভালবাসা,
ভবের ভরসা, আশা—
বুঝে নাই যেই জন, সেই রে বাতুল;
শরীর মাটির দেহ,
মিছার অসার গেহ,
রেখে দাও ছুটাছুটি পোড়া অভিমান,
প্রকৃতির দেখ খেলা,
মানুষে মানুষে মেলা,
একের লাগিয়ে কাঁদে, অপর পরাণ।
দুটী প্রাণ একাকার,
নদ নদী একধার,
দুটী ফুল এক বোঁটে, দুলিবে দুদুল.
একই দোঁহার তান,
একই দোঁহার গান
একই বাতাসভরে দুজনা আকুল;
এক ভালবাসা বাসি,
এক কান্না, এক হাসি,
একই দোলার দোল, একই ঝঙ্কার,
মিশে যায় লতা গাছ,
পাতায় পাতায় নাচ,
মূলে জড়া জড়ি—নাহি ছাড়া ছাড়ি. আর;
স্বরগের সুধা রাশি,
মরতে পড়েছে আসি.
তাই সে কুসুম হাসে, মাতায়ে কানন;—
যাব না উহার কাছে,

শ্বাস লাগি গলে পাছে!
স্বরগের বালা ওটি, নিখুঁত্ আনন;
না— উহারে হৃদয়ে ধরে,
শিখে নিব ভাল করে,
কেন নিতি ফুটে বনে, ছড়াইয়া হাসি,
শিখাবে ও ভালবাসা,
প্রাণে দিবে প্রেম আশা,
গাইব বাসন্তীগীতি, ভাল বাসা বাসি॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

৫।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্॥ ১৬।

পদচ্ছেদঃ।—তৎ-পরং, পুরুষখ্যাতেঃ, গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্।

পদার্থঃ।—তৎপরং তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ বৈরাগ্যাৎ) পরং উৎকৃষ্টং অথবা তৎ বৈরাগ্যং, পরং উৎকৃষ্টং,পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষঃ, আত্মা, তস্য খ্যাতিঃ জ্ঞানং তস্মাৎ আত্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোঃ, গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ গুণেভ্যঃ, গুণেষু গুণানাং বা বৈতৃষ্ণ্যম্ তৃষ্ণাবিরহঃ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ।

অন্বয়ঃ।—পুরুষখ্যাতে গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ-পরম্, তং,পরমিতি বা।

ভাবার্থঃ।—বৈরাগ্যং দ্বিবিধং, একং বিষয়-বৈরাগ্যম্। অন্যচ্চ গুণ বৈরাগ্যম্। তত্র প্রথমং তাবৎ পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে নিরূপিতং অত্রান্ত্যং গুণ বৈরাগ্যং নিরূপ্যতে। পুরুষখ্যাতেঃ আত্মসাক্ষাৎকারাৎ, বিষয়-দোষদর্শিনঃ জনস্য পুরুষদর্শনাভ্যাসাদিত্যর্থঃ গুণেভ্যঃ কার্য্য-সহিতেভ্যঃ সত্ত্বাদিগুণেভ্যঃ যৎ বৈতৃষ্ণ্যং নিষ্পৃহত্বং, বিরক্ততেতি যাবৎ তদপি বৈরাগ্যম্, তচ্চ তৎপরম্

পূর্ব্বস্মাদুৎকৃষ্টম্, অন্যে তু তদিতি বৈরাগ্যম্ পরামৃশ্যতে তেষাং মতে পুরুষখ্যাতে-গুণ বৈতৃষ্ণ্যং তৎ (বৈরাগ্যম্) তচ্চ পরমিত্যন্বয়ঃ। পুরুষপদমত্র-বুদ্ধের-প্যুপলক্ষকমিতি বিজ্ঞান-ভিক্ষুস্তথা হি তন্মতে পুরুষখ্যাতে-রিত্যস্য আত্মবয়াঽন্যতর-সাক্ষাৎকারাভ্যাসাদিত্যর্থঃ আত্মদ্বয়ং বুদ্ধি পুরুষদ্বয়ং। শুদ্ধং চিত্তং বৃত্তি-রহিতং যদাত্মনি লীয়তে তদ্গুণ বৈতৃষ্ণ্যমুৎকৃষ্টং বৈরাগ্য-মিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ।—আত্মসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন সত্ত্বাদি গুণ ও তাহাদের কার্য্য হইতে চিত্তের যে বিরক্তি,—তাহাও বৈরাগ্য,উহা পূর্ব্ববৈরাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সমালোচন। এই সূত্রে পর শব্দের ব্যবহার হওয়ায় আমরা এক প্রকার জানিতে পারিতেছি যে, বৈরাগ্য দুই প্রকার (১) পর, (২) দ্বিতীয় অপর। প্রধান এবং অপ্রধান। যদি বল লোকে প্রধানের বিষয় অগ্রে বলিয়া তাহার পর অপ্রধানের কথা বলিয়া থাকে, এ স্থলে সেই লৌকিক রীতির পরিহার করিয়া অগ্রে অপ্রধান এবং পরে প্রধানের কথা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, দুই প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে আবার পূর্ব্বাপরীভাব আছে। একটি অগ্রে না হইলে আর একটি উৎপন্ন হয় না। প্রথমে অপর বৈরাগ্যের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে পর বৈরাগ্যের অধিকারই হয় না। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন "পূর্ব্ব-বৈরাগ্যং পর বৈরাগ্য-হেতুঃ।" পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য পর বৈরাগ্যের প্রতি কারণ। এই নিমিত্তই প্রথমে অপর বৈরাগ্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলেন, পরে হয় বলিয়া উহার নাম পর বৈরাগ্য।

পুরুষখ্যাতি নিবন্ধন (গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র প্রমাণে আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানের পর) যে 'গুণ-বৈতৃষ্ণ্য' ইহার অক্ষরানুবাদ, গুণে নিস্পৃহা বা গুণের উপর বীতরাগ হওয়া, গুণ এবং বৈতৃষ্ণ্য এই দুইটি কথায় ৭মী তৎপুরুষ বা ৫মী তৎপুরুষ সমাস করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রধানত তিনটি, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই প্রধান গুণ-ত্রয়ের পরস্পর ব্যামিশ্রণে আবার নানাবিধ জ্ঞানাদি পৌরুষ গুণ উৎপন্ন হয়। যখন চিত্ত সেই সকল গুণ হইতে বিরক্ত হয়, তাহাদিগের উপর আর স্পৃহা থাকে না, অথবা তাহাদের অধীন ভাব পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে, চিত্তের সেই অবস্থার নাম 'গুণ বৈতৃষ্ণ্য'। আত্মার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ জানিতে পারিলে চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনের মধ্যে কোন গুণের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, তখন উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং

নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করে। এই সূত্রের ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

" দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষ দর্শনাভ্যাসা ত্তচ্ছুদ্ধি-প্রবিবেকাপ্যায়িত বুদ্ধি গুণেভ্যোব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মকেভ্যোবিরক্ত ইতি তৎদ্বয়ং বৈরাগ্যম্। তত্র যদুত্তরং জ্ঞান প্রসাদ-মাত্রং যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্ট-পর্ব্বোভব-সংক্রমো, যস্যা—বিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে, মৃত্বা চ জায়ত ইতি জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্।"

দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক এই উভয় বিধ বিষয়ের দোষ মনুষ্য দেখিয়া তাহাতে বিরক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার পর আত্ম স্বরূপ দর্শন ও বারম্বার আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করত আত্মা বিশুদ্ধ (নির্ম্মল) ও অপরিণামী এইরূপ বিবেক দ্বারা বুদ্ধি আপ্যায়িত (পরিতৃপ্ত) হইলে সত্ত্বাদিগুণ ও তাহাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত (স্থূল সূক্ষ্ম) কার্য্য-কলাপের উপর গতস্পৃহ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ প্রাকৃতিক কার্য্যে আর তাহার আসক্তি থাকে না। তাদৃশ আসক্তি-শূন্যতার নামই গুণ-বৈতৃষ্ণ। অতএব দুই প্রকার বৈরাগ্য (প্রথম এবং পর,) তাহার মধ্যে পর (দ্বিতীয় বা উত্তর কাল জাত) বৈরাগ্য জ্ঞানের প্রসাদ মাত্র, জ্ঞানের সম্পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য স্বরূপ। ভাষ্যকার নিজেই জ্ঞান-প্রসাদ শব্দের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অর্থ করিয়াছেন; অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত জ্ঞান—তাহার পর আর কোন বস্তু জানিতে বাকী রহিল বলিয়া একটা স্পৃহা থাকে না, জ্ঞান ঐ স্থানেই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। যাহার উদয় হইলে প্রত্যুদিত-খ্যাতি অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বদর্শী যোগী মনে মনে বিবেচনা করেন, যাহা পাই-বার তাহা পাইয়াছি, আর আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, যে সকল ক্লেশ দূর করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহারা দূর হইল; এবং যন্নিবন্ধন জন্ম মরণ ধারা অবি-রত প্রবাহিত হইতে ছিল, সেই শ্লিষ্ট পর্ব্ব (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ভব সংক্রম (সংসারে যাতায়াত) নিবৃত্ত হইল। এই বৈরাগ্য আর কিছুই নহে, জ্ঞানেরই পরা-কাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এও ত বড় মজার কথা, মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রে লিখিলেন " গুণ বৈতৃষ্ণ্য " গুণেতে তৃষ্ণার অভাব বা নিস্পৃহতা, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, উহা আর কিছুই নয়, চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ। ইহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? বার্ত্তিককার

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার উত্তর এইরূপ করিয়াছেন " ইতি চেৎ ন শব্দভেদেঽপ্যর্থাভেদাৎ নহ্যভাবোঽস্মন্মতেঽতিরিক্তোঽস্তি,অধিকরণস্যাবস্থা বিশেষস্যৈবা-ভাবত্বাৎ, তথাচ চিত্তস্যৈব তাদৃশী জ্ঞানবস্থৈব তৃষ্ণাবিরহ ইতি অপিচ ভবতু বৈতৃষ্ণ্যমেব বৈরাগ্যং তথাপি জ্ঞান প্রসাদেনৈব বৈতৃষ্ণ্যলাভো বিশেষোঽনুমীয়ত ইতি লিঙ্গলিঙ্গিনো রভেদাপচারাৎ সূত্র ভাষ্যয়োর্ন বিরোধঃ"। ইতি।

একথা বলিও না, কারণ তুমি দুটা দুই রকম শব্দ দেখিয়া ভয় পাইতেছ মাত্র, একটু তলাইয়া বুঝিলেই বেশ জানিতে পারিবে যে উহাদের একই তাৎপর্য্য। দেখ আমাদের মতে অভাব নাম একটা অতিরিক্ত পদার্থ নাই, আমরা বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি, অতএব চিত্তের উক্তরূপ জ্ঞানাবস্থাকেই আমরা তৃষ্ণা বিরহ বলিব। যদি অভাব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হয়,তাহা হইলেও তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে জ্ঞানের প্রসাদ চিত্তের তাদৃশ বৈতৃষ্ণ্য বিশেষের অনুমাপক। তাহা যদি হয়, তবে প্রাচীন একটা নিয়ম আছে " অনুমাপক ও অনুমেয় এই উভয় অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অতএব সেই নিয়মানুসারে গুণ বৈতৃষ্ণ্যের অনুমাপক জ্ঞান প্রসাদের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অর্থ, এইরূপ আত্মা প্রসাদ যাহা চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্যের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান প্রসাদ হইলে চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অবশ্যই উৎপন্ন হয়, কখনই ব্যভিচার ঘটে না।

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রকার বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেও মনুষ্য যোগী হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নিখিল চিত্ত বৃত্তির প্রসরাবরোধ বা কার্য্য নিবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। সমুদ্র যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গ ভঙ্গে টলটলায়মান, মনুষ্যের চিত্ত, বৃত্তি ভরে ঠিক সেইরূপ। সমুদ্রের ঢেউ-এরমত ইহাতে প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বৃত্তি নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, খেলিতেছে, আবার আর একদল বৃত্তিকে অবকাশ দিয়া (তাহাদের পথ মুক্ত করিয়া) আপনি আপনিই লীন হইতেছে। এই অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে বৈরাগ্যের উক্তি হইয়াছে তাহা দ্বারা কতিপয় মাত্রের নিরোধ সম্ভাবনা, কারণ সে বৈরাগ্য বিষয়-বিতৃষ্ণা,বিষয়ে নিস্পৃহতা বা বীতরাগ হওয়া। বিষয় শব্দের অর্থ স্ত্রী, অন্ন, পানীয় অথবা এক কথায় বলিতে হইলে, সমুদয় ভোগ্য জাত এবং ঐশ্বর্য্য— প্রভুতা, সামর্থ্য ও সম্পৎ; তাহা হইলেই হইল, অভিলষণীয় বস্তুর নাম বিষয়; যাহা লোকে চায় তাহার নাম বিষয়। আমাদের

চাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সুখ হইলেও চাওয়াটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখের উপকরণ সামগ্রীরই ঘটিয়া থাকে। কারণ সুখ মনের একটী বৃত্তিমাত্র, অন্যের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উহা উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত সুখোৎপাদক বস্তুদিগকেই আমরা চাই। সাধারণত সুখের উৎপাদক বস্তুদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাল খাওয়া ভাল পরা প্রভৃতি, ভোগ্যবস্তুসকল; দ্বিতীয় ঐ সকল ভোগ্যবস্তুর সম্পাদক প্রভুত্ব, সামর্থ্য এবং সম্পৎ। সুতরাং একমাত্র সুখ মুখ্য অভিপ্রেত হইলেও সাধারণত চাওয়াটা দুই রকমের ঘটে; "ভার্য্যাং দেহি, ধনং দেহি, পুত্রং ভগবত্তি দেহি মে।" ভোগ্য বস্তু ও তাহার সম্পাদক প্রভুত্বাদি বিষয়ে; ঐ দ্বিবিধ চাওয়ার বস্তুই—বিষয়। বিষয়গুলি আবার ঐহিক পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ; ঐ সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মাইলে আমাদের কাম লোভ প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির নিরোধ হইতে প্যারে বটে, কিন্তু যাবদীয় বৃত্তির নিরোধ হয় না।

যদি বল,পুরুষের বৃত্তিমাত্রই স্বার্থসাধনেচ্ছামূলক। যদি সেই মূলের উচ্ছেদ হয়, তবে শাখা পল্লব ফল ফুল ইত্যাদি সকলেই সেই সঙ্গে শুষ্ক হয়, তাহাদের নাশের নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র উপায় করিতে হয় না। যদি অপর বৈরাগ্য দ্বারা সমগ্র বৃত্তির ছেদ সম্ভব হয় তবে পর বৈরাগ্য নিষ্প্রয়োজন।

মোটামুটি দেখিলে ঐরূপ বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে কাম ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্বেষ, মদ মাৎসর্য্য ইত্যাদি বৃত্তির লোপ হইলেও, মানুষ মাটির মানুষের মত নিশ্চেষ্ট জড়ভাব প্রাপ্ত হইলেও চিত্ত একেবারে বৃত্তি শূন্য হয় না; কারণ বিষয় বিতৃষ্ণার সহিত জ্ঞান শক্তির লোপ হয় না। আমার ইচ্ছা নাই, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার চক্ষুর দর্শন শক্তির লোপ হয় নাই, আমার সম্মুখে যাহা আসিতেছে তাহাতেই চক্ষু পড়িতেছে, আমি তাহাদিগকে যে ভাবেই গ্রহণ করি, চক্ষু দ্বারা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছি। এইরূপ বিষ ও অমৃতের স্বাদ আমার নিকট তুল্য হইলেও তাহাদের একটা স্বাদ অবশ্যই অনুভব হইবে। এইরূপ কাণে শ্রবণ করি, আর ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করি। এক্ষণে দেখ এতগুলি কাজ যখন নির্ব্বাহ হয় তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় ইহা আর কিরূপে বলা যায়? এখানে এইটুকু সার কথা বুঝিতে পারিলেই সকল বিষয় খোলাসা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি বৃত্তি শব্দ চিত্তের অবস্থান্তর বা পরিণাম বুঝা যায় ঐ চিত্তের পরিণাম গুলি যেমন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ঘটে, তেমনি চিত্তের উপাদান ভূত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারেও উৎপন্ন হয়। অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জন্য, আর কতকগুলি গুণ জন্য! পূর্ব্বোক্ত প্রথম বৈরাগ্য দ্বারা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জাত কতকগুলি বৃত্তির লোপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গুণোৎপন্ন বৃত্তির লোপ হয় না। যতদিন ত্রিগুণাত্মক মোহ বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন "আমার" "আমি" ইত্যাদি বোধ থাকিবে ততদিন ত্রিগুণোৎপন্ন বৃত্তির অধিকার থাকিবে; গুণের উচ্ছেদ না হইলে আর উহাদের লোপ হইবে না। অপিচ—

যতক্ষণ চিত্তের একটি মাত্র বৃত্তি অবস্থান করিবে ততক্ষণ অবধি চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না। অতএব যদি সেই অবস্থায় আর কোন বৃত্তির স্বীকার নাই কর, কিন্তু তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে লোকের ইচ্ছা লোপের সহিত আত্মজ্ঞানের লোপ হয় না, নিশ্চেষ্ট বা সচেষ্ট, ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ যে ভাবেই থাকি "আমি" এইরূপ একটা বোধ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলেই চিত্ত সবৃত্তিক হইল। যতক্ষণ অবধি আমি বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণ অবধি চিত্ত সবৃত্তিক। আমি এই বোধ মোহ বা অবিদ্যামূলক। সেই মোহ বা অবিদ্যা আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। কাযেই চিত্তকে একেবারে বৃত্তি শূন্য করিতে হইলে অবিদ্যা বা মোহের হাত হইতে আপনাকে মোচন করা আবশ্যক, আমার আমিত্বকে বিস্মরণ করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। আমার আমিত্বের উপর বিতৃষ্ণ হইতে চেষ্টা করাই প্রধান কার্য্য। উহা কিরূপে সাধিত হয়, তাহা মণিপ্রভা নামক বৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে।

বিষয় দোষ দর্শন নিবন্ধন চিত্তের বশীকার সংজ্ঞা নামক প্রথম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহার পর গুরুমুখ এবং শাস্ত্রের বচন হইতে পুরুষের (জীবাত্মার) স্বরূপ জানিতে পারে; জানিতে পারে আত্মা বিশুদ্ধ এবং অপরিণামী; তখন বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া সেই আত্মদর্শনে আগ্রহ জন্মায়, আত্মদর্শন করিবার সময় ধর্ম্মমেঘ নামে চিন্তার উদয় হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ এবং তমোগুণরূপ মল অপগত হয়, খাটী সত্ত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত অতিশয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পূর্ণ নির্ম্মল চিত্তে স্বভাবত বিশুদ্ধ

চৈতন্য-রূপী পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত ও পুরুষ এক হইয়া যায়, আমার আমিত্ব দূর হয়, গুণত্রয়েয় বন্ধন উচ্ছেদ হয়, চিত্ত বৃত্তি শূন্য হয়।

*চিত্তে আত্মার প্রতিবিম্ব হওয়াতে উহা জ্ঞান বটে, কিন্তু চরমসীমা প্রাপ্ত জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কিছুরই পরিচ্ছেদ নাই। উহা আমার আমিত্ব দূর করিয়া জড়ে ও চৈতন্যে প্রভেদ করিয়াছে। ত্রিগুণ মূলক আমিত্বের মোহিনী শক্তির ছেদ হয় বলিয়া উহাকে গুণ বৈতৃষ্ণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বৈরাগ্যদ্বয়কে যথাক্রমে বিষয় বৈরাগ্য এবং গুণ বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যতদিন অবধি আর কিছু না থাক্‌ আমার আমিত্ব এইটুকু মাত্র থাকিবে, তত দিন এ চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির নয়, চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিতে হইলে বিষয় বৈরাগ্যের মত গুণ বৈরাগ্যেরও আবশ্যক।

বিলাতী জুয়াচুরি।

ভুক্তভোগীর লেখা হইতে গৃহীত।

লণ্ডনের বণ্ডষ্ট্রীটে আমাদের দোকান। অন্যান্য দোকান অপেক্ষা আমাদের দোকানে অনেক বহুমূল্য ও পছন্দসই হীরা জহরত থাকিত বলিয়া আমাদের দোকানের খুব পসার ও নামডাক ছিল, অনেক বড় বড় ধনী লর্ড আমাদের দোকান হইতে জড়াও গহনাপত্র ক্রয় করিত। এ স্থলে বলা উচিত আমি নিজে দোকানদার নহি, তবে আমি অনেক দিন এ দোকানে কাজ করায় আমার এ কাজে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে বলিয়া ও বহুদিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতেছি বলিয়া এখানে একপ্রকার আমি কর্ত্তার মত হইয়া আছি। জহরতের দোকানে প্রায় চুরি জুয়াচুরি হয় বলিয়া আমাদের প্রদর্শনী গৃহে (show room) কিছু বেশী পাহারার আঁটা আঁটি, খরিদ্দারের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বেচা কেনা করিয়া থাকি, আর আমাদের বড়

বিলাতী জুয়াচুরি।

কর্ত্তার বিশেষ নিয়ম এই যে বিশেষ পরিচিত না হইলে আমরা কাহাকেও ধারে কোন জিনিস বেচি না, বা কেহ কোন ব্যাঙ্কের উপর টাকার বরাত দিলে যতক্ষণ না সে টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ বিক্রীত দ্রব্য আমরা ক্রেতাকে ছাড়িয়া দিই না। এক কথায় অন্যান্য দোকানদারদিগের অপেক্ষা আমরা বেশী সতর্ক ও হিসাবী।

সচরাচর এই সকল চোর জুয়াচোরেরা বড় বড় জুড়ী গাড়ি করিয়া এরূপ জমকাল ভাবে দোকানে আসিয়া থাকে যে হঠাৎ ইহাদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ হয় না ও সন্দেহ করিতে সাহস হয় না। এছাড়া বিলাতে সস্ত্রীক লোককে সকলে অধিক বিশ্বাস করে বলিয়া অনেকেই প্রায় একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লয়। এই যুবতীর বেশভূষা অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদিগের ন্যায়, কাহার সাধ্য মনে করে যে ইহারা দোকানে চুরি করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সকল সুন্দরী বেশভূষালঙ্কৃতা যুবতীই এই সকল কার্য্যের প্রধান অংশীদার, ইহাদের সাহায্যেই জুয়াচোরেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় সহজে বিনা বাধায় সম্পন্ন করে। জুয়াচোরেরা দোকানে যাইয়া এই স্ত্রীলোকদিগের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহে যেন তিনি সম্প্রতি এই যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা শীঘ্র তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কখন কখন কেবল স্ত্রীলোকেরাই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এইরূপ ছদ্মবেশে ইহারা দোকানে প্রবেশ করিয়া এজিনিস ওজিনিস দেখিয়া কিছু পছন্দ না হওয়ায়, কিছু ক্রয় না করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই দোকান হইতে কোন একটা দামী অলঙ্কার এই মাত্র খোয়া গিয়াছে। ইহাদের এমনি হাত সেট্! কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও নিপুণ ব্যবসায়ী; তাহারা দোকানে যাইয়া চুরি না করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া চুরি করে। ইহারা দোকানে আসিয়া জিনিস পছন্দ করিয়া দোকানদারকে একটা হোটেলের বা অপর কোন বাটির ঠিকানা বলিয়া দেয়, যে তাহার সেই ক্রীত জিনিশ দোকানের কোন লোক মারফত পাঠাইয়া দিলে তাহার হস্তে মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। দোকানদার সেই হুকুমমতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দোকানের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা সেই জিনিস পাঠাইয়া দেয়, কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি রিক্ত হস্তে ও শুষ্ক মুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই সকল জুয়াচোর ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর দোকানদারেরা খরিদদারদিগের প্রতি দুই প্রকারে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

প্রথম, তাহাদের হাতের প্রতি, দ্বিতীয়, তাহাদের কথোপকথনের ভাষার প্রতি। এই সকল চোর জুয়াচোরদিগকে প্রায় ধরা পড়িয়া জেলে যাইতে হয়; সেখানে হাতে করিয়া শ্রমজীবীর কঠিন কাজ করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগের হস্ততল প্রায় কঠিন কর্কশ হইয়া পড়ে; কোন ভদ্রলোকের এরূপ হয় না; ইহাদিগকে ধরিবার এই এক উপায়। তৃতীয়, ইহারা যত কেন ভদ্রলোক সাজুক না, যত কেন ভদ্র ভাষায় কথা কহুক না, ইহাদের ভাষায়, কথার প্রণালীতে, গলার স্বরে এরূপ একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহাতেই দোকানদারের ইহাদের উপর সন্দেহ জন্মে, সুতরাং তাহারা সতর্ক হয়। কিন্তু অধিকাংশ চোর এরূপ কৌশলী যে দোকানদারদিগের এই সকল সতর্কতাকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। এক্ষণে আমার নিজের কথা বলা যাউক।

একদিন নিয়মিত সময়ে আমি দোকানে আপন কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমাদের বড় কর্ত্তা এসে আমার কাণে চুপি চুপি বল্লেন "তুমি প্রদর্শনী ঘরে গিয়ে দুজন খরিদ্দার আসিয়াছে, তাঁদের পছন্দসই জিনিসপত্র দেখাও, কিন্তু সাবধান; তাঁদের চাউনিতে আমার কেমন সন্দেহ বোধ হচ্চে।" আজ্ঞামাত্র আমি তথায় যাইয়া দেখি একজন ভদ্রলোক একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত জিনিসপত্র দেখিতেছেন। ভদ্রলোকটী দেখিতে কিছু কৃশ ও রুগ্ন, আর তাঁহার গলার স্বর কিছু খ্যাতখেঁতে গোছ। ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটি নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র (respirator) রহিয়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার হাঁপানিকাশীর ব্যারাম আছে। সঙ্গের যুবতীটি দীর্ঘাঙ্গী, মুখের উপরিভাগ নব বিবাহিতার ঘোমটা দ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হইল; এক কথায় ইহাদিগের উপর আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না। ইহাঁরা দুইজনে এটা ওটা দেখিয়া শেষ একটি হস্তের ও একটি গলার অলঙ্কার দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করায়, আমি একে একে অল্প ও বহুমূল্যের নানাবিধ উক্ত দুই প্রকার অলঙ্কার দেখাইতে লাগিলাম। ভদ্রলোকটি দুই চারিটি অলঙ্কার দেখিয়া আমাকে বলিলেন, "বেশী দামী জিনিসের কোন প্রয়োজন নাই, অল্প দাম অথচ বেশ পরিষ্কার গড়নের জিনিস দেখাও।" আমি তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চাশ হইতে ৫০০০ টাকার জিনিস পর্য্যন্ত দেখাইতে লাগিলাম। অনেক

দেখাশুনার পর ভদ্রলোকটি একযোড়া মাঝারি গোচ দামের অথচ বেশ পরিষ্কার কাজ করা হাতের গহনা নিয়ে বলিলেন, 'এই যোড়াটা আমার বেশ পছন্দ হচ্চে, এর দাম কত হবে?' আমি বলিলাম '৬০ গিনি।' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া একটু নাকতোলা গোছ করে বল্লেন, "হাঁ, বালা জোড়াটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু খুব যে ভাল তাও নয়।" ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, 'কেন, তুমিত বলেচ বেশী দামী দরকার নাই। আর এতগুলোর মধ্যে এই যোড়াটাই আমার বেশী পছন্দ হচ্চে।' স্ত্রীলোকটি তাহাতেই সম্মত হইয়া গলার গহনার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বা, কি চমৎকার গড়ন, অতি সুন্দর দেখ্‌তে ত।' আমি খরিদ্দারের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া দোকানদারের দস্তুরমত সেটিও তাঁহার হাতে তুলে দিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁদের ভদ্রলোকের ন্যায় ভাব দেখে আমার সন্দেহটা একপ্রকার দূর হয়ে ছিল, এছাড়া আমার মনিব যে সন্দেহ করে আমাকে এদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটাও আমি একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রীলোকটি গলার গহনাখানি একবার হাতে করে এদিক্ ওদিক নেড়েচেড়ে আবার প্রশংসা করে বল্লেন, "বা, দিব্য জিনিসটি, কি, চমৎকার! বড় সুন্দর কাজ করা, পছন্দসই জিনিস বটে!" সঙ্গী ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীর—এই বারম্বার প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটাও নেবার ইচ্ছা হয়েচে নাকি?' রমণী যেন উল্লসিত হয়ে অথচ লজ্জার খাতিরে বল্লেন, "না না, তবে জিনিসটা ভাল তাই দেখচি।" ভদ্রলোকটি যেন আরো আপ্যায়িত হয়ে বল্লেন, 'তার দোষ কি? কেনাবেচার দস্তুরই এই; চক্ষে ভাল ঠেক্‌লে নিতে হানি কি?' এই কথার পর উভয়ের চারি চক্ষু একবার সম্মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাণে কাণে কি কথাও হইল। তাহার পর আমায় জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম ৫০ গিনি। ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য ভাবে যেন একটু থাকিয়া চোক দুটো বিস্তারিত করে আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন, 'উঃ ওই রত্তি জিনিসের এত দর।' কিন্তু জিনিসটি তাঁহার হাতেই নাড়াচাড়া হতে লাগ্‌ল। আমি একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বল্লেম, 'জিনিসটা ছোট হলেও ওতে যে মুক্তা কটা রয়েচে, ওরূপ মুক্তা সচরাচর পাওয়া যায় না।' এই কথায় ভদ্রলোকটী একটু নিমরাজি হয়ে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটি নিতে সম্মত হলেন। সঙ্গিনী এইরূপ খরিদ করায় বড় আহ্লাদিত হলেন, এবং আমি ভদ্রলোকটিকে জিনিসটি বুঝিয়ে সুজিয়ে দিয়ে দিলুং

বলে আমার প্রতি একবার সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কে এরূপ সুন্দরী যুবতীর সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমিও বিনীত ভাবে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সম্মান রক্ষা করিলাম ও আমি মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিয়া বলিলাম, যে এরূপ বুদ্ধিমতী খরিদদার না হইলে কি আমাদের দোকান চলে? পুরুষ গুলো কেবল শস্তার দিকে যায়। এক্ষণে আমি তাঁদের বুদ্ধিকৌশলে এতদূর মোহিত হইয়াছি ও তাঁহাদের প্রতি এতদূর আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যে দোকানের প্রতি আমার আর চক্ষু নাই।

বিলাতের দস্তুর ক্রেতারা প্রায় সঙ্গে করিয়া টাকা আনে না, দোকানদার ক্রীত জিনিষ পাঠাইয়া দিয়া বাড়ি হইতে টাকা আদায় করে। সেই রীতি অনুসারে আমি বলিলাম 'মহাশয়, আপনাদের এসব কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে?' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিলেন, 'আমরা সঙ্গে করেই নিয়ে যাব, তোমাকে আর কষ্ট করে পাঠাতে হবে না।' আমি এই প্রত্যুত্তরে অপ্যায়িত হয়ে দাম চাইলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় পকেট হইতে এক চেক বই বাহির করিয়া একটা ব্যাঙ্কের নামে এক শত দশ গিনির এক রসিদ লিখে দিলেন। চেক খানি হাতে লইয়া এইবার আমাকে একটু চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করে বলতে হ'ল, 'মহাশয়, আমাদের দোকানের বরাবর নিয়ম আছে যে ব্যাঙ্ক হতে যতক্ষণ না চেকের টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ আমরা কোন জিনিষ খদ্দেরকে ছেড়ে দিই না?' এই সময় আমার মনিবের সেই সতর্ক বাক্য মনে পড়িল, যদিও একজন ভদ্রলোককে এই প্রকার রূঢ় কথা বলাতে আমার একটু লজ্জাবোধ হইল, আমি মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হলেম, কিন্তু ভদ্রলোকটি আমার এই প্রকার সতর্কতা দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সহাস্য মুখে বলিলেন 'বেশ্‌ত বেশ্‌ত, আপনাদের এইরূপ সাবধান হওয়াইত উচিত, বিশেষত আজ কাল যেরূপ দিন কাল পড়েছে।' তাঁহার এই উদারতায় আমি আরো লজ্জিত হলেম, এবং তাঁর প্রতি আমার যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল, সেটুকুও একেবারে গেল। কিন্তু সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির ভাবে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। যাহাই হউক, ভদ্রলোকটি আপনার নাম ও ঠিকানার কার্ড দিয়ে চলে গেলেম। অতঃপর আমাদের একজন লোককে সেই চেকের টাকার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া আমি Show room এর যে যে জিনিষ খুলে তাঁদের

দেখিয়ে ছিলাম, সব মিলিয়ে দেখ্‌লাম ঠিক আছে, কোন গোল মাল হয় নি। এই সময় তাঁদের চেকের টাকা আদায় হয়ে এল, সুতরাং আর আমাদের সন্দেহের কোণ কারণ রহিল না, বরং আমার অকারণে একজন ভদ্রলোকের প্রতি এরূপ সন্দেহ করা হয়েছে, বলে মনে মনে আমি বড় লজ্জিত হলেম; এবং সেই ভদ্রলোকের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় তাঁর ক্রীত অলঙ্কার দুটি পাঠিয়ে দিলাম।

* * * *

ইহার পর একমাস সময় অতীত হইল। একদিন আমি নিয়মিত সময়ে Show room এ বসে আছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বোক্ত যুবতী পুনরায় একা আমাদের দোকানে এসে দেখা দিলেন। এবারও তাঁহার মুখ ঘোমটায় অর্দ্ধাচ্ছাদিত বটে, কিন্তু এবার আর সেই নব প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ সুন্দর মুখশ্রী নাই, এবার তাঁহার মুখ খানি কিছু ম্লান, বিমর্ষ; তাতে যেন অব্যক্তভাবে ভাবে কোন মানসিক দুঃখের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। প্রথমেই দুচার কথায় তাঁর স্বামীর, সেই ভদ্রলোকটির, কঠিন পীড়ার কথা উল্লেখ করে, তাঁর দোকানে একা আসবার ও বিমর্ষ ভাবের কারণ বলে, সেই পূর্ব্বোক্ত গলার গয়নাখানি বার করে বল্লেন, এখানা ভেঙ্গে যাওয়াতে মেরামতের জন্য এবার আমি এসেছি; তাঁর স্বামীর কঠিন পীড়ার কথা শুনে আমি একটু দুঃখিত হলেম ও মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে আশ্বস্ত করে সেই অলঙ্কার খানি মেরামতে স্বীকৃত হলেম। এবার এঁর সহিত কথা বার্ত্তায় ইনি যে যথার্থ একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশিক্ষিতা মহিলা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁর স্বামীর পীড়ার পরিচয়ে বুঝতে পাল্লেম, যে তিনিই আরোগ্যের জন্য এখানে (লণ্ডনে) এসে বাস কচ্চেন। স্ত্রীলোকটি লণ্ডনের একজন খুব বড় নামজাদা ডাক্তারের নাম করে বল্লেন, তিনিই এখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসা কচ্চেন, কিন্তু এখানে এসে অবধি রোগ ক্রমাগত বাড়চে বলে তিনি তাঁকে শীঘ্র স্পেনে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আদেশ করেছেন। ইহার পর তিনি আমাদের দোকানের দুই চাল্লি থানি সাজান গহনার প্রশংসা করাতে আমি তাঁকে দু এক খানি করে গহনা দেখাতে আরম্ভ কল্লেম, তিনি স্বামীর পীড়ার জন্য দুঃখ কর্‌তে কর্‌তে সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কয়েক খানি ভাল কাজ করা দামী জড়ওয়া গহনা পছন্দ করায় আমি তাঁর অনুমতি অপেক্ষায় বলিলাম, যদি

আপনি অনুমতি করেন, তাহলে এগুলি সব কাল আপনার স্বামীর নিকট আমাদের লোক মারফত পাঠিয়ে দি ; যদি এর মধ্যে তিনি আপনার জন্য কিছু গ্রহণ করেন।' স্ত্রীলোকটি আবার এই প্রস্তাবে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করে বিনীত ভাবে বল্লেন, 'আমার স্বামী এসব গহনা পত্র পছন্দ করেন বটে, কিন্তু তিনি এখন যেরূপ পীড়িত, তাতে যে এসময় তিনি কিছু নেবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না, তবে আপনি যখন অনুরোধ কচ্চেন, তখন একবার পাঠিয়ে দেখবেন, যদি এর মধ্যে তিনি কিছু গ্রহণ করেন ; বিশেষ তিনি হীরার আংটি আর ঘড়ির চেন বড় পছন্দ করেন।' এই সব কথা বার্ত্তার পর যুবতী আমাকে অভিবাদন করে প্রস্থান কল্লেন। বলা বাহুল্য তাঁর সুমধুর আলাপে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম।

পর দিন নির্দ্ধারিত সময়ে নানাবিধ অলঙ্কার লইয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসে হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—সঙ্গে আমাদের দোকানের একজন মাত্র দরোয়ান ছিল। যাইবা মাত্রই প্রথমে আমার সহিত হোটেলের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দু এক কথায় আমাদের ক্রেতার পরিচয় পাইলাম। তিনি তাঁহার বড় প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে ইনি yorkshire এর একজন ধনী লোক ও অনেকগুলি কয়লার খনির অধিস্বামী। পীড়িত হইয়া ইনি এখানকার রাজ চিকিৎসক Sir Ealing Dean এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য এসেছেন। ইনি আরো একবার এইজন্য এখানে এসেছিলেন ; ইনি অতি ভদ্রলোক, আর ইঁহার স্ত্রী বড় সতী সাধ্বী, দিন রাত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। হোটেলাধ্যক্ষের মুখে এই পরিচয় পেয়ে আমি পরম আহ্লাদিত হলেম। পরে আমাদের ক্রেতা যে ঘরে ছিলেন আমি সেই ঘরে প্রবেশ কল্লেম। ভদ্রলোকটির স্ত্রী সেই ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর স্বামী তার পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন, আমার প্রবেশ মাত্র তিনি উঠে আমাকে ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা করে,বস্‌তে একখানা চৌকী দেখিয়ে দিলেন, আমি তাহাতে বস্‌লেম, তিনি পার্শ্বের ঘরে তাঁর স্বামীর নিকট আমার আগমন সংবাদ দিতে উঠে গেলেন। এস্থলে বলা উচিত আমার সঙ্গী দরোয়ান হোটেলের দ্বারে আমার প্রতীক্ষায় নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে তাঁহার স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। যে ঘরটিতে আমাদের ক্রেতা মহাশয় ছিলেন, সেটি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গৃহ, দোর জানালাগুলি সব পরদা ঢাকা, ভদ্রলোকটি

এক খানি কৌচে শুয়ে খবরের কাগজ পড়চেন; এবার দেখে বোধ হল যেন তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষায় কাহিল হয়ে পড়েচেন, চোক মুখ বসে গেছে। আমি গৃহে প্রবেশ মাত্র ক্লেশযুক্ত সহাস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমায় অভিবাদন কল্লেন, পরে শিষ্টাচার সহকারে বল্লেন, 'আপনাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড় দুঃখিত হলেম, আমার বড় অসুখ শরীর বলে আমি আপনাদের দোকানে যেতে পারি নে, আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং গিয়ে পছন্দ-সই দুটা একটা অলঙ্কার কিনে আনব। যাহা হউক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করে এতদূর কষ্ট স্বীকার করে আমার জন্য এসেছেন, এজন্য আমি আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিচ্চি, আপনার এই অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত অপ্যায়িত হলেম।' এই প্রথম শিষ্টাচারের পর আমি গহনার বাক্স খুলে তাঁহাকে একে একে দেখাবার উপক্রম কর্‌চি, এমন সময় তিনি পুনরায় বলে উঠলেন, 'অধিক কিছু আনেন্ নিত, আমার এখন অসুস্থ শরীর আমি বেশী জিনিষ পত্র পছন্দ কর্‌তে পারব না, তবে লুসির জন্য অল্প দামের মত দু এক খানা নেব।'

রোগীর শয্যার পার্শ্বে ঔষধের শিশি, গ্লাস, আর একটা বড় গলা উচু পাত্র রয়েছে, বোধ হয়, সেটায় জল বা ঐরূপ কোন জিনিস ছিল। আর একখান ফ্লানেলের চাদরে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল।

আমি একে একে দুই এক খান করে অলঙ্কার তাঁর হাতে তুলে দেখাতে লাগলেম; তিনি দেখিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর মুখের ভাবে বোধ হতে লাগল, যেন এগুল তাঁর তত পছন্দ হচ্চে না, আমি একে একে ভাল ভাল জিনিস বার কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেম। তার পর একযোড়া হাতের অলঙ্কার নিয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'দেখদেখি এ যোড়াটা তোমার হাতে কেমন হয়?' যুবতী সহাস্যবদনে যোড়াটি নিয়ে হাতে দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি আহ্লাদপূর্ণ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে এক গ্লাস সেরি মদ প্রদানের আদেশ কল্লেন, স্ত্রীলোকটি সেরি এনে দিবা মাত্র ভদ্রলোকটি অমনি আর এক গ্লাস পোর্টের জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ কল্লেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার এই অনুরোধে বাধা দিয়া বলিলেন "সার ই— তোমাকে অধিক মদ খেতে বারণ।" স্বামী এই কথা শুনে যেন কাতর হয়ে বল্লেন, 'আমার প্রাণ যায়, শীঘ্র দাও, ডাক্তারের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল, এখন আমাকে সুখে মরতে দাও।' এই কথায় তাঁর স্ত্রীর বক্ষে দুই এক

বিন্দু জলধারা পতিত হইল, তিনি নিঃশব্দে এক গেলাস পোর্ট আনিয়া স্বামীর প্রমাঙ্কে রক্ষা করিলেন। তাহার পর ভদ্রলোকটি নিজে এক গ্লাস পান করিয়া আমাকে এক গেলাস পানে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া সুরা পানে অস্বীকার করায়, তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তবে 'পোর্ট খাবেন কি? অতি চমৎকার পোর্ট।' আমি তাহাতেও অস্বীকার করায় ভদ্রলোকটি পুনরায় গহনা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে আর কিছু গহনা আছে,' আমি আরো কয়েকখানি দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এখনি দোকান হতে আরো নূতন জিনিস এনে দেখাচ্চি।" আমার সঙ্গে প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল। ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,'না, না, আমি ওই হতেই একটা পছন্দ করে নিচ্চি'; তাহার পর একযোড়া বালা লইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি বলিলাম ৩৫ গিনি। ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিয়া তাহা রাখিয়া বলিলেন,'উঃ এত দর!' তাহার পর আমায় বলিলেন, "আচ্ছা আপনি যখন কষ্ট করে এনেছেন তখন কিছু না নেওয়া ভাল দেখায় না।" আমি তাঁহার এই সৌজন্যে বড় বাধিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম,'আপনারা ভদ্রলোক, অবশ্য কিছু না নিলে আমাদের দোকান চলিবে কেমন করে, অবশ্য নেবেন বই কি।' এই সময় ভদ্রলোকটি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,'উঃ গেলুম, গেলুম, বড় দুর্গন্ধ, লুসি, শীঘ্র খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়িয়ে দাও।' আমি হঠাৎ তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখে কিছু চমৎকৃত হলেম; বস্তুত, আমি ঘরে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করি নাই। লুসি এই কথায় খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর ভদ্রলোকটি সহাস্য বদনে পুনরায় অলঙ্কার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় একছড়া মুক্তার মালা লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করায় আমি ৪০০০ টাকা বলিলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় মালাছড়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, 'না মশায়, আমরা গরিব মানুষ, চার হাজার টাকার মুক্তার মালা কেনা আমার মত লোকের সাধ্য নয়। ডাক্তারেই আমার সর্ব্বনাশ কল্লে।' এই সময় পুনরায় সেইরূপ চীৎকার করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ভিনিগার ছড়াইয়া দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, বোধ হইল, এই বুঝি এঁর রোগের খেয়াল।

কিন্তু এবার তাঁহার স্ত্রী আর ঘরে ভিনিগার না ছড়াইয়া একখান রুমাল লইয়া তাহাতে খানিকটা ভিনিগার লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরো খানিকটা ঘরে ছড়াইতে আদেশ করিয়া আমাকে ঘড়ি ও চেন দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভাল চেন বাছিতে লাগিলাম, তাঁহার স্ত্রী আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, ভদ্রলোকটি এই সময় বলিয়া উঠিলেন 'শীঘ্র, শীঘ্র, গেলুম, গেলুম।' এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে এক শিশি লইয়া ঘরে ছড়াইলেন; আমি ভয়ানক তীব্র গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম ও কিছু কষ্ট হওয়ায় আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলাম, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমাকে এই প্রকার করিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, বোধ হয়, আপনার কিছু কষ্ট বোধ হচ্চে', বলিয়াই সেই ভিজা রুমাল দ্বারা আমার নাক মুখ চাপিয়া ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া একখান চৌকিতে শোয়াইয়া দিলেন। তাহার পর কি হইল আমার ঠিক স্মরণ হয় না। তবে আমার বোধ হয়, যেন আমি একবার নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু যেন এক প্রকার অননুভূত শক্তি আমার সমস্ত বল হরণ করিয়া লইল। আমি যদিও একবারে অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িলাম না বটে, কিন্তু এমনি আমার হাত পা দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল যে আমার নাড়িবারও শক্তি থাকিল না। আমি জীবিতাবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন ঘুমের ঘোরে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ভদ্রলোকটি আমার হাতদুটি ধরিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার স্ত্রী আমার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমস্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। তাহার পর আমার মুখ চিরিয়া আমার মুখে কি যেন জলের মত ঢালিয়া দিল। পরে আমার কানে স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন ঘরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমি জাগ্রত অবস্থায় এই স্বপ্নবৎ কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখি সেই ঘরে আমি একা। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব কথা মনে স্মরণ করিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন একে একে আমি গহনাপত্র খুঁজিতে গিয়া দেখি যে সে সকল কিছুই নাই। দ্বারের নিকট গিয়া দেখি দ্বার বাহির দিক হইতে রুদ্ধ। তখন আমার সম্পূর্ণ চৈতন্যোদ্রেক হইল। তবে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, না উহা সত্য ঘটনা! অলঙ্কারের বাক্স নিকটেই পড়িয়াছিল, খুলিয়া দেখি যে উহা শূন্য।

এখনও আমি মাতালের ন্যায়; আমার মস্তিষ্ক ভালরূপ প্রকৃতস্থ হয় নাই; যদিও আমি অনেকটা নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি; নিকটে চাকরদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা ছিল, তাহা বাজাইলাম; একজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে ইহাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর জবাব দিল তাঁহারা ত অনেকক্ষণ এখান হইতে চলিয়া গেছেন, 'আপনার আহার প্রস্তুত, আসুন।' আমি (আশ্চর্য্য ভাবে) 'আহার প্রস্তুত!' চাকর। 'আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, তাঁরা আপনার জন্য আহার প্রস্তুত রাখিতে বলে গেছেন।'

আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহার পর যাহা হইল পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, তবে হোটেলাধ্যক্ষ অনেকক্ষণ তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।

কাব্যের কোকিল।

একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে; প্রবাদটী প্রায় সকলেই সময়ে সময়ে ব্যবহার করে; প্রবাদটী এই:—"কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।" পৃথিবীর পদার্থপুঞ্জ সকলে সমান চক্ষে দেখিতে পায় না—সকলে সমান ভাবে ধারণা করিতে পারে না। একজন, সামান্য বালুকারেণু হাতে লইয়া ভাবে তদ্গত; আর একজন শত শত পাহাড়, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া হু হু শব্দে চলিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। একজন একটী সাধারণ পত্রের শোভা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত; আর একজন হাটিতে হাটিতে, সেই পত্রটী বৃন্তচ্যুত করিয়া নখে ছিঁড়িয়া অম্লান বদনে চলিয়া যাইতে সমর্থ। একজন নদী, মাঠ, ঘাট—সবই সুন্দরতাময় দেখে; আর একজন

তাজমহলে যাইয়াও এটী ওটীর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর! কাহারও পৃথিবী—সুখের পরিবার, ভাবময়, আবেশময়; কাহারও পৃথিবী চিরশুষ্ক—মরুভূমি।

জগতের সর্ব্বত্র এই মতদ্বৈধ, সর্ব্বত্র এই বৈষম্যবাদ। এই বৈষম্য প্রার্থনীয় হউক আর নাই হউক, সকল বিষয়েই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়; বর্ণ, আকার, গঠন, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক সৌন্দর্য্যের উপাদান কল্পনা করে; কিন্তু, এসকল ত সবই বাহ্যিক; প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প—আদবে আছে কি না সন্দেহ। সৌন্দর্য্য—জড়ত্ববিরোধী উদ্বোধন; চখে মুখে এর সত্ত্বা নাই; এর স্থান হৃদয়ে।

সময়ে সময়ে, সংসার যেন কুজ্ঝটিকাবৃত—ঘোর তমসাচ্ছন্ন; গাছগুলি অন্ধকারে ভূত প্রেত বলিয়া ভয় হয়; চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভ্রান্তি। মন যেন কি জানিতে চায়; ঘোর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ; জলের অত্যন্তাভাব। যেদিক দেখা যায় কি যেন দেখি, দেখি—দেখিতে পাই না; যেন কেমন অভেদ্য, দুর্ব্বোধ। এমন অনেক সময় আসে,—

In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintellegible world,—

যখন এই দুর্ব্বোধ জগতের দুর্ভার রহস্য রাশি আমাদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে। ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যায় না; হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে কে যেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে :—

কোথা হতে আসি, কোথা ভাসি যায়?
সঞ্চার আবার হয় কি হেথায়?
বীজে অঙ্কুরিত, বীজে পরিণতি?
চক্রাবর্ত্ত ভাবে দুরলঙ্ঘ্য গতি?
গ্রহের মতন চক্রেতে ভ্রমণ?
ধূমকেতু মত অথবা গমন,
অনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমি চির দিন,
ভ্রমি ভ্রমি সূর্য্যে হইবে বিলীন?

পৃথিবীর দিকে তাকাইলেও সমস্তই কোলাহল—গণ্ডগোল—বিশৃঙ্খলা! গুণীর আদর নাই, নির্গুণ বেশ গণ্য মান্য; গগনস্পর্শী বৃক্ষশাখায় সিমুল

ফুলের স্থান ; আর গোলাপ ? গোলাপ গাছটী আওতায় পচিতেছে—টপ্ টপানি খাইতেছে। ধার্ম্মিকের সমৃদ্ধি নাই, যত সব ভণ্ড তপস্বী বেশ আসর জম-কাইয়া ধার্ম্মিক নামে পরিচিত ; যার যেখানে সমাবেশ প্রার্থনীয়, সেখানে তার নামগন্ধও নাই ; যেন রেলের গাড়ী পূবা দমে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে—সকলই ওতপ্রোত, অর্দ্ধ সম্পন্ন ;—

যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই "অহো বিধাতঃ শিশুতা তবৈব।" বলিয়া উষ্ণ শ্বাস ফেলিতে হয় ! সমস্তই অনিয়ম—সমস্তই কবির chaos !

যাহাতে জগতের এই বিরোধের ভঞ্জন হয়, যাহাতে ইহার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব শান্তি সদ্ভাব সংস্থাপন করে,—তাহাই সৌন্দর্য্য ; যাহাতে ধরার সচ্ছন্দ সম্ভারে বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ প্রকটিত করে ; যাহাতে প্রতি পরমাণুতে তাঁহার শৃঙ্খলা, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বিকাশ হয় ; যাহা মনে ধরিয়া, ইচ্ছাময়ের ব্রহ্মাণ্ডময় অপ্রমিত তেজ, ফুটন্ত ফুলের ন্যায় মনশ্চক্ষুর গোচর হয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। প্রেম, মিলন—সৌন্দর্য্যের কাজ ; সামঞ্জস্য—সুন্দর ; অসামঞ্জস্য—অসুন্দর। এই জন্যই, চন্দ্রবাবু বলেন, যাহা সুন্দর নয়, তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর দেখে, এমন মনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পারে ; চক্ষু এবিষয়ে অন্ধ। বঙ্কিম বাবুর এই স্থানটি বড়ই রমণীয় ; "গোবিন্দলাল উদ্যানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন প্রকৃতি করুণাময়ী।" প্রকৃতির এই করুণা—সৌন্দর্য্যের অপর নাম—এই করুণা সতত সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টিত। প্রকৃতি ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া সকলের উচু নীচু দূর করিয়া সমান করিতেছে ; প্রকৃতির সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ; প্রকৃতি হইতে আর অধিক সুন্দরী কে ? কবি রবি ঠাকুর এ কথা বেশ বুঝাইয়াছেন।

এখন কাব্যের কোকিলের কথা বলিব। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিরহিণী রাধা "পায়স লেই করে বায়স নিয়ড়ে ফুকারি," যেন কাকে আর কোকিল পালন-না করে—যেন কোকিলের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া ফেলে—বিরহিণীর এক প্রধান শত্রু নিপাত হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের অসীম মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন ; কিন্তু, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, মলয়বায়ু, এ সকল সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ণনা প্রেমের ব্যাকুলতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ কেন ? কালিদাসও বলেন ;—

"সমদ মধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চনাদৈঃ।
কুসুমিত সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চরম্যঃ॥

ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈ র্মানসং মানিনীনাং।
তুদতি কুসুমবাণো মন্মথোদ্দীপনায় ॥*

এইরূপ আদি কবিগণ প্রায় সকলেই কোকিলরবে একরূপ ভয়ানক লালসা—এক ভয়ানক গলা শুকানো পিপাসা সংযোগ করিয়া গিয়াছেন। এ পিপাসা দেশ, দিক, পাত্র ভেদে যেরূপই ধারণ করুক, সাধারণত ধারণা,-ইহা একরাশি বিষ মিশ্রিত। কিন্তু তাম্র পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে যে বিষ হয়, তা কি দুগ্ধের দোষ? দুগ্ধ জগতের জীবন, কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী দুগ্ধ পান করিলে স্বতই অধিকতর বিকারতা প্রাপ্ত হয়! ফল কথা;—

"There is nothing good or bad;
But thinking makes it so."
ভাল মন্দ কিছুই নাই,
মনের গুণে ভেদ বে ভাই।

চন্দ্রবাবু বলেন, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া নিশিশেষে কোকিল রবে আহ্লাদে মাতিয়া খেলা করিতে ছোটে। কই? সে তো কোকিলের গরলের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে না।

বঙ্কিমবাবু কোকিলের বেশ চিত্রটী আঁকিয়াছেন; তাঁহার কোকিলেও বিষ আছে—সে বিষ শোধিত বিষ; সে বিষের জ্বালায় অন্তর দহে বটে; কিন্তু, সে প্রদাহের পরিণাম মৃত্যু নয়—শান্তিপূর্ণ স্থির ভাবও নয়। উহা ব্যাকুলতা; সে ব্যাকুলতায় মানুষকে বসাইয়া দেয় না—সামনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অথচ বঙ্কিমবাবুর কোকিল যেন কেমন এক হা হতোঽস্মির ভাব আনিয়া ফেলে। "কি যেন ছিল; কি যেন নাই; যেন তাহার অভাবে জীবন অসার হইয়া পড়িয়াছে।"

তার পর, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিল। যে সকল অপরিস্ফুট তত্ত্ব দার্শনিকগণ সংসার-সংস্রব-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলিয়া ধ্যান করেন, সেই সকল নানা অপরিজ্ঞেয় উপায়ে মানব মনে সমুদিত হইয়া তাহাকে স্বর্গীয় মত্ততায় মাতাল করিয়া তোলে; ব্যক্তি বিশেষকে মহাশক্তি স্বমূর্ত্তিধরিয়া দেখা দেন, আর নাই দেন, সাধারণ মানব জাতির নিকট তিনি অল্প অধিক পরিমাণে স্বতই পরিস্ফুট। এই স্বর্গীয় মত্ততা—এই আগ্রহাতিশয্যই প্রকৃত উদ্বোধন। চৈতন্যকে যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বিগলিত নেত্রে গাইতে দেখি—

"পরম দয়াল আমার গোসাঞি।
যখন যা চাই তখন তা পাই॥"

যখন দেখিতে পাই, যিশুখ্রীষ্ট বিশ্বাস বিস্ফারিত লোচনে বলিতেছেন "Ask and it shall be given; knock and it shall be open;"

যাচিতে থাকিলে মিলিবে ধন, দুয়ারে ঘা দিলে, খুলিবে কবাট।

তখন আমরা বুঝিতে পারি প্রার্থনা দ্বারা কত কি করা যায়। বস্তুত প্রকৃত প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্মুখে লইয়া আসে। আবার প্রেম—বিশ্বজনীন প্রেম, সার্ব্বভৌমিক প্রীতি—স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে। ওয়ার্ডসোয়ার্থও এই কথাই বলেন; কিন্তু, তিনি এখন একটু বাড়াইয়া বলেন; তিনি যা বাড়াইয়াছেন, তা সকলেরই অনুকরণীয়—শিক্ষণীয়। তিনি দেখাইয়াছেন, ফুল, ফল, লতা, পাতা, একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা—ধ্যান করিয়াও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বলেন প্রকৃতির প্রকৃত ধ্যান করিয়া মানুষ জড় পদার্থের জীবন দেখিতে পায়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ; তাঁহার জীবন দেখিলে একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; তিনি বলেন;—

"I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts.

আমি এমন সত্তা উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাহাতে কি এক মহান্ ভাবে আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে।

তিনি বলেন জীবনে এমন সময় আসিয়াছে—

"When the light of sense goes out, but a flash has revealed the invisible world."

যখন এই বাহিরের আলোকে নিবিয়া যায় কিন্তু অন্তরে বিদ্যুৎ বিকাশে অদৃষ্ট জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ওয়ার্ডসোর্থের কোকিলে—অন্যান্য লেখার কথা বলিতেছি না—এই প্রাকৃতিক ধ্যানের উন্মেষ মাত্র পরিলক্ষিত হয়;

And listen till I do beget
That golden time again,
O blessed bird! the earth we pace,
Again appear to be
An unsubstantial, fairy place
That is a fit home for thee."

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিলে যে ভাবের উন্মেষ, চন্দ্র বাবুর কোকিলে সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ; পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় ভাবের—চরম সীমা। তাঁহার কোকিলের রবে প্রেম, জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ফেলিতেছে। ভাগবতী ভক্তি, সারস্বতী শক্তি একত্র মিলিত; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, সেই দেবারাধ্য প্রয়াগ তীর্থ। প্রয়াগে নাকি মর লোচনের অগোচর, অন্তঃ-সলিলা সরস্বতী প্রবাহিতা আছে; যখন প্রয়াগে গিয়াছিলাম, চর্ম্মচক্ষে তা দেখিতে পাই নাই। চন্দ্রবাবুর কোকিলে সেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর একত্র মিলন—"একত্র মিলন—একতাত্মক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ"—দেখিতে পাইলাম।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোহন মুরলীর কোন্ রন্ধ্রের শব্দের কি গুণ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন, শ্রীরাধিকা প্রেমের আবেশে গলিয়া মুরলী বদনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কোন্ রন্ধ্রে কোন্ ধ্বনি কহ গুণমণি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফোটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে ফোটয়ে কদম্ব প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু বহে এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥

রাধিকা বাঁশরী-রবে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ঐ রবেই ময়ূরিণীর কেকা রবে নৃত্য; ঐ রবেই রসালে পারিজাত প্রস্ফোট; ঐ রবেই ষড়ঋতুর একত্র সমাবেশ।

সিদ্ধার্থ বিলাস ভবনে, ভোগ সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া, বেণু বীণার রবে শুনিতে পাইতেন—

সর্ব্বভূত ক্ষয়-ধর্ম্মী; অনিত্য সংসার;
সুমহান্ কৃচ্ছ্র ভোগ প্রাণী সবাকার;
জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ—প্রদীপ্ত দহন
দহিছে রজনী দিনে অনাথ ভুবন।
মৃত্যু বশীভূত সবে হইবে বিলয়;
নদী-ক্ষিপ্ত দারু মত মৃত্যু হরি লয়!

পুন আগমন নাই, পুন সংমিলন
নদী স্রোতে বহমান ফল পত্রগণ!
কামনা নটের নাট; নিশার স্বপন;
সলিল বুদ্বুদ মরীচিকা প্রদর্শন!

যে বেণু বীণা অঙ্গনা হস্তে যাইয়া স্থান বিশেষে মানুষকে নরকের দিকে টানিয়া লয়, সেই বেণু বীণার রবে, নর্ত্তকীর কাকলীতে সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-মৃত্যুর তরঙ্গে হৃদয়ে আহত হইলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন; —

বিপরীত রাগ দ্বেষে দহে ত্রিভুবন;
কৃপা মেঘ শীতলাম্বু কর বরিষণ;
স্বর্গের অমৃত দ্বার কর উন্মোচন;
বোধহ নিরয়; কর মুক্তি প্রদর্শন;
অবিদ্যা মোহ তামসে লিপ্ত ধরাতল;
নিরঞ্জন ধর্ম্ম চক্ষু দাও সুবিমল।

চন্দ্রবাবু কোকিলের রব পূর্ব্বোক্ত রূপ তন্ময়তার সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার কোকিলের রবে ইহারই অনুবৃত্তি; শুধু অনুবৃত্তি নয়, এইরূপ কয়েকটী ভাবের মিশ্রণ; মিশ্রণে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব অমিশ্র পদার্থের সৃষ্টি! "বসন্ত পৃথিবীর চরম বিকাশ; কোকিল-কণ্ঠে সেই চরম বিকাশ স্বরূপে পরিণত। কু—উ স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত। কু—উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি। সৌন্দর্য্য সরলতা, বীরতা, দয়া, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কু উ স্বরে বিকশিত—কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গীত।"

তার পর, আবার কোকিলের পঞ্চম।

এই সুন্দর হইতে সুন্দরতর, সুন্দরতর হইতে সুন্দরতম; বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম, বৃহত্তম হইতে অনন্ত; উন্নতি, উন্নতি উন্নতি, আরো উন্নতি; অনন্ত উন্নতি; এই মন্ত্রেই কোকিলের কু, কু—উ, কু—উ, কু—উ, কূ। এই ধারাবাহিক অনবচ্ছিন্ন উন্নতিই চন্দ্র বাবুর কোকিলের পঞ্চম।

অনেক দিন হইল হেমচন্দ্র কোকিলরবে প্রকৃতিকে নব কিসলয়ে সাজিতে দেখিয়া, অচেতন মলয়বাত, অচেতন কুসুম রেণুকে কোকিল কাকলী

শুনিয়া অধীর হইতে দেখিয়া, প্রবাহিণীকে কোকিলের ভাবে মাতিয়া, কল কল স্বরে সাগর পাশে ছুটিতে দেখিয়া—জড়কে চেতনের ভাষা বুঝিয়া সচেতন হইতে দেখিয়া—গাইয়া ছিলেন—

"বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও !
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
কে আছে হে কবি কুলে গভীর হৃদয়,
গাও একবার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস
জুড়াবে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ।"

"গভীর হৃদয়" চন্দ্রবাবু কোকিলের "মধুর স্বরে" "গভীর উচ্ছ্বাসে" সেই রহস্য উৎসাহের গীত গাইয়াছেন ; কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের একতানাত্মক সঙ্গীত চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর একবার এই সঙ্গীত দেখা উচিত। দেখিয়া, শিখিয়া 'জীবন সার্থক" করা কর্ত্তব্য।

যম-যাত্রীদের সেতোগণের সভা।

এখন সকল রকমেই সুবিধা হইয়াছে ' পূর্ব্বে বিলাতে যাইতে হইলে ছয় মাস লাগিত, এখন একুশ দিনের বেশী লাগে না,—পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে গয়া কাশী যাইতে হইলে তিন মাস লাগিত, এখন দুই দিনেই যাওয়া যায়। এই অনুপাতানুসারে যমালয়ের পথও অনেক নিকট হইয়াছে। কিন্তু হৈম পথ, জলীয় পথ, তাড়িত পথ প্রভৃতি নূতন নূতন পথ হওয়াতে, " এলো পথের " যাত্রীর সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, সেই পথের সনন্দ

প্রাপ্ত ইজারদারগণ কিছু ক্ষুন্ন হইয়াছেন ; বিশেষ, কালিঘাটের হালদারদিগের ন্যায় ইহাঁদের অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে লাভের অংশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাই ইহাঁরা ধর্ম্মঘট করিয়া অপরাপর পথগুলি বন্দ করিবার এবং অপ্রাপ্ত-সনন্দ পাণ্ডাগণকে অনর্থক অংশ দান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় আছেন।

ইতিমধ্যে ইজারদারগণ গুপ্ত সভা আহ্বান করেন। সকল সভ্য সভাস্থ হইলে একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিলেন, যে আজ কাল গবর্ণমেন্ট যেরূপ ক্ষিপ্র হস্তে সনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই যাত্রী অপেক্ষা সনন্দ-প্রাপ্ত অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আর গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদার, তাহাতে সনন্দ বিতরণে বাধা জন্মাইবার আশাও দুরাশা মাত্র। বরং সেরূপ চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা। অথচ অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইলে "কুতের" ভাগ ক্রমশই হ্রস্ব হইয়া আসিবে ; অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া পূর্ণ মাত্রায় যমযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সভ্যগণ "সাধু সাধু" উচ্চারণ করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অতঃপর আর একজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করত বলিলেন, বর্ত্তমান বিপদ দূরীকৃত করিবার একটী সুন্দর উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, সভ্যগণের মনোনীত হইলেই কৃতার্থ হইব। উপায়টী এই যে অনেক যাত্রী আমাদের সাহায্যে একেবারেই যম-কবলে নিপতিত হয় ; তাহাদের কাছে আমরা একবার বই "কুত" পাই না। আমরা আবহমান কাল যমরাজের সাহার্য্য করিয়া আসিতেছি, এই ক্ষণে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি ক্ষুধা নিরোধ করেন, কোন লোককে কবলিত না করেন, অথচ প্রত্যেককে বৎসরে ৪।৫ বার তলপ করিয়া কাছে নিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা, প্রত্যেক মানুষের নিকট প্রতিবারে যাইতে আসিতে দুইবার করিয়া বৎসরে ৮।১০ বার "কুত" পাইতে পারিব ; আর যাত্রীগণ যমের কবলের-অগ্রাহ্য হইলে, আমাদের লাভের অঙ্ক অনন্তকালপর্য্যন্ত এমনই অসংখ্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব এই গুপ্ত সভা হইতে এই বিষয়ের জন্য যমরাজকে অনুরোধ করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রবণান্তে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সজোরে করতালি দ্বারা গুপ্ত সভা ব্যক্ত করিলেন।

রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত; ইতিহাসে—আমার হাসি আসে; রত্ন—আমি চিনিতে পারি না; বিজ্ঞানে—অজ্ঞান; লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই। কাজেই, আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল; সুতরাং আপনাদিগকেও অগত্যা শুধুই রহস্য পড়িতে হইতেছে।

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলি হাঁগা, শুধুই রহস্য কি লিখিব?

সর্ব্বাগ্রে একালের ছাত্র বিস্মিত মুখে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

রাগ অর্থ ভালবাসা, ঘৃণা অর্থ দয়া মায়া।

তখন একালের শিক্ষক গম্ভীর মুখে বলিলেন তা নয়,শুধুই রহস্য এই যে,—

যে লেখে সে শেখে না,
যে শেখে সে লেখে না।

একালের দরিদ্র বক্ষে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ক্ষুধায় যে ক্ষিপ্ত, শাকান্ন তাহার যোটে না।

ধনী উদরে হাত দিয়া তেমনই কাতর কণ্ঠে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

প্রচুরে যে বিভোর মন্দাগ্নি তাহার ঘোচে না।

একালের সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

গরীবের তেললুণের উপর বাটা চড়ানই রাজনীতি,

একালের রাজপুরুষেরা উত্তর চ্ছলে বলিলেন, আর শুধুই রহস্য এই যে,—

রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি।

একালের সাময়িক পত্র সকল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

বহুপরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম মুল্য;—

একালের গ্রাহকেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি রাগ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র।

একালের আহেলেমামলা আদালতের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইষ্টাম্পের যে ব্যবসা তাহার নাম ন্যায়রক্ষা।

আর পল্লীগ্রামের লোকে পোলিস্‌কে দেখাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুপর রাত্রিতে যে চীৎকার, তার নাম শান্তি-রক্ষা।

নাইট সাহেব মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

সব চেয়ে দুঃখী এই ভারত ভুভাগে,
সব চেয়ে বেশী বেশী বেতনাদি লাগে।

গিফিন্‌ হাত কামড়াইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

তোমরা— যার শীল, তার নোড়া,
তারই ভাঙ্গিবে দাঁতের গোড়া।

তখন সেকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলাম।

সেকালের শম্ভু খুড়ো হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—শুধুই রহস্য এই যে;—

মনের কথা খুলে বলিলেই বাতুল,
চেপে রাখিলেই প্রতুল।

সেকালের আমলা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

আমলাকে পয়সা দিয়া কাজ করাইলে—অপব্যয়;
উকীলকে মোহর দিয়া কথা কহাইলে—সদ্ব্যয়।

সেকালের শাশুড়ীরা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ডাকিলে, জামাই খায় না,
যাচিলে, জামাই পায় না।

সেকালের দিদী শাশুড়ীরা গালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

পোড়া দেশের দেখ কাপ,—
যা নইলে, পেট ভরে না, তারেই বলে, সক্‌ড়ি,
যা নইলে ঘর ভরে না, তারেই বলে পাপ।

সেকালের বঙ্গদর্শন আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

যুবকের ভিক্ষার নাম ভেলাফেলানি, যুবতীর ভিক্ষা শয্যাতোলানি,

শুরু পুরোহিতের—প্রণামি, জমীদার নায়েবের—সেলামি,

কিন্তু কেবল দরিদ্রের ভিক্ষাই লাঞ্ছনা রহিল।

সেকালের হুতোম পেঁচা সহরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন; শুধুই রহস্য এই যে,—

এখানে খেঁদীপুতেরা—পদ্মলোচন,

আর পাষণ্ড ভণ্ড গুলা—ভাগবতভূষণ।

সেকালের সাধক রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ছুটা গজ ছুটা অশ্ব স্থানে বসে' কাল কাটালো,

আর বড়ের ঘরে করে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে মলো।

সেকালের মাতাল ঢলিতে ঢলিতে বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,

বিশবাঁও জলের নীচে ইলিশ ঠাকুরাণী, সে হলো গরম,

আর স্থর্য্যি খুড়োর লেজে বাঁধা ঝাটার ফল,—ডাব—সে হলো ঠাণ্ডা।

সে কালের পক্ষী কবি আপ্‌শোষ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইংরাজ জাতি, হল জ্ঞাতি, উপার্জ্জনের অংশ চায়।

সে কালের ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

দাতায় দান করে,

হিংসকে হিংসায় মরে।

তখন সম্মুখ পশ্চাৎ শেষ করিয়া উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম দৈব-ভারতী বলিতেছেন, ' বাছা একাল সে কালের এত কথা শুনিয়াও এখনও বুঝিলে না যে শুধুই রহস্য কি,—তবে শুন, সর্ব্বকালের শুধুই রহস্য এই যে,

যে জানে সে বলে না,

যে বলে, সে জানে না।

যারে চাই তারে পাই না,

যারে পাই তারে চাই না।

আরও রহস্য এই যে,—

লোকে, ডাঙ্গায় ভাসে, জলে চসে,
দাঁতে হাসে, ঠোঁটে ভাষে।

তখন ভারতীর ভাষায় শুধুই রহস্য শুনিয়া আমি গলবস্ত্রাঞ্চলে মায়ের চরণাঞ্চলে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, বলিলাম—'আমি এইবার শুধুই রহস্য বুঝিয়াছি।' প্রশ্ন হইল, 'কি বুঝিলে?' আমি বলিলাম, 'সর্ব্বাপেক্ষা শুধুই রহস্য—'অদ্যকার এই প্রবন্ধ।' দেবীর হাস্যধ্বনি যেন শুনিতে পাইলাম—বলিলেন, 'তুমিই বাছা রহস্যবিৎ, 'যাও ছাপ।'

সুতরাং আমি ছাপিলাম।

মাক্‌বেথ্‌ ও হাম্‌লেট।

৩।

আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাক্‌বেথ্‌কে রক্তাক্ত হস্তে দণ্ডায়মান রাখিয়া, হাম্‌লেট মাক্‌বেথ্‌ এই দুই খানি নাটকের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমরা কি ভাবে ঐ দুই খানি নাটকের সমালোচনে প্রবৃত্ত, তাহার অনেকটা আভাস দিয়াছি। এখন আবার মাক্‌বেথ নাটকের ক্রমানুসরণ করা যাউক।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই মাক্‌বেথ কর্ত্তৃক ডঙ্কান হত্যায় পাপের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি; আত্মীয় হত্যা, বন্ধু হত্যা, প্রভু হত্যা, রাজ হত্যা, গুপ্ত হত্যা, সুপ্ত হত্যা, আশ্রিত হত্যা, অতিথি হত্যা—মাক্‌বেথ এই সকল পাতকের পাতকী।

মাক্‌বেথ রক্তাক্ত হস্তে পাপে প্রবৃত্তি-দাত্রী কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'আমি কার্য্য শেষ করিয়াছি, তুমি কিছু শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে কি?'

মাক্‌বেথ গৃহিণী। আমি কেবল পেচকের চীৎকার ও পতঙ্গের ঝিল্লির শুনিয়াছি মাত্র।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পিশাচী সুরা পান করিয়া পেচকের বিকট শব্দে আনন্দ করিতেছিল। আর কিছুই শুনে নাই; পেচক

ও পতঙ্গের বিকট রব শুনিয়াছে, তাহাতেই আনন্দ করিয়াছে। এখানেও সেই মূল কথা—

'মন্দকে সুন্দর।'

রাত্রি কালে কাল পেঁচার চীৎকার কেহই ভাল বাসে না—পাপীয়সীর তাহাতেই আনন্দ।

রাজা ডঙ্কানের শয়ন গৃহে দুই জন রক্ষক শুইয়াছিল। মাক্‌বেথ গৃহিণী তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুরা সেবন করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়াছিলেন। মাক্‌বেথ বলিতেছেন 'ডঙ্কানের হত্যার পর, তাহাদের একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিয়া উঠিল, 'হত্যাকাণ্ড।' আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তাহারা একত্র ভগবানের স্তবোচ্চারণ করিল, একজন বলিল, 'ভগবান আমাদের রক্ষা কর,' আর একজন বলিল, 'কৃপা কর।' আমি মহা পাপী, ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল, কিন্তু আমি ত বলিতে পারিলাম না, ভগবান আমায় কৃপা কর। কথাটা আমার গলায় আট্‌কাইয়া রহিল।'

যে দুঃখে পড়িয়া পাপে মগ্ন হইয়া দুঃখভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে পারে না, তাহার দুঃখের সীমা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মাক্‌বেথ মহাপাপী বলিয়া মহা দুঃখী।

মাক্‌বেথের মহা কষ্ট দেখিয়া গৃহিণী অনেক সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন 'ও সকল কথা অত করিয়া ভাবিতে নাই—যাও একটু জল দিয়া তোমার হাত দুটি ধুয়ে ফেল গে, ও বীভৎস বমালগুলা আর রেখে কাজ কি?—তরবারি দুই খানি সঙ্গে আনিয়াছ কেন? যাও, ও দুখানা সেই নিদ্রিত রক্ষকদের নিকটেই রাখিয়া তাহাদের রক্ত মাখাইয়া এসো।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'আমি আর যাব না। আমি যাহা করিয়াছি—তাহা ভাবিতেই পারিতেছি না, তা আবার দেখিতে পারিব কেন?' তখন মাক্‌বেথ গৃহিণী একটু ঘৃণার স্বরে, একটু স্পর্দ্ধার স্বরে বলিলেন—'তুমি বড় শিথিল-সংকল্পের লোক; দাও আমাকে তরবারি দুখানা দাও—ঘুমন্ত আর মৃত, তারা ত চিত্রের পুত্তলি; ছবির ভূত ত, ছেলেরাই ভয় করে—আমি রক্ষকদের রক্ত মাখাইয়া আসিতেছি; এই হত্যাকাণ্ডে তাদের দোষী করা চাই।' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই কাল নিশীথিনীর নীরবতা নষ্ট করিয়া বহির্দ্বারে গুম গুম্‌ করিয়া বলে আঘাত হইতে লাগিল। সেই আঘাতের পর আঘাত মাক্‌বেথের বুকে

পড়িতে লাগিল। মাক্‌বেথ মনে করিতে লাগিল, যেন সমস্ত বহির্জগৎ কেবল ধারাবাহিক আঘাতে পরিণত হইয়াছে; আর তাহার সমস্ত অন্তর্জগৎ সজাগ হইয়া তাহার বক্ষে আসিয়াছে; সেই বহির্জগতে আর সেই অন্তর্জগতে ধারাবাহিক ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌। প্রকৃতি যেন এতক্ষণে দণ্ড প্রণেত্রীভাবে তাহার পাপ হৃদয়ের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছেন; সেই মহতী প্রকৃতির সহিত পাপের কুণ্ঠিত কুঞ্চিত প্রকৃতির প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে জোরে জোরে—সম্মিলন হইতেছে গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌।

সহ-পাপিনী পাপ-সঙ্গিনী তাঁহার গৃহিণী তখন পাপ লুকাইতে গিয়াছেন; আমায় একা ফেলিয়া গেলে—আমার বুকে আঘাত লাগিতেছে, শুনিতেছ না? কাহার কাছে লুকাইবে? বুঝিতেছ না—আমাদের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে; ঐ দেখ জগৎশুদ্ধ এক হইয়া ঘা মারিতেছে—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌।

মাক্‌বেথ মুখ ফুটিয়া ভাবিতেছেন,—

'কোথা হতে হতেছে আঘাত?
প্রতি শব্দে কেন মোরে করে ভয়াকুল!
কি বীভৎস হস্ত মোর! চক্ষে বিঁধে শূল;
বরুণের অম্বুরাশি পারিবে কি কভু
ধুইতে হস্তের রক্ত? না—এই হস্ত মম
সমগ্র সাগর বারি রঞ্জিবে কেবল,
নীল জল হ'বে রক্ত।

মাক্‌বেথ গৃহিণী ফিরিয়া আসিবার সময় শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। বলিলেন—'তোমার মতন আমার হাতও রক্তে ভিজিয়াছে—কিন্তু তোমার মত অমন ভিজে হৃদয় আমার নয়।' বাহিরে আবার আঘাত হইতে লাগিল—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌। যে আঘাতে মাক্‌বেথকে স্তব্ধ আড়ষ্ট করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার গৃহিণীকে চঞ্চল করিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'চল আমরা ঘরে যাই, হাত ধুইগে; আমাদের রাত্রিবাস পরিগে; হঠাৎ উঠিতে হইলে, লোকে যেন কিছু মনে করিতে না পারে—অত ভাবনায় আত্মবিস্মৃত হইও না।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে আত্মবিস্মৃতিই—আমার পক্ষে পরম মঙ্গল।' তখনও আঘাত হইতেছে—মাকবেথ যাইতে

যাইতে বলিলেন, ‘ঘা মারিয়া আর তোমরা ডঙ্কানকে জাগাইতে পারিবে কি? তাত পারিবে না!’

দম্পতি নিষ্ক্রান্ত; দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

এই দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ ভাগের স্থূল কথা—পাপে মাক্‌বেথের বিহ্বলতা ও মাক্‌বেথ গৃহিণীর পাপ লুকাইবার জন্য আয়োজন, ও সতর্কতা, এবং স্বামীকে সাহস ও সান্ত্বনা দান। পাপিষ্ঠা নারী, স্বামীকে পাপের পরামর্শ গ্রহণে বিরত দেখিয়া ‘তবে বুঝি আমাকে ভাল বাসে না’ মনে করিয়া যেমন ভালবাসার ধূয়া ধরিয়া পুরুষকে পাপের পথে লইয়া যায়,—মাক্‌বেথ গৃহিণীর মত, চোক মুখ ঘুরাইয়া ‘এই তোমার ভালবাসা’ বলিয়া পুরুষের মাথামুণ্ড ঘুরাইয়া দেয়,—সেইরূপ পাপ-পরামর্শ মত কার্য্য হইলে, ‘তবে ত আমায় বড়ই ভালবাসে’ মনে করিয়া পাপ-ভারাবনত পুরুষকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করে। পুরুষের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, পাপের ভাবনা ভাবিতে দেয় না; পুরুষের কাছে পুরুষত্বের গৌরব করিয়া তাহাকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করে।

মাক্‌বেথ গৃহিণী পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি প্রদানের সময় বলিয়াছিলেন ‘তুমি নয় পুরুষ? তবে মনে যাহা হয়, কাজে তাহা করিতে পার না কেন?’ তখন মনই প্রধান। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার সময় বলিতেছেন ‘ছি ও সব কথা কি আর মনে করিতে আছে?’ এখন যেন মনে করাটাই মন্দ; মন কিছু নয়। তখনকার কথা—‘তুমি নয় পুরুষ? তবে এমন কাজ করিতেছ না কেন?’ এখনকার ভাষা ‘তুমি পুরুষ, তবে অমন করিতেছ কেন?’ এই রূপে দেখা যায়, যে প্রবর্ত্তনা ও সান্ত্বনার উভয়ের ধূয়া পুরুষত্ব হইলেও রাগ রাগিণীতে কোমল তীব্রের ভেদ হওয়ায়, সকাল সন্ধ্যার ভেদ হইয়াছে। আমরা স্থূল কথাগুলি বলিতেছি মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেক্‌সপিয়রের দুই একটা কার-চুপির কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। এই সকল কারচুপির কাজ, চসমা চক্ষে দিয়া আধ ছায়ায়, আধ আলোকে, দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, আর আপনার মনে কারুকারের প্রশংসা করিতে হয়।

রাজা ডঙ্কান কেবল মাক্‌বেথের সম্মানবর্দ্ধনার্থ, তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, মাক্‌বেথের ভবনে উপযাচক হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষেই তাঁহার ওখান হইতে প্রস্থান করিবার কথা ছিল। মাক্‌ডফ্‌ ও লেনক্স নামে দুই জন ওমরাকে অতি প্রত্যূষেই আসিতে

বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই বহির্দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। প্রভুর আমোদ প্রমোদের জন্য বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ভৃত্যকে ভোরে উঠিতে হইলে, সে মহা বিরক্ত হয়। মাক্‌বেথের দ্বাররক্ষকও এই গুম্‌গুম্‌নি শব্দে মহা বিরক্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ছাই এমন রাত্রি-তেও একটু নিস্তার নাই, লোক আস্‌ছেই আস্‌ছেই—এ যে নরক হয়ে উঠ্‌লো—আমি ত দেখিতেছি নরকের দ্বারপাল।' বাস্তবিক মাক্‌বেথ-ভবন যে নরকের নরক হইয়াছে, তাহা বিরক্ত দ্বাররক্ষক ঘুমের ঘোরে, রূপকের জোরে, না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

মাকডফ্‌ ও লেনক্স ভবনে প্রবেশ করিলে, একটু পরেই মাক্‌বেথের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল; রাজা কখন উঠিবেন, কখন যাবেন—এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মাক্‌বেথ অতি অল্প কথায় কেবল উত্তর দিতে লাগিলেন। হৃদয়ে গুরুভার চাপিয়াছে—বেশী কথা কহিতে পারিবেন কেন?

মাক্‌ডফ্‌ রাজার শয়ন গৃহে অগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল,—ছিন্নশিরা রাজ-দেহ দেখিয়া চীৎকারে বাড়ীর সকলকে জাগরিত করিল। লেডি মাক্‌বেথ যেন সেই চীৎকারেই আসিলেন, বাঙ্কো আসিলেন। রাজকুমারদ্বয় মাল্‌-কোম্‌ ও ডনাল্‌বেন্‌ আসিলেন। মাক্‌বেথ্‌ ও লেনক্স রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন—মাক্‌বেথ্‌ বলিলেন, 'লোক দুটাকে কাটিয়া ফেলিয়া আমি ভাল করি নাই।' মাকডফ্‌ বলিলেন, 'কাটিলে কেন?' তখন, আবার দুই জনকে হত্যা করাতে মাক্‌বেথের পাপাগ্নি ইন্ধন পাইয়াছে—মাক্‌বেথ্‌ পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে; মাক্‌বেথ প্রথম হত্যাকাণ্ডের পর আপনার গৃহিণীর সম্মুখেই পাপের ভারে ম্রিয়মাণ ছিল, যখন মাক্‌ডফ্‌ ও লেনক্স আসিল, তখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই; এখন হত্যার পর হত্যা করিয়া লেনক্সের সমক্ষে রাজরক্ষক-দ্বয়কে হত্যা করিয়া নরকের সাহস সঞ্চয় করিয়াছে! যখন মাক্‌ডফ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কাটিলে কেন?' তখন আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকৃত বাগ্মীর মত উত্তর করিলেন;—

> Who can be wise amaz'd, temperate and furious,
> Loyal and neutral in a moment? No man:

হঠাৎ বিস্মিত হলে, বিবেচনা শক্তি থাকে না, ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য্য রাখা

যায় না, রাজভক্ত হয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না—কেহই পারে না।

শুনিতে শুনিতে লেডি মাকবেথ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যে লেডি মাকবেথ স্পৰ্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বক্ষস্থ শিশুকে ইচ্ছা করিলে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিতে পারেন, যে লেডি মাকবেথ স্বামীকে ধিক্কার দিয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, সেই পাষাণী পিশাচী স্বামী কর্তৃক আবার হত্যার কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র বুঝিলে কি?

স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবতই জলের ন্যায় তরলা। শৈত্যাধিক্যে জল যেমন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়, স্ত্রীলোকও কখন কখন তরল হৃদয়, সাহসে বাঁধিয়া, পাষাণবৎ করে। কিন্তু একটু আঁচ লাগিলেই বরফ যেমন গলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের সাহসে বাঁধা বুকও তেমনই অল্পেতেই গলিয়া যায়।

রাজা রাত্রিতে অতিথি হইবেন, এই কথা শুনিয়া অবধি মাকবেথ-গৃহিণী আপনাকে কঠোর প্রকৃতি করিবার জন্য দুঃসাহসে বুক বাঁধিবার জন্য, দানবী শক্তির আরাধনা করিতেছিল *। মাকবেথ ডঙ্কানকে হত্যা করিবে, কিন্তু সুরাপান করিয়াছিল, লেডি মাকবেথ। পৈশাচিকী আরাধনায়, পৈশাচ পানীয় সেবনে তবে গৃহিণী দুঃসাহসিকতার সহায়তায় বুক বাঁধিয়া ছিল। যাই শুনিল, যে স্বামীকে সে কাপুরুষ বলিয়া কিছু পূর্ব্বে ধিক্কার দিয়াছিল, সে সচ্ছন্দে দুইজন নির্দ্দোষ রক্ষককে হঠাৎ হত্যা করিয়াছে—এত যে বুকের বাঁধনি, সমস্ত যেন এক আঘাতে খুলিয়া গেল, এত যে জমাট, সব যেন গলিয়া গেল। আমাকে ধর ধর বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

Come you spirits!
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me from the crown to the toe topfull
Of direst cruelty; make thick my blood;
Stop up the access and passage to remorse,
That no compunctious visiting of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
The effect and it! come to my woman's breasts
And take my milk for gall, you murth'ring minsters,
Whenever in your sightless substances
You wait on nature's mischief!

এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য কিছু পরে সকলে একত্র হইবেন, স্থির হইল। রাজকুমারদ্বয়ের মনে কিন্তু মহা সন্দেহ হইয়াছে; তাঁহারা একজন ইংলণ্ডে, ও আর একজন আয়র্লণ্ডে পলায়ন করা স্থির করিয়া তাহাই করিলেন। এই খানেই তৃতীয় দৃশ্য শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে বিষ্কম্ভক; ইহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনা সকলের আভাস পাওয়া যায়। মাক্‌ডফ্ এরূপ আভাস দিতেছেন, যে রাজকুমারদ্বয় যখন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের উপর সন্দেহ হয়; তাঁহারাই হয়ত রক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছেন।

কুমারদ্বয় রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের পরই মাক্‌বেথ উত্তরাধিকারী। সুতরাং স্কটলাণ্ডের রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছে; মাক্‌বেথ স্কটলাণ্ডের রাজা এবং শীঘ্রই স্কোন নগরে তাঁহার অভিষেক হইবে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। রস নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সেই অভিষেক দেখিতে যাইতেছেন; রাজকুমারদ্বয়ের উপর সন্দেহের কথা, মাক্‌বেথ রাজা হইবার কথা,—শুনিয়া একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলিল;—

God's benison go with you, and with these
That would make good of bad, and friends of foes!

ভগবান্ তোমাদিগকে রক্ষা করুন, আর যাহারা মন্দকে ভাল মনে করে, শত্রুকে মিত্র মনে করে, তাহাদিগকেও তিনি রক্ষা করুন।

প্রবীণ বিচক্ষণ বৃদ্ধের কথায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল, আর নাটকের মূল ধূয়া মন্দকে সুন্দর ভাবা—আর একবার আমাদের মনে জাগরূক করিয়া দেওয়া হইল।

আমরা প্রথম অঙ্কের শেষে দেখিয়াছি, জ্বলন্ত বহ্নি মুখে পতঙ্গ পতনোন্মুখ হইয়াছে; দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সেই পতঙ্গ দগ্ধ হইতেছে; তাহার পক্ষপত্র সকল জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত শিখা লইয়া পতঙ্গ ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে—দহ্যমান, উড্ডীয়মান, ফর্‌ফরায়মান, দেদীপ্যমান, মহাপাপী মাক্‌বেথ—স্কটলাণ্ডের মহারাজা।

বৈশেষিক দর্শন।

(১) বৈশেষিক সূত্র—কণাদ মুনি প্রণীত,১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক অধ্যায়ে ২ টী করিয়া আহ্নিক।

(২) পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ।

(৩) উপস্কার—শঙ্করমিশ্র প্রণীত।

(৪) বিবৃতি জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রণীত।

(৫) বৈশেষিক দর্শনং মহামোহপাধ্যায় শ্রী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্য সমেতং।

সকলেই জানেন, সংস্কৃতে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনই প্রাচীন এবং প্রধান. এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ প্রভৃতি অনেকগুলি নব্য দর্শনও আছে। ইহার মধ্যে বৈশেষিক দর্শন মহর্ষি কণাদ প্রণীত। কণাদের আর একটি নাম উলুক। "বিরুদ্ধাসিদ্ধ সন্দিগ্ধ মলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ" এই বচনে বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা 'কাশ্যপ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কণাদের অন্য পরিচয় নাই; বৈশেষিক দর্শনের সময় নিরূপণ করাও অসাধ্য।

এই জগতে অনন্ত পদার্থ, জড়, চেতন, উদ্ভিদ, অনন্তরূপ। এই অনন্ত পদার্থরাশিকে এক একটি করিয়া জানিতে হইলে অনন্তকালেও জানা যাইতে পারে না,মনুষ্য জীবনের অল্প কালের ত কথাই নাই। এদিকে উহাদের জ্ঞান না হইলেও মনুষ্যের পুরুষার্থ লাভ হয় না। এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সেই অনন্ত পদার্থসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে সমুদয় পদার্থগুলি এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। এই ছয়টিমাত্র পদার্থের নাম করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন এই ছয়টি ভাবাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে মাত্র, এতদরিক্ত অভাব নামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ যে সূত্রকারের অভিপ্রেত, সে বিষয় কোন সংশয় নাই, কারণ তিনি নিজে অনেক সময় অনেক সূত্রে অভাবশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অভাব পদার্থ যে বৈশেষিক দর্শন সম্মত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার নামোল্লেখ না করিবার কারণ এইরূপ বোধ হয়। সূত্রকার পদার্থ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই, মনুষ্যকে মোক্ষপথের পথিক করিবার নিমিত্তই তাঁহার প্রবৃত্তি এবং সেই জন্যই প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ করিলেন—

ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্॥

ধর্ম্মবলে বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে, উৎপন্ন যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়--এই কয়টি পদার্থের সাধর্ম্ম্যের (অনুগত ধর্ম্মের) এবং বৈধর্ম্মের (বিরুদ্ধ ধর্ম্মের) যে জ্ঞান, তাহা হইলেই মোক্ষ পথের পথিক হওয়া যাইতে পারে। কোন ধর্ম্ম কোন পদার্থে আছে, কোন পদার্থেই বা নাই, ইহা ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ইহাই তাৎপর্য্য।

এরূপ স্থলে অভাবের উল্লেখ না থাকিবারই সম্ভাবনা। বিশেষ বৈধর্ম্ম্য কথাটি যখন অভাবসংশ্লিষ্ট, তখন অভাব পদার্থ যে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এ কথাও আমরা বলি না।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয় তাহা বিবৃতি-কার জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন। পুণ্য বিশেষ বলে দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান হয়; তাহার পর আত্মমনন, আত্মমননের পর নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। বৈশেষিকদিগের মতে মোক্ষ শব্দের অর্থ দুঃখ নিবৃত্তি। পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং মন এই নয়টি দ্রব্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই সপ্তদশটী গুণকে কণাদ স্পষ্ট করিয়া সূত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং শব্দ এই সাতটি গুণ ও তাহার অভিপ্রেত, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী গুণ।

উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ,) অবক্ষেপণ (নীচের দিকে নিক্ষেপ,) আকুঞ্চন (জড় করা,) প্রসারণ (বিস্তার করা) এবং গমন (যাওয়া) এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, (ক্রিয়া)। ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যক গমন প্রভৃতি ক্রিয়াসকল গমনেরই অন্তর্গত সুতরাং পাঁচের অধিক কর্ম্ম (ক্রিয়া) নাই।

সামান্য দুই প্রকার, পর এবং অপর, তাহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম এই

তিনেতে বর্ত্তমান সত্ত্বানামক সামান্য পর, অর্থাৎ অধিক পদার্থে বর্ত্তমান। এবং কেবল দ্রব্যত্বাদি অপর, অর্থাৎ অল্প পদার্থে বর্ত্তমান।

বিশেষ—এক প্রকার ধর্ম্ম। সমবায় এক প্রকার সম্বন্ধ।

পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার এইরূপে ষট্ পদার্থের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভেদ মাত্র জানিয়া পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্রব্য।—মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণং দ্রব্যম্। ১। ১। ১৫ ॥

যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় এবং সমবায়ি কারণ তাহার নাম দ্রব্য। সমবায়ি কারণ শব্দে উপাদান বা প্রকৃতি। দ্রব্য কি তাহা আমরা প্রকৃতরূপে জানিতে বা বলিতে পারি না, তবে তাহার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি মাত্র; সে লক্ষণগুলি এই—ক্রিয়াযুক্ততা, গুণযুক্ততা এবং সমবায়ি কারণতা।

গুণ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১। ১ ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, স্বয়ং ' গুণ 'শূন্য, যাহা কখন কোন গুণের আশ্রয় হয় না, এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও কারণ হয় না অর্থাৎ যাহা কর্ম্ম নয়, তাহার নাম গুণ।

কর্ম্ম। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন,—

এক দ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতিকর্ম্ম লক্ষণম্। ১। ১। ১৭ ॥

যাহা একমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহা কোনরূপ গুণের আশ্রয় নয় এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ কারণ, তাহার নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে অনন্ত পদার্থরাশি অনন্তরূপ হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে তিনটীমাত্র মৌলিক ভেদ লক্ষিত হয়। (১) কতকগুলি, জগতের যাবৎ বস্তুর উপাদানস্বরূপ এবং ক্রিয়া ও

গুণের আশ্রয়। (২) ঐ সকল বস্তুর ধর্ম্ম, যেমন রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি। (৩) ক্রিয়া গতি, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, বেগ প্রভৃতি। জগতে যা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায় এই তিনেরই অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে প্রথমটির নাই দ্রব্য, দ্বিতীয়টির নাম গুণ, তৃতীয়টির নাম কর্ম্ম *।

বিবৃতিকার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।

"নিত্যত্বে সত্যনেক সমবেতত্বং সমানত্বং।" সামান্য একটি ধর্ম্ম যাহা নিত্য, অবিনাশী, ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই বিদ্যমান এবং একেবারে অনেকে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। যেমন গোত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রভৃতি জাতি। জাতি নিত্য, কোন কালেই উহার ধ্বংশ নাই, এবং যুগপত্ অনেকেতে অবস্থান করে। সমুদয় গোরুতেই গোত্ব আছে, সমুদয় অশ্বতেই অশ্বত্ব থাকে, এইরূপ মনুষ্যত্ব সমুদয় মনুষ্যে বর্ত্তমান।

বৈশেষিকদিগের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও তাহাদের অবান্তর ভেদেই এই জাতি অবস্থান করে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব এবং পৃথিবীত্ব, জলত্ব, রূপত্ব এই সকল জাতি; জাতির আর জাতি নাই; কেন না জাতির জাতি তার জাতি এইরূপে অনবস্থা হয়, বরাবরই চলিতে থাকে, কোন ঠাঁই আর নাগাড় মরে না।

"জাতিমদ্ভিন্নত্বে সত্যেকমাত্র সমবেতত্বং বিশেষত্বম্।"

জাতিমদ্ভিন্ন হইয়া, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্মে না হইয়া, একমাত্র সমবায় সম্বন্ধে যাহা অবস্থিত, তাহার নাম বিশেষ। এই বিশেষ পদার্থের জন্য বৈশেষিক দর্শন। এই বিশেষ ও একটী ধর্ম্ম,—একজাতীয় পরমাণুকে অন্য জাতীয় পরমাণু হইতে ভেদ করিবার নিমিত্তই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

কারিকাবলীতে সমবায়ের স্বরূপ অতি সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

---

* তর্কালঙ্কার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে বাস্তবিক ধরিতে হইলে এই তিনটীই মূল পদার্থ, অবশিষ্ট সামান্যাদি তিনটীকে ইহাদের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্গত করা যাইতে পারে, অতএব উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নয়।

অর্থাৎ অবয়ব অবয়বীতে, (সমুদয়ে ও অংশে) যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া অবস্থান করে, এবং দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে জাতি যে সম্বন্ধে থাকে,—সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধ সকল স্থলেই একরূপ; ইহার আর ভেদ নাই *।

দ্রব্যের বিভাগ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; উহাদের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্য নিত্য (অবিনাশী) এবং অনিত্য (বিনাশী) এই দুই প্রকারই হয়। ইহারা পরমাণুরূপে নিত্য এবং তদ্ভিন্নরূপে অনিত্য। ইহাদের শেষ সূক্ষ্ম অংশ, যাহা হইতে আর অংশ নির্গত হয় না, তাহার নাম পরমাণু। পরমাণুসকল নিত্য এবং রূপবিশিষ্ট। অগ্নি সংযোগ দ্বারা পার্থিব পরমাণুর রূপান্তরও ঘটিয়া থাকে। অবশিষ্ট পাঁচটী দ্রব্য নিত্য, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাহাদের ধ্বংশ নাই। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূত বলিয়া অভিহিত হয়; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায় ও মনঃ এই পাঁচটী মূর্ত্ত (আকারবিশিষ্ট) বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনিত্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুকে কার্য্য দ্রব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্য দ্রব্য—শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে শরীর আবার দুই প্রকার: কতকগুলি যোনিজ ও কতকগুলি অযোনিজ।

পৃথিবী—গন্ধের সমবায়িকারণ দ্রব্যকে পৃথিবী বলে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ; তবে জলাদিতে যে গন্ধের অনুভব হয়, তাহা কেবল উহাতে পার্থিবাংশ মিশ্রণ নিবন্ধন সংক্রান্ত হয় মাত্র। গন্ধ দুই প্রকার সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ। গন্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, (দূরত্ব) অপরত্ব (নিকটত্ব) গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ এবং স্থিতি এই সকল গুণও থাকে †।

---

* পদার্থধর্ম্মসংগ্রহকার বলেন—"অযুত সিদ্ধানা মাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ" অর্থাৎ যে সকল বস্তু অমিশ্রণে সিদ্ধ অথচ পরস্পর আধার আধেয় ভাববিশিষ্ট, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের নাম সমবায়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন ইহা আর কিছুই নয় পৃথক্ত্বের বিপরীত গুণ মাত্র। বিবেচনা করিলে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটিই গুণ বিশেষ সুতরাং তিনটীকে পৃথক্ পদার্থ না বলিয়া গুণশ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারিত।

† সূত্রকার পৃথিবীর পরীক্ষা স্থলে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ এই

কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল এই ছয়টি রসই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে অনুষ্ণ, অশীত এই দ্বিবিধ স্পর্শ অবস্থিত। পার্থিব শরীর চারি প্রকার,—জরায়ুজ, অণ্ডজ,স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ। আর বিষয়—দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত।

জল।—শুক্লরূপবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম জল—জলের জলত্ব ধর্ম্ম জাতি। জলের শুক্লরূপই স্বাভাবিক,তবে কারণবশত অন্যপ্রকার রূপও ঘটিতে পারে; যেমন যমুনার জলের কাল রূপ। জলের মধুর রস স্বাভাবিক বিশেষ কারণাধীন ইহাতে অন্যপ্রকার রসও অনুভূত হয়। জলের নিজ স্পর্শ শীতল তবে অগ্নি প্রভৃতির সংযোগে অন্যরূপ স্পর্শও অনুভূত হয়, বটে তাহা কৃত্রিম মাত্র। স্বভাবতই জলের দ্রবত্ব গুণ। এতদ্ভিন্ন সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ এবং বেগ এ সকল গুণও জলে অবস্থান করে। জলীয় শরীর অযোনিজ বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়;—রসনা, এবং বিষয় হিমকণা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত।

তেজঃ—উষ্ণ স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজঃ। চন্দ্রকিরণ তেজঃ পদার্থ বটে কিন্তু উহাতে জলের সংশ্লেষ হেতু উহার স্বাভাবিক উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয় না। এইরূপ মরকত সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস পদার্থে মৃত্তিকার

চারটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উপস্কার রচয়িতা শঙ্করমিশ্র বলেন পৃথিবীতে নীল, পীতাদি অনেক প্রকার রূপ আছে। বিবৃতিকার জয়নারায়ণ বলেন নীল, শুক্ল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র এই সাত প্রকার রূপই পৃথিবীতে থাকে। ভাষ্যকার তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাঁহার কথায় আগন্তুক কারণবশত পৃথিবীর অন্যপ্রকার রূপ হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইতেছে বটে,কিন্তু কৃষ্ণরূপ যে স্বাভাবিক এই কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ; সেই প্রমাণটুকু দর্শিত না হওয়ায় গোলযোগ বাধিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাহার পরই বলিতেছেন গন্ধই পৃথিবীর নিজ গুণ, রূপাদি কারণ গুণক্রমে উৎপন্ন। সুতরাং কথাটা শুনিলেই মনে যেন একটা ধাঁদা লাগে। ফল তিনি ভাষ্য করিতেছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। এ সকল কথা একটু খুলে না লিখিলে, আমাদের মত মূর্খ লোকে বুঝে কিরূপে?

সংমিশ্রণ নিবন্ধন, উহাতে স্পর্শের উষ্ণতা অনুভূত হয় না। উপরিউক্ত উষ্ণ স্পর্শ ভিন্ন তেজে রূপ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগ এই সকল গুণও লক্ষিত হয়। তেজের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল অর্থাৎ চক্‌চকে শাদা, তবে অগ্নিতে বা সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থে, পার্থিব রূপের সাম্মিশ্রণ থাকায় উহা লক্ষিত হয় না। তেজে যে দ্রবত্বের (ঢল ঢলে ভাবের) কথা বলা হইয়াছে, উহা নৈমিত্তিক, এবং সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ মাত্রে বর্ত্তমান হয়। কার্য্যরূপ তেজও—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় ভেদে তিন প্রকার; তৈজস অযোনিজ শরীর সূর্য্যালোকাদিতে প্রসিদ্ধ; তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ; এবং বিষয়—বহ্নি ও সুবর্ণাদি। অত্যন্ত অগ্নি সংযোগেও সুবর্ণাদির ঢল ঢলে ভাব একবারে শুকাইয়া যায় না দেখিয়া উহাদিগকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তৈজস পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বায়ু— বায়ু এক প্রকার দ্রব্য উহারও স্পর্শ গুণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে স্পর্শ অনুষ্ণ বা অশীত নয়। উক্ত স্পর্শ ভিন্ন বায়ুতে সংখ্যা, পরিমিতি পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ এই আটটি গুণও থাকে। প্রাচীনেরা বলেন বায়ুতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু উদ্ভূত স্পর্শ থাকায় ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে কণাদমুনি কি বলেন দেখা যাউক—

মহর্ষি কণাদ প্রথমে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—

মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ। ৪। ১। ৫।

এই সূত্রের প্রাচীন সম্মত অর্থ—

উপলব্ধি শব্দের অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; এই প্রত্যক্ষ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুরই হইয়া থাকে; পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না? যদি বল বায়ু প্রভৃতির ত মহৎ পরিমাণ আছে, তাহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না? ইহার উত্তর এই যে, সূত্রে এই জন্যই রূপাৎ এই কথা বলিয়াছেন; রূপাৎ শব্দের অর্থ রূপ থাকা চাই। কেবল মহৎপরিমাণ থাকিলেই, যে বস্তুর উপলব্ধি হইবে, তাহা নয়, উহাতে রূপ থাকা আবশ্যক। অতএব বায়ু প্রভৃতির পরিমাণের মহত্ত্ব থাকিলেও, রূপ না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে স্পর্শ এবং রূপ—দ্রব্যে একরূপই সম্বন্ধে থাকে, এক্ষণে দেখ বায়ুতে যখন স্পর্শ আছে, তখন রূপ থাকিবার যোগ্য

সম্বন্ধ ও আছে; একটা নিয়ম আছে যেখানে সম্বন্ধ আছে সেইখানে সম্বন্ধীও আছে; অতএব বায়ুতে রূপ থাকা হেতু বায়ুর উপলব্ধি হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে মহর্ষি কণাদ বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপ সংস্কারা ভাবাদ্বায়ো রনুপলব্ধিঃ॥ ৪। ১। ৭।

বায়ু মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও উহাতে রূপ সংস্কার না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। এই সূত্রের তাৎপর্য্য কেবল সংস্কার পদের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। শঙ্কর মিশ্র বলেন—" সংস্কার পদেন রূপ সমবায়ো রূপোদ্ভবো রূপানভিভবশ্চ বিবক্ষিতঃ।" সংস্কার শব্দের অর্থ রূপ নিরূপিত সমবায় বা রূপের উৎপত্তি, অথবা অন্য রূপ দ্বারা অনাবরণ। এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিতেছেন যে, যদ্যপি বায়ুতে যে স্পর্শ সমবায় তাহা রূপ সমবায়ের সহিত এক হইলেও উহাতে রূপ নিরূপিতত্ব নাই; কারণ বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাবই দেখা যায়; এইরূপ চক্ষুর রশ্মিতে রূপের উদ্ভব নাই এবং মধ্যাহ্নকালীন উল্কাপাতে অন্য রূপের অনাবরণ নাই বলিয়া উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহলে শঙ্কর মিশ্রের মতে রূপ সংস্কারের অর্থ তিন প্রকার দেখা গেল; উহাদের মধ্যে যে কোন একটির অভাব থাকিলে আর প্রত্যক্ষ হয় না।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেন "রূপসংস্কারঃ সংস্কৃতং রূপং উদ্ভূতানাভিভূতরূপমিতি যাবৎ। তদভাবাৎ তাদৃশ রূপত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাবাৎ।" রূপ সংস্কার বলিতে সংস্কৃত রূপ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ যোগ্য অথচ, অনভিভূত রূপ; তার অভাব হেতুক অর্থাৎ তাদৃশ রূপের অধিকরণ না হওয়ায় বায়ুর রূপের উপলব্ধি হয় না; যদি বল যেখানে সম্বন্ধ থাকে সম্বন্ধীও সেই স্থলে থাকে,—এই নিয়মে বায়ুতে রূপ কেন না থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন যে এ কথা বলিতে পার না; বায়ুতে রূপ নাই ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপের অভাবই ঐ নিয়মের বিরোধী। যেখানে এরূপ কোন বাধক নাই বরঞ্চ কোনরূপ সাধক থাকে, সেইখানেই —যেখানে সম্বন্ধ সেইখানে সম্বন্ধী—এই নিয়মের প্রবৃত্তি জানিবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরসূত্রের সহিত স্বমতের মিল রাখিবার জন্য ৪।১।৫ *

---

* দ্রব্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আমরা কতকগুলি গুণের প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সকলের আশ্রয় দ্রব্যের জ্ঞান লাভ।

সূত্রস্থিত রূপ শব্দের অর্থ—রূপ-সংস্কার করিয়াছেন। তাহার পর ৪।১।৬ সূত্রের অর্থ করিলেন বায়ুতে রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপের সংস্কার না থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না। তাঁহার এই সংস্কার কথাটিই মহা গোল বাধাইয়াছে; কারণ সংস্কার জিনিসটা যে কি,তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই ভাঙ্গিয়া দেন নাই; কাযেই রূপের সংস্কার স্বতঃসিদ্ধ অথবা নিমিত্তাধীন এবং কিরূপ সংস্কার হইলেই বা প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ভাল করিয়া বুঝান নাই।

বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তাই বলে বায়ুতে যে রূপ নাই ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ খোলা হাঁড়ীর উত্তাপ, গ্রীষ্মের উষ্ম, চক্ষুর আলোক,—ইহাদের রূপ আছে, অথচ উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে বায়ুর রূপ নাই শুধু এই কথা মাত্রে যদি বায়ুর রূপ না থাকে, তা হলে আর কথা নাই। যদি বল পুরাণাদিতে আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ এইরূপ সৃষ্টি ক্রম কথিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বায়ুর উপাদান আকাশ তাহাতে রূপ না থাকায় বায়ুতে রূপ হইবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব তেজে যে রূপ আছে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু তেজের উপাদান বায়ু বায়ুতে রূপ না থাকিলে তেজে রূপ আসিবে কোথা হইতে? অতএব যদি উপাদান অনুসারে বস্তুর গুণ নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বায়ু যে একেবারে রূপ শূন্য এ কথা বলা যাইতে পারে না।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে ঐ বায়ু আবার তিন প্রকার; বায়বীয় শরীর অযোনিজ পিশাচাদির দেহ; ইন্দ্রিয়—সর্ব্ব শরীর ব্যাপি ত্বক্; এবং বিষয় প্রাণ অপানাদি হইতে মহা প্রলয়কারী ঝড় অবধি।

আকাশ—শব্দের সমবায়ি কারণ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয়ের নাম আকাশ। যদি বল আকাশনামক একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? বায়ুকেইত সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় বলিলে হয়, ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন,এ কথা বলিতে পার না; কারণ বায়ুর

আধুনিক মতের খণ্ডন করিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে যদি কেবল গুণ মাত্রের প্রত্যক্ষ হইত, তাহলে আমাদের জল ও স্থলের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান হইত না, স্থলে জলের কার্য্য এবং জলে স্থলের কার্য্য করিতে হয়ত আমরা প্রবৃত্ত হইতাম।

বিশেষ গুণ স্পর্শ—যাবদ্দ্রব্য স্থায়ী (যতক্ষণ আশ্রয় দ্রব্য বর্ত্তমান হয়, ততক্ষণ অবস্থান করে); শব্দ সেরূপ নয়, অল্পক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে পার না; এই নিমিত্ত শব্দের আশ্রয় বলিয়া আকাশ নামক একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে*। আকাশে ছয়টি গুণ থাকে; শব্দ এবং সংখ্যাদি পাঁচ। আকাশ এক হইলেও কর্ণকুহর প্রভৃতি উপাধিভেদে নানা প্রকার। আকাশের ইন্দ্রিয়—কর্ণ।

কাল বা সময়—বড়, ছোট ইত্যাদি বুদ্ধির হেতু, ইহা নিত্য এবং এক অর্থাৎ সজাতীয় রহিত। কাল এক হইলেও ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর আদি উপাধি ভেদে নানা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাল কালিক সম্বন্ধে সমুদয় জগতের আশ্রয়, এবং সমুদয় জন্য বস্তুর প্রতি নিমিত্ত কারণ। "কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকাল পরিকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদি পুরাণ বাক্যই কালের সত্তা বিষয়ে প্রমাণ।

দিক্—দূর এবং নিকট ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুই দিক্; কালের মত

---

* আকাশ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বিবৃতিকার নিম্নলিখিত অনুমান পরম্পরা দেখাইয়াছেন। (১) শব্দ একটি বিশেষ গুণ (কোন এক বিশেষ দ্রব্যাশ্রিত গুণ) কারণ ইহা চক্ষুর গ্রাহ্য নয় অথচ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য; যাহা চক্ষুর গ্রাহ্য না হইয়া বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় তাহাকেই বিশেষ গুণ বলে যেমন স্পর্শ; তাহার পর (২) শব্দ যখন গুণ, তখন উহা সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্যে অবশ্যই বর্ত্তমান হইবে; কারণ গুণ মাত্রেই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে। এক্ষণে শব্দ কোন্ দ্রব্যের বিশেষ গুণ? ইহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কারণ ইহা অপাকজ (অগ্নি সংযোগাদি জন্য পরিণাম জাত নয়) অকারণ-গুণ-পূর্ব্বক (কারণ=উপাদান তাহার গুণের অনুযায়ী নয়) এবং প্রত্যক্ষ; ক্ষিতি জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা পাকজ, উপাদান গুণানুসারী। তাহার পর শব্দ যখন বিশেষ গুণ তখন উহা দিক্, কাল, বা মনের গুণ হইতে পারে না; কারণ দিক্, কাল ও মনে কোন বিশেষ গুণ থাকে না, এবং ইহা যখন বহিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তখন আত্মার বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কাজেই শব্দের আশ্রয় একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্বতন্ত্র দ্রব্যের নামই আকাশ।

দিক্ নিত্য ও এক। দিক্ এক হইলেও পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি উপাধি ভেদে নানারূপে প্রতীত হয়; যাহার যে দিকে সূর্য্য উদিত হয় সেই তাহার পূর্ব্বদিক, এবং যেদিকে সূর্য্যের অস্ত হয়, উহা পশ্চিম দিক্; পূর্ব্বাভিমুখ দাঁড়াইলে বাম হাতের দিকের নাম উত্তর এবং দক্ষিণ হাতের দিকের নাম দক্ষিণ। বোধ হয় দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণদিকের নামের মধ্যে পরস্পর এইরূপ কোন কার্য্যকারণতা থাকিবে। দিকে সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ অবস্থান করে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কাল, দিক্ এবং আকাশ এই তিনটি একই পদার্থ কেবল কার্য্যভেদে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। এ একটা নূতন কথা বটে একটু স্পষ্ট করে বুঝাইলে ভাল হইত।

আত্মা—আত্মা দুই প্রকার জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; এই উভয়বিধ আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয়। ইহার মধ্যে জীবাত্মাকে সংসারী বলিয়া অভিহিত করে। ছেদনাদির সাধক কুঠারাদি যেমন কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সাধক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও কর্ত্তা ভিন্ন কিরূপে ফল নিষ্পাদনে সক্ষম হইবে? এই নিমিত্ত দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছিল দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই; এই দেহই চৈতন্যের আশ্রয় এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া থাকে। বৈশেষিকেরা বলেন তাহা হইতে পারে না; যদি দেহই আত্মা হইত, তাহলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তুর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ হইত না; কারণ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কেননা পরিমাণ ভেদে যে দ্রব্যসকল ভিন্ন হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ যদি ভিন্ন হইল তবে একের অনুভূত পদার্থ অপরে কিরূপে স্মরণ করিবে? রামের অনুভূত বস্তুর কি গোপাল স্মরণ করিতে পারে? যদি বল বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে; বাল্যকালের দেহকে বৃদ্ধকালের দেহের কারণ বলা যাইতে পারে, অতএব কারণের অনুভূত বস্তু কার্য্য স্মরণ করুক না কেন? ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাহলে মায়ের অনুভূত পূর্ব্ব বস্তু পুত্রে স্মরণ করিতে সক্ষম হইত। আরও দেখ শরীরের চৈতন্য হইলে, সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে এবং অর্দ্ধ প্রসূত বানর শিশুর সন্নিহিত শাখা অবলম্বনে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ সকল

কার্য্য যে আপনার হিতকর এরূপ বুদ্ধি হওয়াই অসম্ভব; কিন্তু আমাদের মতে পূর্ব্বজন্মে অনুভূত ইষ্টসাধনতার তখনই স্মরণ হওয়ায়,তাহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি বল পূর্ব্বজন্মানুভূতের স্মরণ হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে পূর্ব্বজন্মেত আরও কত বস্তুর অনুভব হয়, তাহাদের স্মরণ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে সেরূপ স্মরণ হওয়ার প্রতি কোনরূপ উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হয় না।

পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করায় বৈশেষিকদিগের মতে সংসার যে অনাদি তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল এবং সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধির সঙ্গে আত্মাও যে অনাদি তাহাও সিদ্ধ হইল এবং সেই অনাদি ভাবের নাশ না হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল; যদি বল দেহও আত্মা ভিন্ন হউক, মন এবং আত্মা কেন এক হউক না? মন হইতে স্বতন্ত্র আত্মা মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন,—মন, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; উহার জ্ঞানাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের (যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার) মহত্ত্বই কারণ; মন সূক্ষ্ম হওয়ায় কোনরূপ প্রত্যক্ষের আশ্রয় হইতে পারে না *। এই সকল কারণে দেহ ও মন

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, শরীর ও মনের চৈতন্যাভাবের প্রতি নিম্নলিখিত যুক্তি কয়টি দেখাইয়াছেন,—শরীরে চৈতন্য নাই, কারণ শরীরের কারণ পরমাণুতে চৈতন্য থাকার কোন প্রমাণ নাই। আরও দেখ পার্থিব বস্তুর গুণ সকল উপাদান কারণের গুণ অনুসারেই উৎপন্ন হয়, কোন কোন শরীরে জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়, কোন কোন শরীরে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই দেখা যায়; অতএব শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে এরূপ বৈষম্যের প্রতি একটা বিশেষ হেতুর নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আরও দেখ শরীরের গুণ রূপাদি প্রতি শরীরেই ভিন্ন প্রকার দেখা যায়, এবং শরীরের উপলব্ধির সহিতই তাহাদের উপলব্ধি হয় কিন্তু শরীরের সহিত জ্ঞানের উপ-লব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের চৈতন্য নিরাকরণের পক্ষে এই যুক্তি জানিবা। মনও আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ মন আত্মার সুখাদি অনুভবের করণ মাত্র, যাহা করণ, তাহা কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যেমন রূপাদি জ্ঞান সাধনের সহিত বর্ত্তমান এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন, সেইরূপ সুখাদি অনুভবেরও একটা সাধন আবশ্যক করে; মনই তাহাদের সাধন।

হইতে ভিন্নরূপ একটি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই কল্পনীয়। জীবাত্মা অনেক এবং প্রতি দেহে ভিন্নস্বরূপ; পরমাত্মা একই; তিনিও আবার জীব-সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ *। উভয় আত্মাই পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপক; কিন্তু বুদ্ধি আদি ছয়, সংখ্যা আদি পাঁচ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ভাবনা নামক সংস্কার—এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মাতে বর্ত্তমান; ঈশ্বরে কেবল আটটি গুণ অবস্থান করে সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, এবং যত্ন। ঈশ্বরস্থিত বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং যত্ন নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয় ব্যাপী। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি অনুমান এবং আগম উভয়বিধ প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। অনুমানের আকার—ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি জগৎসৃষ্টি যখন কার্য্য, তখন তাহাদের অবশ্য একজন না একজন কর্ত্তা আছেন, কারণ কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা থাকে; জগৎ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। আগম "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"।

মনঃ—সুখাদি জ্ঞানের সাধন। মনের অস্তিত্ব বিষয়ে বৈশেষিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, আমাদের সকল প্রকার জন্য জ্ঞানেরই এক একটা করণ আছে; সুখাদির জ্ঞানও জন্য জ্ঞান; অতএব উহারও একটা না একটা করণ অবশ্য অঙ্গীকার্য্য; সেই করণকেই মন বলে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগই বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; কিন্তু মন পরমাণুতুল্য অতি সূক্ষ্ম; এককালে একের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, এই জন্য এককালে একমাত্র ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানই হয়, কখন দুই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান এককালে হয় না। মনের অবয়ব বা অংশ নাই এবং প্রতি শরীরে একএকটি স্বতন্ত্র মন অবস্থান করে।

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন—উপাধি ভেদেই আত্মার ভেদ লক্ষিত হয়; বস্তুগত্যা আত্মা একই। যদি বল আত্মা যদি একই, তবে ঐ একই আত্মার সুখ দুঃখাদি ভিন্নরূপ ভোগ সম্বলিত নানাবিধ দেহে অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কারণ একই প্রদেশে কাল-ভেদে, এবং একই কালে দেশ-ভেদে, নানারূপ দেহ ধারণ করা—আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

উচ্ছ্বাস।

অশান্ত অবোধ মন! ঘোর অন্ধকারে বসি,
কত কাল র'বি আর নিঝুম হইয়া?
বুকের ভিতরে তোর, অন্ধকার স্তূপীভূত,
হইতেছে,—একবার দেখ নিরখিয়া।
পাপের সংসার সদা, টলমল করে পাপে,
প্রাণ ভরি পাপ তুই কেন নিস বুকে?
আপনার মর্ম্ম স্থলে, আপনি বিন্ধিয়া ছুরী,
সহিষ্ণুর পরিচয় কেন দিস মুখে?
হৃদয়েতে বল নাই, দুবলী হয়েছ বড়
শান্তিহারা এখন(ই) যে হবি তুই মন।
নিরাশা বুকেতে বসি দেখাইছে ভয় তোরে,
নিরাশার ভয়ে তোর অশ্রু বরিষণ।
কেঁদে কেঁদে রুগ্ন মন বিকারে বিহ্বল হবে
যে টুকু চেতনা আছে, হবে বিচেতন।
তাই বলি এই বেলা স্থির ভাবে বসি ও রে
চৈতন্য মধুর মূর্ত্তি কর রে স্মরণ।
"নীরদ বিজলীমাখা আধা রাধা আধা শ্যাম
মাধুর্য্য রসের খনি উজ্জ্বল বদন।"
মন তুই কর বিলোকন।
হৃদয়েতে শক্তি হ'বে অন্ধকার পলাইবে,
হরি হরি বলি মন ডাক রে উল্লাসে।
বিথারিবে স্বর্গজ্যোতিঃ অন্ধকার পূর্ণ মনে;
পূর্ণ হবে চিত্ত আহা পারিজাত বাসে।

জগাই মাধাই আয় দুই ভাই,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাঁধি হরি গুণ গাই,

প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া নাচিয়া,
নামের গরিমা গাহিয়া গাহিয়া,
প্রেমের মহিমা প্রচার করিয়া,
মাতোয়ারা করি প্রাণ।

ছুটে আয় হেথা জগাই মাধাই,
করতালি দিয়া হরি গুণ গাই,
তোদের সরস কণ্ঠ গীতি হায়!
করিলে শ্রবণ আবার ধরায়,
জগত মাতাতে আসিবে নিমাই,
এই বেলা আয় সবে মিলে গাই—
পাতকী মোচন গান;

বাজাইয়া খোল, বল হরি বোল,
নিমাই আসিয়া দিবে সবে কোল;
কে আছিস আয় উচ্চ কণ্ঠে গাই,
হরি গুণ গান দিবা নিশি ভাই!
দুনয়ন দিয়া প্রেমের নিঝর,
ঝর ঝর করি ব'বে নিরন্তর,
হৃদয় আঁধার পলায়ে যাবে,
নব বল মন আপনি পাবে,
মলয় পবন প্রাণেতে ব'বে॥

ধর ধর ধর তান
গাও তবে মন গান।
দুঃখেরই আগার,
তাপিত সংসার,
বারেক ভুলিয়া যা,
মুখে হরি গুণ গা,
মনে হরি গুণ গা,
মনে প্রাণে আহা এক করিয়া
বল তোরা ঐ রা॥

প্রিয় মন রে আমার!
র'বি কত কাল পাপে ডুবে আর?
কিসের সংসার? কাহার সংসার?
পাপের সংসার, পাপের আধার।
থাকিস্ আবদ্ধ কেন?
কেন রে উন্মাদ হেন?
নিজের মঙ্গল বারেক মনটি, কর কর বিলোকন।
আপন বলিয়ে, যাহার নিকট
ক্রীতদাস হ'তে চাও,
(তা'রা) কখনই তোর আপন হবে না
চিরদিন তোর নিকটে র'বে না
তবে——তা'দের কেন রে চাও?
চিরদিন যেই আপন আপন,
তাহার নিকটে বিকাইতে মন
মন রে আমার ধাও।
প্রাণ ভরি সেই দয়াময় নাম
মন রে আমার গাও।

ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়ে আর কি ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
মুখে হরি নাম বল।
প্রাণের আঁধার দূরে পলাইবে,
হৃদয়ের পাপ টুটিয়া যাইবে,
রাধা শ্যাম নাম কর, উচ্চারণ
ওবে রে অবোধ মন!
ঐ দুটি নাম ভকতি নিঝরে,
স্থাপন করিলে হৃদয়েব থরে,
দুটি মিলি এক হ'বে।
মনে যদি ভক্তি থাকে তবে রে হৃদয় দিয়া
ভক্তিকালিন্দীর বেগে ছুটিবে এখন,
মনকদম্বেরতট মূলে রাধা শ্যাম কুতূহলে
ধীরে ধীরে করিবে নর্ত্তন।
কখন বা ক্লান্ত হ'য়ে ভক্তি যমুনার জলে
রাধা শ্যাম দুই জনে দিবে গো সাঁতার।
মনের বাসনা গুলি গোপিকার বেশি ধরি,
সদাই হরষে মাতি করিবে বিহার।

ধাবমান কাদম্বিনী মনকুঞ্জ বিতানেতে
বিষাদে বিথারি আহা পড়িবে যখন,
শ্যামের সোহাগ পেয়ে মানমেঘ প্রেমে মিশি
মনোহর ইন্দ্র ধনু করিবে সৃজন।
মনের বিজন বনে নিশীথ মুরলী ধ্বনি
'মুঞ্চমান' বলি আহা উঠিবে বাজিয়া,
ভকতির যমুনা গো অমনি উজান বহি
শুনিতে বেণুয়া গান আসিবে ছুটিয়া।
ত্যজি জগতের আশা,
ত্যজি সিন্ধু ভাল বাসা,
প্রফুল্ল তরঙ্গ গুলি বুকেতে ধরিয়া।
লালসা বাসনা নীরবে থেক না
কেশবের নাম গাও।
কিছুরই অভাব রবে না রবে না
কেশবের গুণ গাও।
মায়ার শিকল ভেঙ্গে চুরে ফেলি,
বারেক অবোধ মন!
ত্রিভঙ্গ মূরতি ধ্যান কর তুই
করিয়া কঠোর পণ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়া কি আর ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
সদা হরিনাম বল।

কঙ্গ্রেস।

আমরা নিয়ত যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই সকল কার্য্যে, আমরা ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি, তাহাই অনেক সময় বুঝিতে পারি না। আমরা অনেকেই সিদ্ধ তণ্ডুল ধ্বংশ করি, না করিলে চলে না; কিন্তু সেই কাজটাই যে আমাদের ঠিক কাজ হইতেছে, তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না; বুঝান ত দূরে আস্তাং। অনেক সময় অনেকের মনে এমন ধারণা হয়, যে আমরা যদি তণ্ডুল ধ্বংশ না করিয়া গোধূম চূর্ণ বা যব চূর্ণ প্রত্যহ ধ্বংশ করি, তাহা হইলে, আমাদের ভাল হয়।

আমাদের নিজের নিত্যকার্য্যের ভাল মন্দ বিচারে যখন এইরূপ খট্‌কা হয়, তখন এক ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমূহের অনুষ্ঠিত কোন একটি নূতন কার্য্যে

যে অন্যান্য ব্যক্তির নানারূপ খট্‌কা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কঙ্গ্রেসের মত একটি গুরুতর নূতন ব্যাপারে, যে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষ হইতেই নানারূপ খট্‌কা উঠিতেছে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই।

রাজা প্রজা মধ্যে অস্ত্রের সংঘর্ষণ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইলেও, পৃথিবীর কুত্রাপি ওটি নূতন জিনিস নহে। 'বলং বলং বাহুবলং' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' 'জোর জার, মুলুক তার,' এ সকল কথা সকল দেশের রাজা প্রজা সকল সময়েই জানেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহুবলের, বা অস্ত্রবলের কোন প্রয়োগ না করিয়া, রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার নিয়ত সংঘর্ষণ —অতি নূতন কাণ্ড, বড় বিচিত্র ব্যাপার।

আজি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ য়ুরোপীয় রাজনীতি ক্রমে ক্রমে এই ছাঁচে গঠিত হইতেছে; রাজনীতি বলিয়া একটা জিনিষ সকল দেশেই ছিল ও আছে; এই পঞ্চাশ বৎসর য়ুরোপে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি প্রজানীতি বলিয়া একটা জিনিশ খাড়া হইয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপীয় রাজনীতিকে ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর করিবার প্রধান যন্ত্র এই প্রজানীতি; প্রধান মসলাও এই প্রজানীতি। আজি কালি আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রবল রাজনীতি আয়র্লাণ্ডের প্রজানৈতিক যন্ত্রে, আর প্রজানৈতিক মসলায়, ক্রমাগত ফিল্‌টর হইতেছে; ভরসা করা যায় আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি অচিরাৎ বিশুদ্ধতরা হইবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি, কিয়ৎপরিমাণে, অজ্ঞতা-মলে, আর কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জঞ্জালে,—বিষম দূষিত। এই মল জঞ্জাল দূরীকরণের জন্য, ভারতবর্ষে প্রজানীতি সংগঠন ও সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। য়ুরোপীয় রাজনীতি সংস্করণের এমন কার্য্যকর যন্ত্র, এরূপ কার্য্যকরী মশলা—আর নাই।

লর্ড লীটন হঠাৎ অস্ত্রের আইন, ও সংবাদপত্রের আইন দেশ মধ্যে প্রচলিত করাতে, প্রজার মধ্যে যাহারা য়ুরোপীয় রাজনীতির যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল, তাহারা বুঝিল, রাজার কাছে ভারতীয় প্রজা একেবারে নগণ্য নহে। লর্ড রীপণের সময় ইলবর্ট বিলের ঘোরতর আন্দোলনের অবসরে, আবার বুঝদার প্রজারা বুঝিল, যে ইংরাজ জাতি, সহজে ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দকে আপনাদের সঙ্গে সমান স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করিবেন, এমন আশা করাই ভুল; রাজনীতির সহিত প্রজানীতির রীতমত নিয়ত সংঘর্ষণ আবশ্যক। সেই জন্য সুচারুরূপে প্রজানীতির সঙ্গঠন ও সংস্থাপন আবশ্যক।

লর্ড রীপণের বিদায় কালে, ভারতীয় সমগ্র প্রজা কৃতজ্ঞতা ভরে এক হৃদয়ে অভ্যুত্থান করিল; রীপণের শত্রুপক্ষ অনুদার ইংরাজদল চম্‌কিয়া গেল। সমজদার লোকে সেই চমকে বুঝিতে পারিল,—প্রজার বল বুঝিতে পারিল; য়ুরোপীয় প্রথায়, ভারতে প্রজানীতি সংগঠন করা সম্ভব, ক্রমে এই ধারণা হইল।

লর্ড ডফরীণের আমলে, সেই প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। তাহারই নাম কঙ্গ্রেস্। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত এই প্রবলা প্রখরা রাজনীতির পাশাপাসি দাঁড়াইতে পারে, এমন একটি প্রজানীতি গঠিত করা বড় সহজ কথা নহে। সেরূপ প্রজানীতি সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, উপযুক্ত প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না,—এ সকল কথার মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্ভব; এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে য়ুরোপীয় রাজনীতির সংস্কারিকা রূপা প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা এই কঙ্গ্রেসে হইতেছে।

ধীর স্থিরভাবে,—নিরেট, ঘাত-সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ,রক্ত অস্থিময়-প্রজানীতি ভারতে সংগঠিত করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে ইংরাজের রাজনীতির সংশোধন হইবার সম্ভাবনা—তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে। বুঝিতে পারিলে, তাহাতে ইংরেজেরও মঙ্গল আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলের বা অস্ত্র বলের কোন প্রয়োগ না করিয়া রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে প্রজার স্বত্ব সংস্থাপন এবং অধিকার বর্দ্ধন—প্রজানীতির কার্য্য। এরূপ প্রজানীতি ভারতে একবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, অস্ত্র বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পক্ষে সেটি বড় অল্প লাভের কথা নহে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যদি সুগঠিত প্রজানীতি থাকিত, তাহা হইলে, সেই প্রজানীতির সাহায্যে সিপাহীরা আপনাদের আবেদন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিত; প্রজানীতিতে রাজনীতিতে রীতিমত সংঘর্ষণ চলিত, বন্দুকে কামানে হয়ত সমর বাধাইতে হইত না।

কোন দেশে প্রবলা প্রজানীতি থাকিলেই যে সে দেশে রাজা প্রজায় অস্ত্র বিপ্লব হয় না, বা হইতে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; তবে রক্তাস্থিময়, সতেজ, সবল, প্রজানীতি থাকিলে, রাজনীতি তাহাকে আদরে সঙ্গিনী করিয়া লন, তাহাতেই অস্ত্রবল পরীক্ষার অবসর কমিয়া আসে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, ভারতে প্রজানীতির সঙ্গঠন করা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গ্রেস্ সেই কার্য্যে ব্রতী। সুতরাং কঙ্গ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের নিজের নিত্য কার্য্যের 'ভাল' 'মন্দ' সম্বন্ধে নিজের মনেই অনেক সময় খট্কা উঠে, সুতরাং এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডে দুই জন, দশ জন, শত জন, বা সহস্র জন খট্কা তুলিলে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। বরং যত খট্কা উঠে ততই ভাল; যদি খাটি সোণা মলা মাটিতে মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যত পোড়াইবে, ততই নিখাদ হইবে, উজ্জ্বল হইবে,ঘা মারিলে বাড়িবে,—ফাটিবে না, চটিবে না।

যাহাতে, প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন দাদা ভাই নওরোজি, য়ুরোপীয় রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রভৃতি ভারতীয় ধুরন্ধরগণ যোগ দান করিয়াছেন, উদার রাজপুরুষ গণের প্রতিনিধি আলেন হিউম প্রভৃতি যে কঙ্গ্রেসের পরিপালনে নিয়ত ব্যাপৃত, সেই কঙ্গ্রেসকে যে বালকের ছেলে খেলা মনে করে, সেই বালক। ছেলেখেলা হইলে, সর্ লিপেল গ্রিফিনের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা, বিলাতের টাইমসের মত বজ্রঘোষ সংবাদ পত্র সকল,—উহার উপর ভ্রূকুটি করিবে কেন?

কিন্তু কঙ্গ্রেস বাল্য চাপল্য না হইলেও, নানা কারণে বয়স্কের বিড়ম্বনা হইতে পারে; কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে।

প্রজার যে টি মর্ম্ম কথা, সেইটি লইয়া প্রজানীতি গঠন করা আবশ্যক; সেইটি লইয়াই প্রজানীতি গঠিত হইতে পারে। অন্য উপায় অসম্ভব। ভারতীয় প্রজার মর্ম্ম কথা—তাহাদের দারিদ্র দুঃখ। ইংরাজ শাসনে এই দারিদ্র দুঃখ দিন দিন বাড়িতেছে। দাক্ষিণাত্যে দানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, উত্তর পশ্চিম ক্রমেই অধিকার করিয়াছে, অপূর্ব্ব উর্ব্বর-ভূ বঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিস্তার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র দুঃখকে জান করিয়া সুর বাঁধিতে পারিলে, তবে প্রজানীতির সুর লাগিবে; রাজনীতি যতই কেন কঠোর হউক না, প্রজানীতির মর্ম্মের কাঁদনি সুর, তাহাকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে; ক্রমে সেই মর্ম্ম দুঃখ রাজনীতিকে দূর করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের প্রজা চাহিয়াছিল,—স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার; আমেরিকার প্রজা চাহিয়াছিল, স্বাধীন জীবনের অধিকার; আয়র্লণ্ড চাহিতেছে, স্বাধীন শাসনের অধিকার; আমরাও এই সকলের দেখা দেখি, বলিতেছি আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাও। সিবিল বিচারের অধিকার দাও, কৌন্সিলে বসিবার অধিকার দাও, যুদ্ধ করিবার অধিকার দাও—কিন্তু এ সকল পরের সুরে সুর লাগান মাত্র; নিজের কাঁদুনীর রাগিণী নহে।

নিজের প্রাণের কথায় জান লাগাইয়া, রাগিণী ধরিতে না, পারিলে সুর লাগিবেই না। কৌন্সিলে প্রতিনিধি প্রণালীতে দেশীয় সদস্য গৃহীত হৌক, জেলার শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি হউন, উচ্চ উচ্চ পদে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হৌক, রণকৌশল শিক্ষার্থীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হৌক—ইত্যাদি প্রার্থনা প্রজানীতি সঙ্গঠন ব্যাপারে অবান্তর কথা। **ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের উপর নিত্য, নৈমিত্তিক, অনিয়মিত, নিয়ত ধারা বাহিক শোষণ ক্রমে ক্রমে কমান হৌক** ইহাই আমাদের মূল প্রার্থনা। এই মূল কথা, স্বল্পাক্ষরী, সারবতী, সন্দেহশূন্য ভাষায় কাতর কোটি কণ্ঠে নিয়ত নিবেদন করিতে হইবে। ইংরাজ বণিকদের অস্বাভাবিক বাণিজ্য শোষণে এবং ইংরাজ রাজের স্বার্থপর সরকারি শোষণে দিন দিন ভারতের কিরূপ দারিদ্র বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেশের প্রদেশের, জেলার পরগণার, গ্রাম নগরের তালিকা দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে

হইবে। দুর্ভিক্ষ কমিশন এই দারিদ্র্যের কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন; হণ্টর প্রভৃতি বিচক্ষণ উচ্চ কর্ম্মচারীরা, দাদাভাই প্রভৃতি প্রকৃত দেশভক্তগণ সংখ্যা পরিমাণাদি দেখাইয়া উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এই দারুণ দারিদ্র প্রত্যহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তথাপি রাজপুরুষ নামে বিরাট কঠোর পুরুষের হৃদয়ে এ কথা এখনও লাগে নাই। কোটি কাতর কণ্ঠে নিয়ত সপ্তসুরা ভৈরবী রাগিণীতে গান্ধারের তান লাগাইলে তবে সে হৃদয় গলিবে।

কঙ্গ্রেসের গায়কেরা এখনও গলা সাধিতেছেন, যন্ত্র বাঁধিতেছেন, সুর মিলাইতেছেন; প্রকৃত গাওনার সময় এখনও হয় নাই—সুতরাং সমালোচনা চলে না। আমরা জানি, কঙ্গ্রেসের প্রবীণ পক্ষের মধ্যে দুই চারি জন প্রজার প্রাণের কথা লইয়া সুর বাঁধিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তাহা যে হইতেছে না সেটি কেবল আসরের তামাসগীরদের বিড়ম্বনায়। সর্ব্বত্রই তামাসগীর লোকে সঙ দেখিতে ভাল বাসেন, সুর বুঝিতে পারেন না। কাজেই আসরের দোষে, অনেক স্থলেই সুর লাগে না, গান জমে না। কঙ্গ্রেসেও তাহাই হইতেছে। প্রথম প্রথম সর্ব্বত্রেই তাহা হয়; কিন্তু গায়কদের প্রাণের ভিতর সুর থাকিলে, আর হৃদয়ে অধ্যবসায় থাকিলে, শেষে গান জমিতেই হইবে।

বিগত কঙ্গ্রেসের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তামাসগীর 'প্রতিনিধিবর্গের আচরণ সম্বন্ধে, কঙ্গ্রেসে উপস্থিত আমাদের একজন বন্ধু আমাদিগকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার একখানির কিয়দংশ এই প্রবন্ধের উপসংহাররূপে এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বলা বাহুল্য কঙ্গ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে যাই নাই। দেখাইবার শক্তিই আমার নাই—সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেই জন্য বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত না কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের ভাব ভঙ্গির উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের মুখের দিকে তিন দিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি একজন দেবতা; সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই কিন্তু ভক্তির উদয় হয় নাই। তিনি ভারতবন্ধু সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি নিস্বার্থ ভারতবন্ধু নহেন। তিনি স্বজাতির স্বার্থান্বেষী স্বদেশহিতৈষী ভারতবন্ধু। ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র আইনের রিজোলিউসন লইয়া গোলযোগ বাঁধিবার সময়, হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাকুল ভ্রূভঙ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্য ভাব, অবশেষে তাঁহার দৌড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র আইন উঠাইবার প্রস্তাবে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতির স্বার্থের দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সন্ত-

মত ভারতের নব অঙ্কুরিত জীবনের সঙ্গে আর তাঁহার স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গে একটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন করিতেছেন। আমার নিকট বোধ হইল ‘কঙ্গ্রেস’ এই গ্রন্থি বন্ধনের চেষ্টা। ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আপনাকে আমার মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আশঙ্কাও হইতেছে। এই নূতন ধরণের গ্রন্থিতে উভয় জাতির স্বার্থ এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাতে ভারতে “হরিহর” আত্মা হইয়া উঠিবে? কি কোন গভীর জল-সঞ্চারী চতুর রাজনৈতিকের কৌশলে আমাদের নব অঙ্কুরিত জীবনী শক্তিটি ভারতের নরম মৃত্তিকা হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটি হইলেই ভাল এবং ভরসা করি হইবেও তাহাই। কিন্তু আত্মীয় কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে। কঙ্গ্রেসে সামাজিক কথার অলোচনার চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরেও আরও যে পরিষ্কাররূপে হইবে, সেটা আর কিছু নহে, নদীর একদিকের স্রোত খাল কাটিয়া আর এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। “তোমরা কৃষিকার্য্য কর আমরা অন্ন ভোজন করি এবং তোমরা সমাজ লইয়া থাক আমরা সমাজের মূল দেশের শাসনকার্য্য লইয়া খেলা করি।” এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত অনেকগুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই শ্রেণীর দুই একটি লোক যে কঙ্গ্রেসে এবার ছিলেন আমার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দুবিবাহ আইনের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য কঙ্গ্রেস হইতে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও ঘরওয়া ভাবে দুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ শ্রেণীর কোন কথা কঙ্গ্রেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামী বারে সামাজিক কথা কঙ্গ্রেসে তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে; কঙ্গ্রেসের পরিচালকগণ কত দিন এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন, বলা যায় না। কঙ্গ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে, ইহাই আরো অধিক চিন্তার কারণ, কঙ্গ্রেসের একজন নায়ক আমাকে পরিষ্কাররূপেই বলিলেন “আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে এতগুলি বাঙ্গালি আসিল, এটিও কম লাভ নহে।”

কঙ্গ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব পত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। প্রথমত যিনি কঙ্গ্রেসের ধাত্রী স্বরূপ সেই মহাত্মার যে দিকে লক্ষ্য, নদীর স্রোত তাহার অনুকূলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাতশত সভ্যের নৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না, তাহাও বলা যায় না। তাহার পর—সুরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্রবাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শ্রেণীর কঙ্গ্রেসর আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন এক এক জনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায়

কতকগুলি লোক এখনই যেরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম, তাহার উপর কংগ্রে-সের কার্য্যপ্রণালীর যেমন প্রকরণ পদ্ধতি দেখিলাম, তাহাতে কংগ্রেস পার্লি-য়ামেন্ট রূপে পরিণত হউক না হউক, বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদের বাঁদরামিতে কংগ্রেস শীঘ্রই বোধ হয় পরিণত হইবে। এবার এক-জন মান্দ্রাজি ভদ্রলোক ইনকম টেক্সের রিজোলিউসনের সময় কিছু বলিবার জন্য প্ল্যাটফরমে উঠিয়াছিলেন। দুরদৃষ্ট বশত তিনি খঞ্জ। প্ল্যাটফরমে উঠিবার সময় যখন তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক "ডেলিগেট" হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়াটর ঘরে অভিনেতাদের কোন ত্রুটি হইলে, আট আনা টিকিটের গ্যালারির দিক হইতে যেমন হাত-তালি এবং হো হো শব্দ উঠিতে থাকে কংগ্রেসে সেই-রূপ অতি অভদ্রোচিত কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি, তাহা দেখিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা ভারতের অদৃষ্ট চক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ বাল চপলতা দেখিয়া আর বলিব কি বলুন? ফল কথা কংগ্রেসে তামাসা দেখিতেই অধিকাংশ লোক গিয়াছিলেন। যাঁহারা ক্ষমতাবান্, তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই সুবিধায় নিজের সংবাদপত্রের গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পশার শূন্য মক্কেল হীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের সংস্রবিত লোক এবং দুই চারি দশজন আমার মতন শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ "আলো প্রাপ্ত" তরুণ বয়স্ক জমীদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিপক্ক স্বদেশ হিতৈষী একত্র হইয়া—বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে কথা বলিতে অবকাশ না দিয়া এবং তাহাদের ভাল কথা উড়া-ইয়া দিয়া, তাল বেতালে সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া, কোন ক্রমে কংগ্রেস ব্যাপার এবার সমাধান করিয়াছেন। কংগ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে এবং ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে * * * ন্যায় কতকগুলি লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্তই আবশ্যক। কার্য্যের লোকের পরিবর্ত্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কংগ্রেস গড়িতে চেষ্টা করিলে, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।
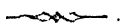
নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } ফাল্গুন ১২৯৪। { ৮ম সংখ্যা।

বৈশেষিক দর্শন।

২।

গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগ এই দশটি কেবল মূর্ত্ত পদার্থের অর্থাৎ আকার বিশিষ্টেরই গুণ; বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা এবং শব্দ—এই দশটি কেবল অমূর্ত্ত পদার্থের অর্থাৎ নিরাকারের গুণ; সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই উভয়েতেই বিদ্যমান হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা এবং শব্দ ইহারা বিশেষ গুণ অর্থাৎ কোন এক বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব, এবং বেগ ইহারা সামান্য গুণ অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, দ্রবত্ব, স্নেহ, এবং বেগ ইহারা দুইটি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ ইহারা কেবল এক একটি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। সংযোগ, বিভাগ এবং বেগ ইহারা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মজ গুণ বলে।

রূপ—একটি গুণ, কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন শুক্ল, নীল, রক্ত, পীত, হরিত, কপিশ, চিত্র—এই সাত প্রকার মাত্র রূপ আছে। বিশ্বনাথ বলেন রূপ অনেক প্রকার। রূপ সচরাচর

বর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পৃথিবী, জল, তেজঃ এই তিনটি মাত্র দ্রব্যেই রূপ থাকে; পৃথিবীতে সকল প্রকার রূপই থাকে, জলে শুক্ল, এবং তেজে ভাস্বর শুক্ল। রূপ সকল আবার দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম উদ্ভূত, দ্বিতীয় অনূদ্ভূত। শাস্ত্রকারেরা উদ্ভূত এবং অনুদ্ভূতের কোন বিশেষ লক্ষণ করেন নাই, কেবল স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন ভাজা খোলার আগুণ, গ্রীষ্মের উষ্মা এবং চক্ষুঃ অর্থাৎ দৃষ্টির তেজ প্রভৃতির রূপ অনুদ্ভূত, এবং ঘট, পট প্রভৃতির রূপ উদ্ভূত।

রস—ইহা রসনা অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হয়। রস—কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, এবং অম্ল এই ছয় প্রকার। রস পৃথিবী ও জল এই দুইটি মাত্র দ্রব্যেরই গুণ। জলে এক মাত্র মধুর রস অবস্থান করে, হরিতকী প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণে জিহ্বার দোষ কাটাইয়া জল পান করিলে ইহা ঠিক অনুভূত করা যায়। রসও উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত এই দুই প্রকার; তাহার মধ্যে অনুদ্ভূত রস অতীন্দ্রিয়।

গন্ধ—ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা অনুভূত হয়। গন্ধ দুই প্রকার সুরভি এবং অসুরভি ইহা কেবল পৃথিবীরই গুণ। পাষাণাদির গন্ধ অনুৎকট বলিয়া অতীন্দ্রিয়, অনুভূত হয় না। গন্ধ অনিত্য।

স্পর্শ—ইহা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। স্পর্শ তিন প্রকার—শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্ণ অশীত। ইহা পৃথিবী জল, তেজ, এবং বায়ু, এই চারি দ্রব্যেই অবস্থান করে। তন্মধ্যে শীত স্পর্শ জলে, উষ্ণ স্পর্শ তেজে এবং অনুষ্ণ অশীত-স্পর্শ পৃথিবী এবং বায়ু এই উভয়েই বর্ত্তমান। এই স্পর্শ আবার দুই প্রকার—পাকজ এবং অপাকজ; তাহার মধ্যে পৃথিবীতে পাকজ এবং বায়ুতে অপাকজ অর্থাৎ একরূপ বিজাতীয় স্পর্শ অবস্থান করে *। পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুর

* পাক দুই প্রকার পীলুপাক এবং পিঠরপাক। বৈশেষিকেরা পীলুপাক বাদী এবং নৈয়ায়িকেরা পিঠর পাকবাদী। পীলুপাকবাদীদিগের মতে কোন একটা বস্তু, মনে কর মাটির ঘড়া, বা ইট (যাহার পাক আবশ্যক) প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে, আগুণের উত্তাপে ঐ বস্তুটি প্রথমে একেবারে শিথিল হয়, কাজেই উহার পরমাণু গুলি পৃথক পৃথক হইয়া পক্ক হয়; সেই ধারাবাহী আগুণের উত্তাপেই আবার ঐ পক্ক পরমাণু গুলি একে একে সংযুক্ত হইয়া যথাক্রমে দ্ব্যণুকাদিরূপে পরিণত হওত পুনর্ব্বার যেরূপ

পরমাণুতে যে স্পর্শ থাকে তাহা নিত্য ; তদ্ভিন্ন সমুদয় স্পর্শই অনিত্য। পৃথিবীতে কঠিন এবং কোমল এই উভয়বিধ স্পর্শই অনুভূত হয়।

সংখ্যা—ইহা গণনা ব্যবহারের প্রতি হেতু। যে নয় প্রকার দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলেই সংখ্যা থাকে। সমুদয় সংখ্যার মধ্যে একত্ব কেবল দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য ; নিত্য বস্তুগত একত্ব নিত্য এবং অনিত্য বস্তুগত একত্ব অনিত্য। দ্বিত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুদয় সংখ্যা, অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য। সুতরাং অপেক্ষা বুদ্ধির নাশের সহিত ইহাদেরও নাশ হয়। অপেক্ষা বুদ্ধি বলিতে এই এক,এই এক, করিয়া একেবারে যে অনেক একত্বের জ্ঞান। এই অপেক্ষা বুদ্ধি ক্ষণত্রয় মাত্র অবস্থান করে। *

পরিমাণ—মান ব্যবহারের প্রতি হেতু। ইহাও সমুদয় দ্রব্যে বর্ত্তমান এবং নিত্য অনিত্য দুই প্রকার ; নিত্য দ্রব্যবৃত্তি পরিমাণ নিত্য, অনিত্য

বস্তু ছিল, সেইরূপ আকারের একটি পক্ব বস্তু প্রস্তুত হয়। বহ্নির বেগবশত পরমাণুদিগের ঐরূপ বিশ্লেষ এবং পুনঃ সংযোগ এত শীঘ্র সম্পাদিত হয়, যে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। এইরূপ পরমাণুতে পাকের নাম পীলুপাক। পিঠরপাকবাদীদিগের মতে পার্থিব বস্তুমাত্রেই সচ্ছিদ্র (Porous) সুতরাং কোন পার্থিব পাত্রকে অগ্নিসংযুক্ত করিলে অগ্নির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ভিতর বাহির উভয় দিকেই পক্ব করে, অবয়বের আর বিশ্লেষ আবশ্যক করে না। পাক হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে পাকজ বলে। যাহা আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহা অপাকজ ; অপাকজকে স্বাভাবিক বলা যায়।

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন. "সংখ্যাঃ খল্বপি উৎপত্তেঃ প্রভৃত্যা বিনাশ মনুবর্ত্তন্তে।" ইহার অর্থ সংখ্যাসকল উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়.। কার উৎপত্তির সহিত কার বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়,একথা আমরা ভাল করে বুঝিতে পারিলাম না। যদি সংখ্যেয় পদার্থের উৎপত্তি হইতে তাহার বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়,—এইরূপ তাৎপর্য্য হয়, তাহলে আমাদের একটা জিজ্ঞাসা এই যে সংখ্যেয় পদার্থগুলিত এক এক করিয়া উৎপন্ন হয় সুতরাং সংখ্যেয়ের উৎত্তির সহিত কেবল একত্ব সংখ্যারই সম্বন্ধ ; অন্য সংখ্যার নয়। এবং ইহার পর "প্রত্যক্ষস্তস্য দ্বয়োরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদুপ জায়তে।" এই অস্য পদের উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

দ্রব্য বৃত্তি পরিমাণ অনিত্য। পরিমাণ সামান্যত চারি প্রকার—অণু (ক্ষুদ্র) মহৎ (বড়), দীর্ঘ (লম্বা), হ্রস্ব (খাট)। সংখ্যা জন্য, পরিমাণ জন্য এবং সমূহ জন্য পরিমাণ অনিত্য। আশ্রয়ের নাশই পরিমাণ নাশের কারণ। পরিমাণ সজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ হয়, এই জন্য দ্ব্যণুকের পরিমাণ কাহারও কারণ নয়। উহা নিজে অতি সূক্ষ্ম, উহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ আর হইতে পারে না।

পৃথক্‌ত্ব—যে গুণ থাকাতে অমুক বস্তু অমুক বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম পৃথক্‌ত্ব। এই পৃথক্‌ত্বও সমুদয় দ্রব্যে অবস্থান করে। ইহাও পূর্ব্ববৎ নিত্য ও অনিত্য দুই প্রকার। অনিত্য পৃথকত্ব আশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয়। এক হইতে পৃথক, দুই হইতে পৃথক, এইরূপে অনেক প্রকার পৃথকত্ব হইতে পারে। উহাদের মধ্যে দ্বিপৃথক্‌ত্বাদি অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশাধীন উহাদের বিনাশ হয়।

সংযোগ। বিভিন্ন বস্তুর মেলনের নাম সংযোগ;ইহা সকল দ্রব্যেই থাকে। সংযোগ তিন প্রকার—এক কর্ম্মজ, উভয় কর্ম্মজ এবং সংযোগজ। ক্রিয়া জন্য সংযোগ দুই প্রকার প্রথম অভিঘাত,দ্বিতীয় নোদন। যেরূপ সংযোগ হইলে শব্দ উৎপত্তি হয় তাহার নাম অভিঘাত। শব্দ না হইলে, নোদন।

বিভাগ—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ছাড়া থাকাকে বিভাগ বলে, ইহা সংযোগের ঠিক উলটা। সংযোগের ন্যায় বিভাগও নয়টি দ্রব্যে অবস্থিত হয় এবং তিন প্রকার। এক প্রকার ক্রিয়া জন্য, উভয় ক্রিয়াজন্য এবং বিভাগ জন্য।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার—প্রথম দৈশিক, দ্বিতীয় কালিক। দৈশিক পরত্বকে দূরত্ব এবং অপরত্বকে নিকট বলা যায়। কালিক পরত্বকে জ্যেষ্ঠত্ব এবং অপরত্বকে কনিষ্ঠত্ব বলা যায়। এই উভয় বিধ পরত্ব, অপরত্বই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং মনেতে বর্ত্তমান হয়। বৈশেষিকদিগের মতে দৈশিক পরত্ব বা দূরত্বের প্রতি অধিক সূর্য্য সংযোগ এবং অপরত্ব বা সমীপত্বের প্রতি অল্প সূর্য্য সংযোগ কারণ এবং কালিক পরত্ব বা জ্যেষ্ঠত্বের প্রতি অধিক সূর্য্যের গতি এবং অপরত্ব বা কনিষ্ঠের প্রতি অল্প সূর্য্যের গতি কারণ।

বুদ্ধি। বৈশেষিকদিগের মতে বুদ্ধি প্রথমত দ্বিবিধ অনুভূতি এবং স্মৃতি। ইহাদের মধ্যে অনুভূতি আবার দুই প্রকার প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। ইন্দ্রিয়

জন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ, এবং মন; এই নিমিত্ত ঘ্রাণজ, রাসন বা স্বাদ, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ এবং মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ,। তাহার মধ্যে চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুতে উদ্ভূত রূপ এবং তাহার সহিত আলোক সংযোগ হওয়া আবশ্যক। বস্তুর সহিত তাহার সংখ্যা পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব, ক্রিয়া এবং জাতি ইহা দিগেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্পার্শন প্রত্যক্ষ। বস্তুর জাতিরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব এবং ক্রিয়া ইহাদেরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। মনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম মানস প্রত্যক্ষ; সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এবং বিশেষ গুণযুক্ত আত্মার ও মানস প্রত্যক্ষ হয়। * যে বস্তু যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়, সেই বস্তুর অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়। সকল প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুর পরিমাণের মহত্ত্ব থাকা আবশ্যক, এই নিমিত্ত পরমাণু, দ্ব্যণুক এবং তাহাদের গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের নিষ্পাদক; বৈশেষিকেরা উহাকে ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করেন। প্রত্যক্ষ আবার লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় বলা হইল; ঠিক্ রীতিমত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে; সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ এবং যোগজ। সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষ দ্বারা জাতির জ্ঞানে তজ্জাতীয় নিখিল বস্তুর জ্ঞান হয়; রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞান, বা ঝিনুক দেখিয়া রূপার জ্ঞান, এইরূপ প্রকার জ্ঞান সকল জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন এবং যোগীদিগের জ্ঞানের প্রতি যোগজ সন্নিকর্ষ কারণ।

ব্যাপ্তি জন্য জ্ঞানের নাম অনুমিতি বা অনুমান, বৈশেষিকেরা অনুমানকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন যথা পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো

---

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন আত্মার একেবারেই প্রত্যক্ষ হয় না। আমি জানিতেছি এইরূপ জ্ঞান—ভ্রমমাত্র।

দৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ, যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ বলে ; যেমন প্রাতঃকালে উঠে খানা ডোবা জলে পরিপূর্ণ দেখিয়া, রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুমান। এই দুই প্রকারের অতিরিক্ত অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে ; এক স্থানে এক প্রকার কার্য্য কারণ ভাব দেখিয়া তজ্জাতীয় আর একটি স্থলেও সেইরূপ কার্য্য কারণ ভাব কল্পনার নাম সামান্যতো দৃষ্ট। অনুমানের আরতিন প্রকার ভেদ আছে (১) কেবলান্বয়ী (২) কেবল ব্যতিরেকী এবং (৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী। সকল স্থলেই আছে বলিয়া বিচার্য্য স্থলেও অবশ্য আছে, এরূপ অনুমান কেবলান্বয়ী। কেবল মাত্র বিচার্য্য স্থলেই থাকিতে পারে অন্যত্র পারে না—এইরূপ সাধ্যের অনুমান ব্যতিরেকী, বিচার্য্যস্থলে, থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এই এই কারণে বিচার্য্য স্থলে আছে ; এরূপ অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকী। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' ঐরূপ অনুমান মূলক। সাধারণত অনুমান পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট। সেই পঞ্চ অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন ; প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতে আগুন আছে, হেতু—ধূমাৎ, ধূম আছে বলিয়া, উদাহরণ—যেখানে আগুন থাকে সেই খানেই ধূম থাকে, নিগমন—এখানে আগুনের সহিত একাধারস্থায়ী ধূম আছে, উপনয় অতএব এখানে আগুন আছে।

বৈশেষিকেরা উপমান এবং শব্দ এই উভয়কে অনুমানের অন্তর্গত করিয়াছেন।

পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারাধীন যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মৃতি। জ্ঞান মাত্রের প্রতি মনের সহিত ত্বকের যোগ হেতু। সমুদয় জ্ঞানই দুই প্রকার—প্রমা যথার্থ জ্ঞান, অপ্রমা মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম। ভ্রম আবার দুই প্রকার সংশয় এবং বিপর্য্যয়।

সুখ— সকলের বাঞ্ছনীয় ; দুই প্রকার—ঐহিক এবং পারত্রিক।

দুঃখ—যাহা কেহই চাহে না, এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

ইচ্ছা—দুই প্রকার—ফলেচ্ছা এবং উপায়েচ্ছা। ফল বলিতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তি ; উপায় বলিতে—ঐ ফল লাভের সাধন।

দ্বেষ—কোন বস্তু হইতে অনুরাগের নিবৃত্তির নাম দ্বেষ।

প্রযত্ন—চেষ্টা, ইহা তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীব, যোনি।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যে কি, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। করিতে ইচ্ছা, নিজের সামর্থ্য লাভবোধ এবং করিবার উপকরণ, ইহারা প্রবৃত্তির কারণ, নিবৃত্তির, কারণ দ্বেষ বা অনুপকার বোধ। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের যত্নকে জীব যোনি যত্ন বলে।

গুরুত্ব—বস্তুর ভারের নাম গুরুত্ব। ইহা পৃথিবী, এবং জলে অবস্থান করে ও অতীন্দ্রিয়।

দ্রবত্ব—যে গুণ থাকিলে বস্তু গলে যায় তাহার নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব দুই প্রকার সাংসিদ্ধিক এবং নৈমিত্তিক। যাহা স্বভাবতই বর্ত্তমান তাহার নাম সাংসিদ্ধিক, যাহা কোন কারণ বশত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং ঘৃতাদিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। দ্রবত্ব পৃথিবী জল এবং তেজ এই তিনেতে বর্ত্তমান। জলের পরমাণুতে যে দ্রবত্ব আছে, উহা নিত্য।

স্নেহ—কেবল জলেরই গুণ। জলের পরমাণুতে যে স্নেহ আছে তাহা নিত্য এবং তদ্ভিন্ন স্থলে অনিত্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন এই স্নেহ পদার্থ দ্বারাই গুঁড়া বস্তু একত্র করিয়া বটিকা বা তাল করা হয়।

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক এবং ভাবনা। উহাদের মধ্যে বেগ—পৃথিবী, জল তেজ এবং বায়ুতে বর্ত্তমান; স্থিতি স্থাপক কেবল পৃথিবীতে এবং সংস্কার কেবল জীবাত্মায় বর্ত্তমান। যে গুণ থাকিলে আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর বৃদ্ধি হয় এবং আকর্ষণ ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার আপনার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় তাহার নাম স্থিতি স্থাপক সংস্কার, ভাবনা একটি গুণ যাহা থাকিলে স্মৃতির উৎপত্তি হয়।

ধর্ম্ম—পুণ্য। অধর্ম্ম—পাপ; ইহারা জীবাত্মার গুণ।

শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহার অনুভব করা হয়, তাহার নাম শব্দ। ইহা দুই প্রকার প্রথম ধ্বনি, দ্বিতীয় বর্ণ। মৃদঙ্গাদির শব্দের নাম ধ্বনি, এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতি আস্যের অভ্যন্তর স্থান হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। শব্দ সকল আমাদের কর্ণের ভিতর আসিয়া উৎপন্ন হইলেই উহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। বৈশেষিকগণ এই কর্ণের ভিতর শব্দের উৎপত্তির প্রতি দুই প্রকার রীতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম বীচি তরঙ্গ ন্যায়, দ্বিতীয় কদম্ব গোলক ন্যায়। যেমন কোন জলাশয়ের মধ্যে ঢিল ফেলিলে, যেখানে ঐ ঢিল পড়ে সেই স্থলে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন

হয়, তাহার পর ঐ বৃত্ত ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়। সেইরূপ কোন প্রদেশে অভিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া উহা ঐরূপ বৃত্তাকারে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া দশদিকে ছড়িয়া পড়ে; আমাদের কাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকে বীচি তরঙ্গন্যায় বলে। দ্বিতীয় মতে অভিঘাত মাত্রেই দশ দিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই দশটা শব্দ হইতে আর দশ দশটা শব্দ উৎপন্ন এইরূপ ক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমে কর্ণবিবরে আসিয়া উৎপন্ন হয়। এইরূপ শব্দোৎপত্তি রীতির নাম কদম্বগোলক ন্যায়। বৈশেষিকদিগের মতে শব্দ অনিত্য; কারণ আমরা এই শব্দ উৎপন্ন হইল এই শব্দ বিনষ্ট হইল, এইরূপ ব্যবহার করি।

কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায় ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই উহাদের বিষয় এক প্রকার মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে। এক্ষণে সপ্তম পদার্থ অভাবের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কোন বস্তুর না থাকার নামই অভাব। অভাব চারি প্রকার; প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সেই বস্তুর না থাকা তাহার নাম প্রাগভাব, ধ্বংশ বলিতে নাশ, বস্তু বিনষ্ট হইলে তাহার যে না থাকা, তাহার নাম ধ্বংশাভাব। অত্যন্তাভাব বলিতে কোন বস্তুর ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান এই তিন কালেই না থাকা। এই তিন প্রকার অভাব সংসর্গাভাব নামে অভিহিত হয়। ভেদ ও অন্যোন্যাভাব—একই পদার্থ।

বৈশেষিকোক্ত পদার্থ গুলি উক্ত হইল। এক্ষণে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য। সাধর্ম্ম্য বলিতে একরূপ ধর্ম্মের আশ্রয়তা। বৈশেষিকোক্ত ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য এই কয়টি—অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব। আশ্রিতত্ব নামক একটি ধর্ম্ম নিত্য দ্রব্য ভিন্ন অপর বস্তুতে বর্ত্তমান হয়। দ্রব্য ভিন্ন সমস্ত নির্গুণ এবং ক্রিয়াশূন্য; এই জন্য নির্গুণত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য। যে যাহার সাধর্ম্ম্য, উহা তাহার বিপরীতের বিধর্ম্ম্য।

এই সকল পদার্থ বিস্তৃতরূপে বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈশেষিক সূত্র দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। উহার মধ্যে প্রথমা-ধ্যায়ে সমুদয় পদার্থের সামান্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যের নিরূপণ; তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণের লক্ষণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর এবং তাহার উপযোগী বস্তুর নির্দ্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্ম নিরূপণ; ষষ্ঠাধ্যায়ে যাজ্ঞিক কর্ম্মের আলোচনা; সপ্তমাধ্যায়ে গুণ এবং সমবায়

সম্বন্ধের প্রতিপাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার নিদানাদি নিরূপণ, নবম অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষের প্রতিপাদন, দশম অধ্যায়ে আত্মার গুণগুলির আলোচনা। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন যদিও এই শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে পদার্থসমূহের নির্ণয়ই করা হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ নির্ণয় মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে সংসাধিত হওযায়, এইশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সূত্রকার প্রথমেই "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে এখানে নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। কারণ বস্তুর সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, কোন বস্তু কিরূপ তাহা ঠীকঠীক জানিতে পারিলে, আমাদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির সহিত আমাদের আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হয়, সেই সঙ্গে দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়, মন সন্তোষ অনুভব করত স্থির-ভাব ধারণ করে। বৈশেষিকেরা বলেন ঐরূপ দুঃখনিবৃত্তির নামই মোক্ষ। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়, এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশই মোক্ষ প্রাপ্তির প্রতি হেতু। কারণ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান, ঐ তত্ত্বজ্ঞান হইলে পুরুষ আর সংসারে আবদ্ধ থাকে না, মুক্তিলাভ করে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে বৈশেষিকদিগের পূর্ব্ব প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ অনেক কথাই আছে। তাহার মধ্যে আমরা একটি প্রধানের মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈশেষিকদিগের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। উভয়েরই কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই পদার্থ, যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সমুদ্রে জল বুদ্বুদ হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাসকল উৎপন্ন হইয়া যে পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু ধারাবাহী সংসারে পতিত হইয়া পৃথক ভাবে অবস্থান করে; মোক্ষ লাভ হইলে যেমন পুষ্প রস সমুদয় মধুর সহিত মিশিয়া যায়, নদীসকল সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায় এবং ঘটাকাশাদি ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মায় মিলিত হইয়া একভাবে অবস্থান করে তখন আর ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় না। এইরূপ একটী ভাবকেই পরম মোক্ষ বলে। আত্মা স্বভাবত নির্গুণ।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে এরূপ অনেক নূতন কথা আছে। বিস্তার ভয়ে সেগুলি এখানে সমালোচিত হইল না। *

হিন্দুর নবজীবন।

সনাতন ধর্ম্মই (সর্ব্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ) অলৌকিক হিন্দু ধর্ম্ম। দেবতা বা ঋষি প্রোক্ত উপায়ে জীবাত্মার মোক্ষ বিধান এই অলৌকিক ধর্ম্মের চরমোদ্দেশ্য। এই অলৌকিক ধর্ম্মের অন্তর্গত সত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় ভূষিত চারিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চতুর্ব্বর্ণের অলৌকিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—ধর্ম্মভাব যে সকল গ্রন্থে বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থকে হিন্দুশাস্ত্র বলে। এই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেষ্টা প্রধানত ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণ হিন্দুর মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহুদ্বয়, বৈশ্য উদর এবং শূদ্র পদদ্বয়। কাল সাক্ষী আছেন, এক সময়ে এক্ষণকার এই প্রাচীন হিন্দু, শূদ্র রূপে দৃঢ়াধ্যবসায়ে, ব্রাহ্মণরূপে মস্তিষ্কের প্রতিভায়, ক্ষত্রিয়রূপ ত্রিলোক-বিজয়ী বাহুবলে, এবং বৈশ্যরূপে অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়া, কত মহাযুগ ধরিয়া এক-ছত্ররূপে সসাগরা ধরার বরণীয় পতি ছিলেন। এক্ষণে হিন্দুর ঘোর সুপ্তাবস্থা। হিন্দুর মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়াছে—বাহুতে বল নাই—উদরে অন্ন নাই এবং গমনশক্তি রহিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ মূর্খ, ক্ষত্রিয় ভীরু, বৈশ্য অলস এবং শূদ্র অবাধ্য হইয়াছে। কে জানে আবার কত দিনে হিন্দুর অভ্যুদয় হইবে! বর্ণগত বৈচিত্রতা আবার আদৃত হইবে। ব্রাহ্মণ তত্ব কথায়, ক্ষত্রিয় রাজ্যপালনে, বৈশ্য বাণিজ্যে এবং শূদ্র আশ্রমী সেবায় মনোনিবেশ করিবে! হিন্দু, নিরাশ হইও না। যে কালবশে তুমি পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে থাকিয়া অধঃপতিত হইয়াছ, সেই কালবশে তুমি এই নীচ

---

* আমরা বলিয়াছি তর্কালঙ্কার মহাশয় পৃথিবীর কৃষ্ণরূপের প্রতি কোন প্রমাণ দেন নাই, এটি আমাদের ভ্রম; তিনি সপ্তম অধ্যায়ে পাকজ রূপপ্রসঙ্গে এ বিষয়ের প্রমাণ দিয়াছেন।

অবস্থা হইতে কিছুকাল বিশ্রামের পর, আবার সসম্মানে আপনার অভীষ্ট স্থান অধিকার করিবে। বুঝি তোমার অদৃষ্ট চক্র আবার ফিরিয়া আসিল!

আমাদের মধ্যে এক্ষণে সাতশ্রেণীর হিন্দু আছে।

(১) কুলি মজুর, রান্ধুনী বামন্, ভাট্ ইত্যাদি নিরক্ষর লোক। এই শ্রেণীতে সমাজের দশ আনা লোক আছে।

(২) মূর্খ গোঁড়া হিন্দু, যারা দুই চারিটা করিয়া অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোন রকমে পিতৃ পিতামহের পাট ও ব্রাহ্মণ হইলে ফলাহারের কার্য্য বজায় রাখিয়াছে। এই শ্রেণীতে চারি আনা লোক।

(৩) ইংরাজী নবীস্ কালেজের ফেরতা—যারা——

"না হিন্দু না মুসল্‌মান্
ধর্ম্ম ধনের ধার্ ধারে না।
নয় মগ্, ফিরিঙ্গী, বিষম ধিঙ্গি
ভিতর বাহির যায় না জানা।"

এই শ্রেণীতে এক আনা লোক।

(৪) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, সরস্বতী, স্বামীর দল, যাঁহাদের সাহায্যে কতক পরিমাণে সমাজ চলিতেছে।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ আনা লোক।

(৫) তৃতীয় শ্রেণী হইতে সরিয়া যাঁহারা আজিকালি গীতা ভাগবতের কথা আওড়াইতেছেন।

এই শ্রেণীতে এক পাই লোক।

(৬) জ্ঞানী নাস্তিক যাঁহারা নিরপেক্ষ।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাই লোক।

(৭) জ্ঞানী আস্তিক যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া অদৃশ্য ভাবে নির্জ্জনে থাকেন।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাই লোক।

পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর মধ্যে সপ্তম শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের কোন সংশ্রব নাই; তজ্জন্য এই শ্রেণীর হিন্দুকে বাদ দিতে পারা যায়। অবশিষ্ট ছয় শ্রেণীর পরস্পর সাহায্যে আধুনিক সমাজ চলিতেছে। কিন্তু এরূপ চলিলে, আর অধিক দিন আধুনিক হিন্দুসমাজ টিকিয়া থাকিবে না। কারণ প্রথম তিন ও ষষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুর দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম কখনও সম্যক্‌রূপে আচরিত

হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অবশিষ্ট চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দু থাকিল। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দুর ভাগ ক্রমশই উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে। যেরূপ এক ভাবে কমিতেছে, এইরূপ কমিতে থাকিলে, এই শ্রেণী অচিরে লোপ পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা বাড়াইবে। আবার তৃতীয় শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ক্রমশ পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং বৈদেশিক শিক্ষার উত্তরোত্তর বিস্তারে ১ম ও ২য় শ্রেণীর হিন্দু ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ৫ম শ্রেণীর আরও দল পুষ্টি করিবে। এইরূপে ইংরাজ রাজ্য আমাদের দেশে আর একশত বা দুই শত বর্ষ স্থায়ী হইলে,পঞ্চম শ্রেণীতে আট আনা লোক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এক্ষণে দেখা যাউক এই পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুর কিরূপ চরিত্র। যাহারা কোন ধর্ম্ম মানিত না—যাহাদের আচার ব্যবহার অদ্ভুত রকমের ছিল—যাহাদের মন বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে কতক পরিমাণে স্বাধীন হইয়াছিল—যাহারা ইংরাজের কাছে আপনাদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিত—যাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসূত্র না ঢাকিয়া লজ্জায় বাহিরে আসিতে পারিত না—যাহাদের মধ্যে শূদ্রেরা যজ্ঞসূত্র গলদেশে ধারণ করিবার জন্য উৎসুক ছিল— যাহারা অখাদ্য খাইয়া সর্ব্ব লোকের নিকট ঐ বিষয়ের আন্দোলন করা আপনাদের শ্লাঘা জ্ঞান করিত—যাহারা সম বয়স্ককে হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিলে বা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে শুনিলে তাহাকে অসভ্য বলিয়া উপহাস করিত—সেই তাহারা—সেই মানোয়ারী কালেজের ফের্তা গোরারা আজি নব গোরা সাজিয়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যেন স্বপ্ন যোগে দৈবাদেশে হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সহসা হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আজি হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে এই নব্য শ্রেণীর হিন্দুরা নবজীবন পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। যখন এই একটী নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন আশা করা যায়,কালে এই শ্রেণী অত্যন্ত প্রবল হইয়া আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য সমস্ত জগতে স্থাপন করিবেন। এই শ্রেণীর উদ্ভব শুভ বলিতে হইবে। এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতি দুইটি মুখ্য কারণ দেখা যায়।

(১) ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজের সহিত সংস্রবে তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি।

(২) ঐ স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তিবশত জাতীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতি কল্পে মনঃসংযোগ।

এক্ষণে আমাদের ভাবী শুভাশুভ ইংরাজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ইংরাজ আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেই আমাদের আশা ফলবতী হইবে। অর্থাৎ কোন বলদৃপ্ত স্বাধীন ধার্ম্মিক জাতির সংস্রবে আমাদের বাস এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প। এই সংস্রবে জেতার স্বাধীন ভাব আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরিত হইবে। এই জন্যই সাধু সংসর্গের মাহাত্ম্য আমাদের শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসংসর্গে সাধু-ভাব মনে সঞ্চিত হয় সুতরাং ধার্ম্মিক পরাক্রমশালী জেতার সংসর্গে আমাদের মনে যে স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমতে বিজিতের মনে স্বাধীন বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত জেতার দুইটী গুণ থাকা আবশ্যক।

(১) পরাক্রমশালিতা।

(২) ধার্ম্মিকতা।

পরাক্রমশালী না হইলে জেতার আত্ম স্বাধীনতার পক্ষে বাধা পড়িবে। জেতা ধার্ম্মিক না হইলে বিজিতের মনে স্বাধীন ভাব জন্মাইবার পক্ষে বাধা পড়িবে। ধার্ম্মিক জেতা,বিজিতকে ক্রমশ আত্মশাসন যোগ্য করিয়া বিজিতের মনে উত্তরোত্তর স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতে বাধ্য। ইংরাজ পরাক্রম-শালী ও ধার্ম্মিক সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে আমাদের মনে স্বাধীন ভাব জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাই না। ইংরাজের অপেক্ষা অপর কোন জাতি ধার্ম্মিক আছেন কি না, আমরা সম্যক্ জানি না। শুনিতে পাই অপর দুই একটী জাতি ইংরাজের অপেক্ষা ধার্ম্মিক আছেন কিন্তু আমা-দের দেশ তাঁহাদের অধিকৃত হইলে তাঁহাদের স্বভাবের যে ব্যতিক্রম হইবে না,তাহা কে বলিতে পারে। বিশেষ ইংরাজের রাজত্ব আমাদের এক প্রকার বেশ সহিয়া গিয়াছে। এই জন্য আমাদের ইংরাজের অধীনে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ২টী ব্যতীত জেতার আর একটি গুণ থাকা আবশ্যক ; কিন্তু এটী তত মুখ্য নয়।

(৩) সাধারণ তন্ত্রমতাবলম্বিতা।

জেতার এই গুণ থাকিলে বিজিতের পক্ষে এই সুখ হয়, যে বিজিত জাতি কখন যথেচ্ছাচারী রাজার ক্রীড়ার সামগ্রী হইতে পারে না। ইংরাজের মধ্যে

যদিও সম্পূর্ণরূপে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত নাই কিন্তু অনেকাংশে ইংরাজরাজ্য সাধারণ তন্ত্রের উপর গঠিত বলিতে পারা যায়। ইংরাজ রাজ্যে যথেচ্ছাচারী একজন রাজার খেয়ালের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে না। সুতরাং এক্ষণে ইংরাজ যাহাতে আমাদের দেশে বদ্ধমূল থাকিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এইরূপ সংসর্গ না করিলে কোন প্রাচীন জাতির আর স্বাধীন হওয়ার উপায় নাই। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজ যত অধিক দিন থাকিবেন, তত অধিক পরিমাণে আমাদের মনে স্বাধীন ভাবের উপায় হইবে এবং তত অধিক সংখ্যক হিন্দু তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইবে। যত পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ততই স্বদেশীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মালোচনা বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠিত হইবে এবং বল ও সাহস প্রস্ফুটিত হইবে। যেমন একদিকে হিন্দুর স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবৃত্তির আবিক্যতা হইবে, তদ্রূপ অন্য দিকে ইংরাজের মানসিক বল ক্ষয় হইয়া ইংরাজজাতির অবনতির সূত্রপাত হইবে। এইরূপ একের উন্নতি ও অন্যের অবনতি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষীকৃত সত্য।

এক্ষণে, তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের উপচয় হইলে কি প্রকারে পঞ্চম শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাহাই বলি। স্বাধীন ভাবে মনে স্বাতন্ত্র্য ভাব স্বত উদয় হয়। স্বাধীন ভাবের ফল জাত্যভিমান। মন জাত্যভিমান প্রণোদিত হইলে এইরূপ তর্কবিতর্ক করে। "অপরে আপনার ধর্ম্ম পালন করে, আমরা কেন আমাদের ধর্ম্ম পালন করি না? আমরা কেন পরের ধর্ম্মের অনুসরণ করি? আমাদের হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—আমরা হিন্দু। আমাদের শাস্ত্র আছে, এক আধ্ খানি নয়—অনন্ত শাস্ত্র। আমাদের বেদ আছে—আমাদের পুরাণ আছে—আমাদের দর্শন আছে,—আমাদের রামায়ণ আছে—মহাভারত আছে— ভাগবত আছে—আমাদের গীতা আছে,—আমাদের কি নাই? কেন ভাই আমরা আর পরধর্ম্মের দোহাই দিয়া বেড়াই? আমরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া বিধর্ম্মীর ধর্ম্মের আশ্রয় লই। আমাদের ধিক্। এস ভাই আমরা মিলিয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমন্থন করিয়া চিচিত্র ধর্ম্ম রত্নের উদ্ধার করি"। এইরূপ আন্দোলনে ক্রমে মনে অপূর্ব্ব, অগাধ, অনন্ত ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। এই ধর্ম্মোদয়ের ফল জাতীয় ভাষার উদ্ধার এবং সাময়িক পত্রের ও ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার। এইরূপে ধর্ম্মবৃত্তির সঙ্গে জাতীয় ভাষার

উন্নতি হইলে নূতন নূতন দৃশ্য ও ভাব আসিয়া মন অধিকার করে। ধর্ম্ম ভাবের পরবর্ত্তী বীরত্ব ব্যঞ্জক বৃত্তির স্ফুর্ত্তি হয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিকাশ হয়। এক্ষণে পঞ্চম শ্রেণী হিন্দুর ধর্ম্মবৃত্তির স্ফুরণের সঙ্গে জাতীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে সম্যকরূপে জাতীয় ভাবের উন্নতি হইলে, কালে এই শ্রেণীর মনে, ধর্ম্ম সহায় থাকিয়া—একতা, সাহস ও বলের সঞ্চার করিয়া দিবে। তখন এই শ্রেণীর হিন্দুরা পৌরাণিক বিখ্যাত বীরগণের কথা স্মরণ করিয়া বীরভাবে উত্তেজিত হইয়া মহাবীরের ন্যায় জয়রাম শ্রীরাম ধ্বনিতে পৃথ্বীরূপ লঙ্কাদ্বীপের আমূল প্রকম্পিত করিয়া ধর্ম্মানলে পৃথিবীর পাপরাশী সমূলে ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার পবিত্র হিন্দুজাতির বিজয় নিশান হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক মঙ্গলময় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন করিবেন।

আয় আয় আয় সেই দিন আয়
হিন্দু রাজ্য যবে শোভিবে ধরায়।
পাপে তাপে তপ্ত যবে ক্ষিতিতল
প্রেম শান্তি জলে হবে সুশীতল॥

জনৈক হিন্দু।

কে কাহার প্রাণাধিক ?

নিস্তব্ধ নিশীথে নিভৃত নিবাসে,
সুদীন শয্যায় শায়িতা সতী ;
প্রাণ যায় যায়, সম্মুখ শমন,
না মানে প্রবোধ অবোধ পতি।

নয়ন আসারে বুক ভাসি যায়,
জগৎ সংসার আঁধার ময়,
কেহ নাহি আর শরণাগতের,
সুদীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বান্ত হয়।

"থাক থাক থাক কুশলে থাক হে!
জনমে জনমে দাসী যে আমি;
বলি উঠি বৈসে, মমুর্ষু বলিছে,
"ঠাকুর গোঁসাই পদে প্রণামি।"

"মুছে ফেল জল যাই দেখে যাই
তব চাঁদ মুখ ফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
হায় মরে যাই মরণ অধিক,
বল প্রাণাধিক কে কার হায়!"
শমন শাসনে যত না কাতরা,
পতির দশায় অধিক তার,
ততোধিক সতী সন্দেহ দোলনে,—
থামিল কণ্ঠের ক্ষীণ ঝঙ্কার।

স্তবধ ব্রহ্মাণ্ড নিভৃত কুটীরে,
নিসাড়ে স্বামীর বদন চাই,
চকিতে চপলা চমকিয়া যেন
কহিলা কান্তেরে "হের হে ভাই!"
"দেখহে বারেক নয়নে আমার,
দেখা দেখি করি দুই জনায়,
প্রাণ গেলে তবু রবে প্রাণাধিক,
নয়নের মণি নয়ন্ তারায়।"

এত বলি তবে অঞ্চলে আপন
মুছায়ে নাথের নয়ন নীর,
নয়নে নয়নে বৈঠল দুজনে,
প্রকৃতি বাহিল দীর সমীর।

এক দৃষ্টে দুঁহে দুঁহেতে তন্ময়,
আত্মসাৎ একি চমতকার
আপন স্বরূপ হরি হরি বোল,
নিরখে বদনে দুঁহে দুঁহার।

দেখিতে দেখিতে উভয়ে বিভোর,
এ দিকে যামিনী প্রভাত্বা হয়,
"কৈ প্রাণাধিক লুকাও প্রতিমা!"
কহিলা কামিনী শেষ সময়।

সোণার প্রতিমা লুটায়ে পড়িল,
চোখের প্রতিমা গেল না তায়,
প্রাণাধিক ছবি প্রাণের প্রতিমা,
নয়নের পটে রহিল হায়!

কাতর ব্রাহ্মণ ছাড়িলা নিশ্বাস,
বলে "প্রাণাধিকে জিনিলে পণ!"
সুদূরে দামিনী—হাসেন কামিনী,
পদ ধূলি চাহি সীমন্তে লন।

অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ তনয়,
প্রবোধ প্রশান্তে মূরতি ধরি,
অনুরাগে নাম শুনাইল কাণে,
প্রাণ প্রতিমায় পরাণ ভরি।

বিধিমতে তার করিল সৎকার,
পরমা পবিত্রা জাহ্নবী কূলে,
আপনি সেখানে সাধিলা সমাধি,
দুরন্ত মাটির সংসার ভুলে।

সে সমধি ভূমে তমাল তলায়,
আলোকে আঁধারে দেখে পথিক,
ছায়ার কায়ায় সারঙ্গে বাজায়,
'দেখ দেখ কার কে প্রাণাধিক?"

শারীরিক বৃত্তি। *

গুরু। শারীরিক বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না, যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। †

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয়, ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

---

* অনুশীলন তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কন জন্য প্রস্তুত আছে। ইহার যে সকল অংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয় নাই, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধীয় এই অধ্যায় তাহার একাংশ। গ্রন্থের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া নবজীবনে ইহা দেওয়া গেল বলিয়া প্রথমটা একটু অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে।

† Herbert Spencer বলেন।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রত নিয়ম তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

শিষ্য। মনে করুন, হিম লাগানতে পীড়া হয়। তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্‌গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, যে কি প্রকারে কোন

বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর,—গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথায় এ কথা বলিয়াছি। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। 'শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে পরম ধার্ম্মিক ও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন।

বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্ম-রক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারে না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিষের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে, যে যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের অবশিষ্ট কথা বলিব, তখন বুঝিবে যেমন আত্মরক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার, তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ্ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না; সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফান্স জর্ম্মানির কাড়িয়া খাইতেছে,

কাল জর্ম্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পরশু বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন—এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায় সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্যজাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম, কেন না এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টান্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষ আর একটি। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয়, যে বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত।

বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তারপর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণতা জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা!

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্ক্রমাণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বারদিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনি-

---

* লেখক প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

য়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। বাচস্পতি মহাশয় কাঁচকলা ভাতে ভাত খান। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম?

গুরু। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা বলিবেন যে কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮।১৭ ॥

যে আহার আয়ুবৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকাবক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শরীরতত্ত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও, যে ইহা আয়ুঃ সত্ত্ব-বলারোগ্য সুখপ্রীতিবর্দ্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব যে তাঁহাদের বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া

বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধানদেশে, বা অন্যদেশে শৈতাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট হইতে লইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে, যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষস্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জ্জুন একাকী ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায়, যে স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ৎ পরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলন তত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় বটে তাহা হইলে প্রীতি-বৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলন জন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ, যে মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং কতকগুলা

বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই কথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা।

কলিকাতার ৩ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম পারে উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান ; বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যয়ের বাসস্থান। উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই আঁবের যে গুণাগুণ বিচার হয়, তাহা বোধ হয় কেহ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উত্তর পাড়ায় একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটি উত্তম বাজার আছে, মিউনিসিপালিটি আছে। আর আছে—একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়। সভ্যতার উপকরণের মধ্যে নাই কেবল আদালত। কিন্তু না থাকিয়াও উত্তরপাড়ায় যেরূপ মামলা মোকদ্দমা, থাকিলে যে কি হইত, বলে কার সাধ্য ?

মধ্যে একদিন উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম। দুই একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আর তথাকার পুস্তকালয়টি দর্শন করিয়াছিলাম। পুস্তকালয়ে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও কাগজপত্র আছে। দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে একখানি অপূর্ব্ব পুস্তিকা পাইলাম। পুস্তিকাখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা—নাম, সুধাবিন্দুসংগ্রহ। উহাতে তিনটি প্রবন্ধ দেখিলাম—একটি বর্গীয় হাঙ্গামার কথা, একটি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের কথা, একটি ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা। শেষের কথাটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি তর্কপঞ্চাননের ত্রিবেণীর বাটীতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে দেশীয় রীতিতে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য এক-খানি কাষ্ঠাসন বা পীড়া প্রদান করিলেন। সাহেব কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন তর্কপঞ্চানন এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার সাহেবের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—“সাহেব চুরট খাও, কিন্তু দেখিও যেন ধোঁয়া আমার গায় লাগে না।” সাহেব চুরট ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ধূম পান করিতে করিতে দুই জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন—দায় ভাগাদির কথাই বেশি। কোলব্রুক তখন দায়ভাগ অনুবাদ করিতেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় জগন্নাথের বাটীতে গিয়া দায়ভাগের কথাটাই বেশী কহিতেছিলেন।*

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তর্কপঞ্চানন সাহেবকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। জলযোগের সামগ্রীর মধ্যে ফলের ভাগই বেশী—ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, আম, কাঁটাল, রম্ভা এবং বড় একবাটি দুগ্ধ। সাহেব দুগ্ধ বেশী খাইলেন না, রম্ভা যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা খাইয়া আরো গোটাকতক চাহিয়া লইয়া খাইলেন। রম্ভার কথায় তর্কপঞ্চানন দুই একটা পরিহাস করিলেন, সাহেব শুনিয়া খুব হাসিলেন।

জলযোগের পর আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, সাহেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সংস্কৃতে ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তর্কপঞ্চানন যেন বিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন—“সে কি সাহেব, ইতিহাস নাই কি?”

সাহেব। কই, ইতিহাস কি আছে?

তর্ক। কেন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি কি? ও গুলি কি ইতি-হাস নয়!

সা। ওগুলি ইতিহাস নয়। রামায়ণ মহাভারত কাব্য, পুরাণগুলি উপন্যাস।

---

* এ কথাটা পুস্তিকায় নাই, আমাদের অনুমান মাত্র।

তর্ক। হ'লই বা কাব্য, হ'লই বা উপন্যাস—কাব্য বা উপন্যাস হইলে কি ইতিহাস হইতে পারে না?

সা। কেমন করিয়া ইতিহাস হইতে পারে? ইতিহাসে কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে। পুরাণাদিতে তাহা নাই।

তর্ক। ধরিলাম, নাই—ধরিলাম, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ নাই। কিন্তু পুরাণাদি সে জন্য ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিবে না কেন? পুরাণাদিতে যে সকল রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থনীতি প্রভৃতির বিবরণ আছে তাহা যদি প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে পুরাণাদি ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কিরূপ ফলাফল হয়, জাতিতে জাতিতে কি প্রকার সম্বন্ধ হইলে কি প্রকার ফলাফল হয়, রাজা কি প্রকারে রাজকার্য্য করিলে কি প্রকার ফলাফল হয়, ইত্যাদি মানবজীবন ঘটিত ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য—প্রকৃত মানবজীবন, প্রকৃত মানবসমাজ ও প্রকৃত রাজকার্য্য দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। নির্ণয় করিয়া যদি কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াও তাহা বিবৃত করা হয়, তাহা হইলে, সে বিবরণ মানবের ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? এই যে হিতোপদেশ গ্রন্থে এত নীতি কথা আছে। পশু পক্ষীর গল্পের ছলে সে সকল কথা লিখিত আছে বলিয়া হিতোপদেশ খানিকে নীতি গ্রন্থ না বলিয়া উপন্যাস বলিতে হইবে কি? ভগবান বেদব্যাসও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বহুলোকের জীবন, বহুবিধ মনুষ্য সমাজ ও না না রাজ্যের রাজকার্য্য দেখিয়া মানবজীবন, সমাজ ও রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্য অবগত হইয়া, পুরাণে সেই সকলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ধরিলাম, কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য পুরাণগুলি ইতিহাস না হইয়া উপন্যাস বা উপকথা হইবে কেন? এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যে বলিলে, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার কথা নাই। তুমি কেমন করিয়া জানিলে, নাই?

রামরাবণের যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের কথা, হরিশচন্দ্রের কথা—এসব যে উপকথা বা অলীক কথা, কেমন করিয়া জানিলে?

সা। আচ্ছা, এই রামায়ণের যুদ্ধের কথাটা ধর। রাম বানর ভল্লুকের সাহায্যে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়?

তর্ক। কেন, সাহেব, কলিকাতায় তোমাদের জাহাজের যে সব গোরা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে বানর বলিলে কি বড় একটা মিথ্যা কথা বলা হয় ?

সা। (হাসিয়া) না, তা হয় না, সত্য। বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহারা বানরবৎই বটে।

তর্ক। কিন্তু তাহাদের সাহায্যেইত তোমরা জাহাজে চড়িয়া মহাসাগর পার হইয়া আসিতেছ। তবে আর বানরের সাহায্যে একটা রাজাকে পরাজয় করা এমন কি অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা ?

সা। সে যাহা হউক, কিন্তু পুরাণাদিতে ত প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই, তবে—

তর্ক। আবার ঐ কথা ? কেমন করিয়া জানিলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই—প্রমাণ কই ?

সা। আচ্ছা, ও কথাটা ছাড়িয়া দিন। পুরাণাদি যে ইতি হাসের লক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাত অস্বীকার করিতে পারেন না।

তর্ক। কেন ইতিহাসের লক্ষণ কি ?

সা। ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ এই যে উহাতে অলীক বা কাল্পনিক কথা থাকে না, কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে।

তর্ক। এইত ও কথা ছাড়িয়াদিলে, আবার তুলিতেছ কেন ?

সা। তুলিতেছি তাহার কারণ এই যে, ইতিহাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অগ্রে ঐ লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

তর্ক। কিন্তু বুঝিলে ত, যে, ও লক্ষণ পুরাণাদিতে নাই এমন নয়।

সা। তা বটে, কিন্তু একটা কথা আছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হইলেই যে ইতিহাস হয়, তা নয়। ইতিহাসের বর্ণনার একটি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণের অভাবেও ইতিহাসের অভাব হয়।

তর্ক। সে লক্ষণটি কি ?

সা। সকল জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তর্ক। সে কেমন ?

সা। একটি উদারণ দিয়া না বুঝাইলে সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

তর্ক। উদাহরণ দিয়াই বুঝাও।

সা। এই রামায়ণের কথাই ধরুণ। রামায়ণ—রাজা রামচন্দ্রের কথা। কোন লোকের কথা কহিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার জন্ম স্থানের পরিচয়

দিতে হয়। কিন্তু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা সমন্ধে রামায়ণে বিশেষ কিছুই লিখিত নাই। উহা যে দেশে অবস্থিত তাহার চৌহদ্দি লিখিত নাই, যে জেলায় অবস্থিত তাহার নাম কি চৌহদ্দি কিছুই লিখিত নাই, উহার ল্যাটিটুড্ লঙ্গিটুড্ লিখিত নাই, রামের জন্মের পূর্ব্বে উহা কখন্ কোন নামে খ্যাত ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কথার কোন কথাই লিখিত নাই। তবে কেমন করিয়া বলি যে রামায়ণ ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত।

তর্ক। আচ্ছা, আরো একটু বল, লাগ্‌ছে ভাল।

সা। রামায়ণে রামের জন্মেরও কোন বর্ণনা নাই বলিলেই হয়। রামায়ণ যদি ইতিহাস হইত, তাহা হইলে উহাতে রামের জন্মের এই রকম একটা বিবরণ থাকিত—অমুক সনের অমুক মাসের অমুখ তারিখ দিবসে বেলা ৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হয়। কোন কোন ইতিহাসে বলে, ১৯ সেকেণ্ডের সময় নয়, ১ ½ সেকেণ্ডের সময়। কিন্তু অপর সমস্ত কাজ ফেলিয়া, এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এক রকম ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর খাস সেরেস্তায় ক্রমাগত সাড়ে চারি বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি যে রামের জন্ম ১৯½ সেকেণ্ডের সময় হয় নাই, ঠিক ১৯ সেকেণ্ডের সময় হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন ১৯½ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রম করিয়াছেন এবং ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহারা আর একটি বিষম ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সূতিকাগারে রামের জন্ম হয়, তাহা ৭ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ ও ৫ হাত উচ্চ। আমরা কিন্তু এবিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করা অতিশয় প্রয়োজনীয় জানিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি। যে ঘরামি সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল রাজবাটীর হিসাব সেরেস্তায় তাহার নাম ধাম জানিয়া লইয়া আমরা প্রথমে অযোধ্যার ঘরামি পল্লীতে তাহার অনুসন্ধান করি। দশ পনর দিন অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম যে সে ঘরামি অযোধ্যাবাসী নয়, সে রামের জন্মের কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া ঐ সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আবার স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা দুই তিন মাসের পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলাম। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘরামির গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঘরামিকে সূতিকাগারের দৈর্ঘ্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে

বলিতে পারিল না, বলিল—আমার মনে নাই। তখন ভাবিলাম, এত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান বৃথা হইতেছে। সেটা কিন্তু ভাল নয়। এ রকম অনুসন্ধান বৃথা হইলে কাহারো ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে ইতিহাসের সমূহ ক্ষতি হইবে। অতএব সূতিকাগারের পূর্ব্ব বর্ণনা ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেই হইতেছে। ভ্রান্ত যে নয়, তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়।

অযোধ্যার পাটরাণীর সূতিকাগার দৈর্ঘ্যে ৭ হাত, প্রস্থে ৪ হাত ও উর্দ্ধে ৫ হাত বই নয়, এমন কি হইতে পারে? সে সূতিকাগার নিশ্চয়ই দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত, প্রস্থে ৪০ হাত এবং উর্দ্ধে ৫০০ হাত।

রাম ভূমিষ্ঠ হইলে পর কৌশল্যার প্রধানা পরিচারিকা রাধী খাস দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে শুভ সম্বাদ জ্ঞাপন করিল। তখন বেলা ১০ ঘণ্টা ১১ মিনিট ২২ সেকেণ্ড।

তখন খাস দরবারে প্রধান মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, ৭ জন সভাসদ, ৬ জন চোপদার, ৪ জন খানসামা, ২ জন গুপ্তচর, ২ জন পত্র লেখক, ৪ জন পত্র বাহক এবং ১২ জন প্রহরী উপস্থিত ছিল। সম্বাদ পাইবা মাত্র রাজা পুত্র দর্শনার্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। সিংহাসন স্বর্ণনির্ম্মিত দেড় কোটী আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মণি মুক্তা খচিত এবং ওজনে ১ মন ৩৫ সের ৩ পোয়া ২৫০ ছটাক। সিংহাসন হইতে নামিয়া তিনি প্রধানামাত্য, সভাসদগণ, ২ জন খানসামা ও ৪ জন প্রহরীকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুমতি করিলেন এবং আপন কণ্ঠহার খুলিয়া রাধীকে তাহা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সে কণ্ঠহারের মূল্য ৭৫ লক্ষ ১১ হাজার ৫১ ৭১/২ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজা দশরথ তখন আহ্লাদে এতই বিহ্বল যে বাঁ পায়ের জুতা ডান পায়ে এবং ডান পায়ের জুতা বাঁ পায়ে দিয়াই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই অত্যাবশ্যক কথাটি অন্য কোন ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। এবং সেই জন্য সে সকল ইতিহাস এক কালে অসার, অপদার্থ ও গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া এই মহামূল্য কথাটি অবগত হইয়া ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

রাজা সূতিকাগারের দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র পুরবাসিনীরা শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন প্রধানা ধাত্রী নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। প্রধানা ধাত্রীর নাম যোশি, তাহার বয়স

৬৩ বৎসর ৭ মাস ১২½ দিন। সে গৌরবর্ণা ও কৃশাঙ্গী। তাহার বাম হস্তে ৬টি অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখটি খুব বড়। রাজার সম্মুখে আনিবামাত্র শিশু একবার হাঁচিয়া ফেলিল। সকলে 'দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ু' বলিয়া উঠিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া কোষাধ্যক্ষ শিশুকে যৌতুক ও ধাত্রীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা বহির্বাটীতে গমন করিবেন বলিয়া ফিরিলেন। কিন্তু তখনও তিনি আহ্লাদে এত আত্মহারা যে কৌশল্যার মহল দিয়া না আসিয়া কৈকেয়ীর মহল দিয়া আসিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে যখন কৈকেয়ীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ একজন পরিচারিকা কৈকেয়ীর গৃহাভ্যন্তর হইতে এক কুলা ছাই গৃহের বাহিরে ফেলিয়া দিল। ছাই উড়িয়া রাজার চক্ষে পড়িল। 'আঁখ্ গিয়া, আঁখ্ গিয়া' বলিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন। প্রহরিরা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কৈকেয়ীর পক্ষের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে সেই অবধি রাজা অন্ধ হন। কিন্তু আমরা জানি, তা নয়—তাঁহারা ঘোর মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধানের ফল এই ইতিহাসের যথা স্থানে প্রকাশ করিব। তাহার পর—

তর্ক। আর বলিতে হইবে না। এই রকম করিয়া লিখিলেই ইতিহাস হয়?

সা। হাঁ।

তর্ক। বাল্মীকি যদি এই রকম করিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ ইতিহাস আখ্যা পাইত?

সা। পাইত বই কি।

তর্ক। আচ্ছা, এরকম ইতিহাস তোমাদের কত আছে?

সা। সহস্র সহস্র—সংখ্যা হয় না।

তর্ক। তোমাদের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থের আদর কেমন?

সা। খুব আদর—এমন কি, আমাদের মধ্যে যে যত ইতিহাস পাঠ করে সে তত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়।

তর্ক। তোমাদের টোলেও কি ঐ রকম ইতিহাস বেশি পঠিত হয়?

সা। আমাদের টোল নাই, ইস্কুল, কালেজ ও ইউনিবর্সিটি আছে। তথায় বালক দিগকে রাশিরাশি ইতিহাস পড়িতে হয়, নহিলে তাহাদিগের শিক্ষা নিতান্তই অঙ্গহীন হয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

তর্ক। সাহেব, তোমাদের ইতিহাস আর তোমাদের শিক্ষা লইয়া তোমরা থাক, আমাদের উপকথাই ভাল। এখন এস অন্য কথা কই।

শিশু মহারাজ।

ঝিমি ঝিমি নিশীথিনী, সাধে গলা বিষাদিনী,
লক্ষ ঝিল্লী তাহে সঙ্গেতে ঝঙ্কারে;
লক্ষ্য নাই কারু পাছে, বক্ষ পাতি পড়ি আছে,
গভীরা, গম্ভীরা, বিভোরা আঁধারে।
কোলেতে কালিন্দী কন্যা, কূলে কূলে বহে বন্যা,—
অন্ধ জননীর নন্দিনী আঁধার,
কেবল উজ্জ্বল ছটা,— কুন্তল সীমন্ত ঘটা,
হীরক কোরক তারক আকার।
গহন অটবী ঘন, বিশাল বিটপীগণ,—
প্রবলা বল্লরী ভারতে আচ্ছন্ন;
অন্ধকার স্তূপ মত রহিয়াছে ইতস্ততঃ,
শাখা কাণ্ড পত্র সমানে প্রচ্ছন্ন।
বিরাট বিটপী বট ঢেকেছে কালিন্দী তট,
সোঁটা সোঁটা জটা বিলম্বিত জলে,
যেন সেই বটতল, তামস আশ্রয়স্থল;
—ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা জ্বলে।

অমোঘ পশ্চিমে মেঘ, অমোঘ বায়ুর বেগ,
দেখিতে দেখিতে ছায়িল গগন।

কোথা সে নক্ষত্রকুঞ্জ, কুন্তলে হীরকপুঞ্জ ?
ঘোর অন্ধকারে বিশ্ব নিমগন।
না—না—খদ্যোতিকা আছে, ঝোপে ঝাপে গাছে গাছে,
সাজায়ে রেখেছে সুন্দর সজ্জায় ;
বাতাসে উড়ায়ে লয়, তথাপি জড়ায়েরয়,
ক্ষুদ্রের পিরীতি মরিতে জুয়ায়।
শোঁও শোঁও সমীরণ হেলাইল মহাবন,
আতস ফুয়ারা খদ্যোত ছুটিল ;
কালিন্দীর কাল জলে, মজিতে মজিতে জ্বলে,
তরঙ্গ ভঙ্গেতে পরাণ তেজিল।
মরিল খদ্যোত পুঞ্জ, নিবিল তারকাকুঞ্জ,
গগন মেদিনী সব একাকার ;
জুড়িয়া জগত কায়া— ছায়া—ছায়া—মহাছায়া—
সব অন্ধকার—মহা অন্ধকার !

আসে বৃষ্টি তড় তড়, চলে বজ্র গড় গড়,
দামিনী দীপিছে ব্যোম জল স্থল,
বটতলে দৃশ্যমান— বালচ্ছবি লম্বমান,
ঊর্দ্ধ করপুটে, বিভোর বিহ্বল।
ভয়েতে বিহ্বল নহে, অটল দাঁড়ায়ে রহে,
বায়ু বারি বজ্রে ভ্রূক্ষেপ করে না,
মাতৃ অঙ্কে শিশু যেন, সুপ্রফুল্ল ভাব হেন,
নড়ে না, চলে না, টলে না, সরে না।
সায়ম্ভুব মনুবংশে উত্তান পাদের অংশে,
ধ্রুব নামে শিশু, সুনীতি নন্দন,
পঞ্চম বর্ষের বেলা তেয়াগিয়া ধূলা খেলা,
কঠোর কঠিন তপস্যা মগন।
কি কোমল কম কান্তি ভক্তি ভরা পূর্ণ শান্তি !
উজ্জ্বলে মধুরে মোহন শোভন !

এক মনে, এক ধ্যানে, রুদ্ধশ্বাসে, শুদ্ধ প্রাণে,
ভাবে মাত্র পদ্ম-পলাশ-লোচন।

বাড়িল বায়ুর রড়, বহিল তুমুল ঝড়,
মড়মড় শব্দে শাখা ভাঙ্গি পড়ে,
বর্ষিছে মুষল ধারে, ইরম্মদ হুহুঙ্কারে,
ঘর্ঘর ঘর্ঘর কড়কড় কড়ে।
পড়ে বজ্র শিশু পাশে,— মধুর অধরে হাসে;
ধীরে ধীরে শিশু মেলিল নয়ন;
দেখিল জ্যোতির স্তম্ভ— স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবলম্ব,
বলে, 'এলে পদ্ম-পলাশ-লোচন!'
ধ্রুব যায় দিতে কোল, থামিল দারুণ রোল,
নিমেষ ফেলিতে নিভিল জ্বলন;
হেরে শিশু চারি ধার, অন্ধকার! অন্ধকার!
বলে, 'গেলে পদ্ম-পলাশ-লোচন!'
পুন ধ্রুব পরক্ষণে, একান্ত প্রশান্ত মনে,
ভক্তি-ভর-ভাবে, ভাবে নারায়ণে;
সুনীতি বলেছে যাহা, শুদ্ধ মাত্র ভাবে তাহা,
সেই এক পদ্ম-পলাশ-লোচনে।

হইতেছে ঝড় বৃষ্টি, নড়িছে ব্রহ্মার সৃষ্টি,
না নড়ে, না টলে, ধ্রুব ধ্রুবচিত;
চৌদিকে আঁধার ঘোর, অন্তরে উজ্জ্বল ভোর,
অঙ্গে মৃদু কান্তি হয় বিভাসিত।
ঘন ঘোর ভূকম্পনে, বজ্রপাতে ক্ষণে ক্ষণে,
গিরি গুহা ছাড়ি সিংহ বাহিরিল,
জ্বলিছে লোচন ছটা, ভিজিছে কেশর জটা,
লেলিহান জিহ্বা জ্বলিতে লাগিল।
গর্জ্জে বজ্র মহা ঘোষে; সিংহ সিংহ নাদে রোষে,
উদ্ধ ফুদ্ধ হয়ে চারি দিকে চায়,

মারে পঞ্জা ভিজা ভূমে, আঁচড়ে কামড়ে ক্রমে,
আশ্রয় আশয়ে বট তলে যায়।
জটায় আছড়ে লেজ, নয়নে নিকলে তেজ,
ছট ছট ছটা কেশর ঝাড়িল,
থাবা মারি বসে ভূমে, গর্জ্জে বজ্র মহা ধূমে,—
গম্ভীর জৃম্ভনে মুখ ব্যাদানিল।
সম্মুখে দেখিল মূর্ত্তি, মৃদুমন্দ কান্তস্ফূর্ত্তি,
লাবণ্যের ছবি দাঁড়ায়ে বালক,
নাহি নড়ে, নাহি টলে, চক্ষু মুদে কুতূহলে,
সর্ব্বাঙ্গে জলিছে শীতল দীপক।
দাঁড়াইল পশুরাজ, ঝাড়িল কেশর সাজ,
একদৃষ্টে রহে চাহি শিশু পানে,
ধীরে ধীরে অগ্রসরি, বিকট হুঙ্কার করি,
স্ফীত নাসা পর্শি শিশুরে আঘ্রাণে।
পর্শ মাত্র চেত হয়, দেখে সিংহ ঘ্রাণ লয়,
গন্ধক দেউটি জ্বলিছে নয়ন,
সিংহে শিশু টানে কোলে, তেমনি মধুর বোলে,
বলে 'এলে পদ্ম-পলাশ-লোচন।'
ধীরে ধীরে চেলাঞ্চলে ঝাড়িল কেশর দলে,
সিংহ অঙ্গে হস্ত করিল মর্ষণ,
লাঙ্গূল লইয়া গলে, বলে শিশু কুতূহলে,
'কোথা ছিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন?'
গলিল পশুর প্রাণ, আবার লইল ঘ্রাণ,
জানু পাতি ভূমে শির নোয়াইল,
লাঙ্গুলে বেড়িয়া ধরে' উঠাইল পৃষ্ঠোপরে,
হুঙ্কারি, আস্ফালি, উঠি দাঁড়াইল।
দাঁড়াইয়া সিংহ পৃষ্ঠে, চাহে শিশু ঊর্দ্ধদৃষ্টে,
বলে 'ভাই পদ্ম-পলাশ-লোচন!
কই সে জলন্ত স্তম্ভ, হুহুঙ্কার মহাদম্ভ,
লুকাইছ কেন ওহে নারায়ণ!'

বিস্ময় মনেতে মানি, বলিতে বলিতে বাণী,
ধীরে ধীরে ধ্রুব মুদিল নয়ন;
পড়ে বজ্র, বাড়ে বৃষ্টি, কম্পে ভূমি, নড়ে সৃষ্টি,
—ভাবে সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন।

কালিন্দীর কাল জলে, কালের কল্লোল বলে,
ঘর ঘর জীব যায় খর টানে,
অজগর ফণধর, যায় স্রোতে তর তর,
আছাড়ি, কাছাড়ি, তরঙ্গ তুফানে।
লাগিল বটের জটে, উলটি পড়িল তটে,
সুদীর্ঘ আয়ত বিষম ভয়াল।
হইল জীবনে আশ, ছাড়ে সর্প দীর্ঘশ্বাস,
ব্যাদানে বদন বিস্তৃত করাল।
জ্বলে চক্ষু ধীকি ধীকি, নাড়ে জিহ্বা লীকি লীকি,
বিস্তারয়ে ফণা দ্বিগুণ চৌগুণ।
বাঁকায়ে তুলিল শির, কাঁপাইল ধীরি ধীর,
জ্বলে শিরোমণি শীতল আগুণ।
মণি আভা বটতলে, অতি মৃদু মৃদু জ্বলে,
সিংহোপরে শিশু ভুজঙ্গ হেরিল,
মূর্ত্তি সুকুমারতম, ননীর পুত্তলীসম,
রসনা নিকলি চাটিতে লাগিল।
চেতনা পাইয়া তবে, সর্পেরে হেরিল যবে,
ভাবে এই পদ্ম-পলাশ-লোচন।
দেহ অতি সুবিচিত্র, শ্বেত কৃষ্ণ কত চিত্র,
মাথায় মানিক অতীব শোভন।
ধরিল ভুজঙ্গ গলে, বক্ষে নিল কুতূহলে,
করিল চুম্বন দ্বিজিহ্ব বদন,
বলে 'দেখি অপরূপ তোমার কতেক রূপ!
বহুরূপী পদ্ম-পলাশ-লোচন।'

ঘুচিল সর্পের দর্প, পাশেতে দাঁড়াল সর্প,
ধরিল ছত্রক শিশুর মস্তকে।
ছাড়ে বৃষ্টি বজ্রপাত; বিশ্ব শান্ত সুপ্রভাত;
পূরব গগনে অরুণা ঝলকে।
পাখীতে প্রভাতী গায়, বহিছে মলয় বায়,
সুধীর সুশান্ত যমুনার জল,
সুস্নিগ্ধ ধরণী পরে তরুণ অরুণ করে,—
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পূরিত সকল।

সপ্তঋষি যায় স্নানে, উপনীত সেই স্থানে,
দেখে সিংহাসনে শিশু মহারাজ,
বিস্তারিয়া ফণপত্র মাথায় ধরেছে ছত্র
মহা অজাগর ভীম নাগ রাজ।
স্মরে তবে ঋষিগণ, "এই সেই মধুবন,
এই সেই ধ্রুব, সুনীতি বালক,
আমাদেরি উপদেশে আসি এই বন দেশে
বিশ্বাসে আশ্বাসে হয়েছে সাধক।"
বুঝিল, ভক্তির বলে ধ্রুব শিশু ধরাতলে
শ্রেষ্ঠ রাজপদ লভিয়াছে আজ,
সিংহ পৃষ্ঠে শিশু আছে, সর্প ছত্র ধরিয়াছে,

প্রকৃতির রাজা শিশু মহারাজ।

উপরে বিটপী বটে— চন্দ্রাতপ শোভা বটে,
যমুনা বহিছে—অভিষেক জল,
প্রাচীন অরুণ ভাতি— হৈম দীপে জ্বলে বাতি,
সামগান গায় দ্বিজ অবিরল।
তবে সেই সপ্ত ঋষি ঘেরি ঘেরি চউদিশি,
ধ্রুবমহারাজে করে প্রদক্ষিণ,—
মরীচি, অঙ্গিরা, আর অত্রি, ক্রতু, এই চার,
পুলস্ত, পুলহ, বশিষ্ঠ এ তিন।

কন্ধে শ্বেত নামাবলি, বক্ষে শ্বেত লোমাবলি,
শ্বেত কেশ দাম, শ্বেত শ্মশ্রু ধারী,
তালে তালে এক কালে, রুদ্র তালে, ব্রহ্ম তালে,
নাচে, গায়, ফেরে—সারি সারি সারি।

"জয় ব্রহ্ম সনাতন! শিশুর সর্ব্বস্ব ধন!
ভক্তের ভক্তিতে ভাবনা-ভঞ্জন!
বালক সাধক বরে রক্ষিলে অপন করে,
ধন্য তুমি পদ্ম-পলাশ-লোচন!"

মৈথিল যাত্রা।

মিথিলায় বাইজীর আড্ডা বহু দিন হইতেই আছে; সম্প্রতি বাবুজী এখানে এসে থিয়েটার খুলেছেন। মৃদঙ্গ করতালের স্থানে তবলা বেহালা অভিষেক করিয়া আড়-খেমটায় আখড়াই দিতেছেন। সারঙ্গে সা রে গা মা সাধনা পূর্ব্বমতই চলিয়াছে; উপরোক্ত বাঙ্গলী বাবুর বিলাতি সুর বিবিজানের বামাসুরে মিশিয়া বাঙ্গালার ন্যায় এই মেড়ুয়ার দেশ মিথিলাতে ঢালওয়া নাট্য রসের অতি সুন্দর ও সুভ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। সংগীত শাস্ত্রের সেবা কিম্বা শ্রাদ্ধ হইতেছে, আমি ঠিক বলিতে পারি না, শাস্ত্রে আদপেই অধিকার নাই। তবে এটা খুব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ত্রিহুতে বিদ্যাপতির আমলের সে বাদ্যভাণ্ড এখন চুরমার প্রায়। সে কালের সেই ধানশী, ধ্রুপদ, ধামালের অন্তর্জ্জলী উপস্থিত—বাইজী ও বাবুজীর মৃদু মধুর কণ্ঠ সঞ্চালনে। ধামাল ধানশীর অবস্থা যাহাই হউক, আমি নিজে কিন্তু বাইজী বা বাবুজী কাহারই প্রতি বৈমুখ নহি। শাস্ত্রে দখল না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়কেই আমি,—ষোল আনা রকম না হউক,—এক আধ আনা আনন্দও সম্ভোগ করিতে সমর্থ। বাইজীর,—বিধাতা তাঁহার

ব্যবসা বজায় রাখুন,—গজল্ (নোক্তাদার ও বে-নোক্তা) আমার বিলক্ষণ প্রিয়। পরন্তু বাবুদের "নাট্য—সমাজ" রঙ্গাভিনয়ও আমার আরাম-দায়ক। রূপে রসে রাগে উপরোক্ত উভয়ের কেহই কম নহেন। সংক্ষেপত এ অধীন উভয়েরই নিকট কৃতজ্ঞ, উভয়েরই বাধ্য।

তবে জনৈক স্বদেশীয় সমজদার আমাদের আধুনিক যাত্রা সমালোচনা প্রসঙ্গে কেমন একটা কথা লিখে ফেলেছেন,—সেটা আমার সময়ে সময়ে হঠাৎ মনে এসে যায় কিন্তু কথাটা কিছু কর্কশ। কথাটা এই ভাবের যে যেদিন থেকে আমাদের দেশে তবলা বাঁওয়া দেখা দিয়াছে, সেই দিন থেকে নাকি সুর-সঙ্গত-সঙ্গীতের সপিণ্ডীকরণ আরম্ভ হইয়াছে। সে সপিণ্ডীকরণ সাক্ষ্য দিয়া সপ্রমাণ বা সমর্থন করিতে আমি উদাসীন; পরন্তু উহার সত্যতার বিচার—বিবেচনা—বিশ্লেষ করিতেও আমি স্বভাবত ও শিক্ষা বশত অক্ষম। কেবল এই প্রবাসে ঐ পিণ্ড পরিচ্ছেদ যদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহারই কিছু 'পরিভাষা' করিলেও করিতে পারি। কিন্তু আমার এই 'প্রবন্ধের' বিষয় 'মৈথিল যাত্রা'। অতএব অন্য বিষয়ে অধিক ছন্দ বন্দ, আর অন্যায়।

গত জানুয়ারি মাসে,—কথাটা একটু গোড়া ঘেঁসে বলাই ভাল,—একটা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে, কিছু "রং তামাসা" দিবার প্রয়োজন আমাদের হয়। রং তামাসা, সাধারণেরই জন্য; অতএব সাধারণ রুচির অনুবর্তী হইয়াই আমরা তাহার বন্দোবস্ত করি; কয়েক দিন ধরিয়া খুব নাচ-রঙ্ দিবা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত (?) হয়। বাই নাচ, নট নাচ্—কয়েক রকমের "নাচরং" ভিন্ন ভিন্ন তয়েফায় ছিল। অবশ্য কেবলই নাচ নয়, গানও ছিল এবং গানই অধিক। কিন্তু 'নাচ' কথাটাই এ অঞ্চলের লোক সাধারণত ব্যবহার করে, তা যে ধরণের নৃত্য গীতই হউক না। সেই জন্য এখানে আমাদের এখন যে 'থিয়েটর' বা "নাট্য সমাজ" হইয়াছে তাহাকে এখানকার লোকেরা বলে "বাঙ্গালীর নাচ"। বিপদ আর কি!

কয়েক দিন ভিন্ন ভিন্ন নাচ রঙের পর আমার নিজেরই ইচ্ছা ক্রমে এবং জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ সহকারীর পরামর্শে আমরা, একদল অমিশ্রিত আসল মৈথিল 'নাচ' আনাইলাম। ইহাকেই আমি বলিতেছি 'মৈথিল যাত্রা'। মৈথিল যাত্রায় মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল দেখিলাম; সারঙ্গের মত এক রকম বেহালাও দেখা গেল। বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। যাত্রার অধিকারী

আছে, ছোকরা আছে, সখী আছে, সংও আছে। অথবা ইহারা সকলই সং।
ইহাদের হাব ভাব পোষাক ‘পেনয়াজ’ দেখিয়া আমি নিজে পুরাতন শ্রেণীর লোক হইয়াও প্রথমত হাসি রাখিতে পারি নাই; অতএব নব্য সভ্য বাবুদের ত কথাই নাই। অধিকারীর মাথায় মুকুট, পরিধানে পুরুষের পোষাক; ধুতি মেরজাই, কখনও বা চিলে পায়জামা। সখীরা আমাদের বাঙ্গালা যাত্রার সখীদেরই মত;—নাচে, গায় ‘পাঁওচারি’ করে। নৃত্যের প্রত্যেক উপসংহারে বাহুর বক্র বিস্তার,—তদ্দ্বারা তাল রক্ষা,—একটু নূতন ভঙ্গি,—সেটুকু আর লিখে কিরূপ জানাইব? এই যাত্রাকে মৈথিলরা খুব বিশুদ্ধ ভাষায় অভিহিত করে;—বলে “নাটক অভিনয়।” কথাটা ইহাদের মধ্যে, আমাদের মত, ইংরেজী আমলের আমদানি নহে। উষাহরণ, পারিজাত হরণ, কৃষ্ণের জন্ম ইত্যাদি অনেক রকমের নাটক অভিনয় এখানকার যাত্রা-ওয়ালারা করে। তা ছাড়া বিদ্যাপতির পদ গায়, গীত গোবিন্দের গাথা গায়। অধিকারী সংস্কৃত ছড়া কাটে, শ্লোক পড়ে, কবিতা ব্যাখ্যা করে, বক্তৃতা দেয় ‘ঘটকালি করে।’ যাত্রার গানের ও কথার ভাষা চমৎকার বিশুদ্ধ, অধিকাংশ সংস্কৃত; পরন্তু মৈথিল ভাষার মিষ্টত্বের ত কথাই নাই। যে সব নাটক সচরাচর ইহারা অভিনয় করে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক এবং বেশ পণ্ডিতদিগেরই রচিত। মৈথিল ভাষার উষা হরণ, নাটক সে দিন ছাপা হইয়াছে দেখিলাম। এখানি, “শ্রীহর্ষনাথ শর্ম্মণা মৈথিলেন প্রণীতম্।” এই নাটকের এক আধটা গান অবকাশ মতে আপনার পাঠক দিগকে উপহার দিলেও আমি দিতে পারি।

নাটক অভিনয়ের “তোড় যোড়” সাজ সরঞ্জম—এই যাত্রাওয়ালা দিগের কিছু কিছু না আছে, এমন নয়; কিন্তু সে সব নেহাত জঘন্য ও অপ্রচুর। প্রকৃষ্ট ও প্রচুর হওয়াও অসম্ভব। আহার সমেত সবলগে সাত টাকা ভোর রাত্রি ‘নাটক অভিনয়’ দেওয়ার থোকা খরচ। ইহাতে আর কত প্রত্যাশা করিতে পারেন মহাশয়! এখনকার সব মৈথিল রাজা-রাইচরা সুইডেন সুইজরলাণ্ডের সংগীতের উন্নতি সাধনার্থ ভূরি অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যয় করিতে প্রস্তুত শুনিতে পাই। তা তাঁহাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের জন্য সিকি পয়সাও যদি কখনও ব্যয় করিতেন, তা হলে বোধকরি এই যাত্রার অন্য রকম বৃত্তান্ত আমাকে লিখিতে হইত। কিন্তু ‘উন্নতিতে’ আসল জিনিষ যেমনতর আজকাল বিগড়ে যাইতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে ‘উন্নতির’

নাম লইতেও যেন কেমন একটা ভয় হয়। আধুনিক উন্নতি প্রবেশ করিলে এই মৈথিল যাত্রার হয় ত ভিন্নমূর্ত্তি দেখিতে হইবে এবং সে মূর্ত্তিতে আর ইহার খাটি স্বজাতীয়তাটুকু দেখা যাইবে না।

আমরা যে যাত্রা আনাইয়াছিলাম তাহা নাকি এখানকার খুব একটা শ্রেষ্ঠ দল। রাজা মহারাজা শক্তি শ্রোত্রীয়ের মজলিসেই নাকি ইহার 'গাওনা' হয়; যথা তথা হয় না। এই যাত্রাব নাম শুনিতেই আমাদের ফার্শী নবিস লালা আমলারা যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাঁহাদের মতে,—মতটা যদিও তাদৃশ সপ্রকাশ হইবার অবসর ছিল না, উপরোক্ত সঙ্গীত 'অসভ্য গোঁয়ারের গান'। তাঁহাদের ভাবটা এমনিতর যে যা কিছু সভ্য ও সুচিক্কণ তাহা কেবল বাইজীর গজলে। বস্তুত মুন্সী মহাশয়রা মুসলমানী দ্রব্য ভিন্ন অন্যত্র সভ্য "তামিজি" 'চিজ্' খুব কমই দেখেন। মুন্সীরা আমাদের "ময়াফেলে" আসিলেন বটে, কিন্তু এ 'ময়াফেল' তাঁদের মনের মত হইল না। আদব কায়দার' খাতিরে অল্পক্ষণ বসিয়া আমাদের মন রক্ষা করিয়া একে একে আস্তে আস্তে পিট্টান দিলেন। এখন যত বিপদ আমার আর সেই মৈথিল ব্রাহ্মণটার। গান আমাদিগকে শুনিতেই হইবে; নহিলে আর শুনে কে? রাত্রি কাল কন্‌কনে শীত, তবুও নিস্তার নাই। চেয়ারের চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া কম্পিত কলেবরে যাত্রা শুনিতে লাগিলাম। কয়েক দিন বিবি ও বাবুয়াদের * ক্ষীণ কণ্ঠের চুটকি কর্তপে, তবলা সারঙ্গের মৃদু ঝন ঝনে, কর্ণ-পটহ কিছু 'মদালস-ময়' হয়ে উঠেছিল;—আজ তাহার পূর্ণ 'সংস্কার' উপস্থিত। 'ত্রিহুত' (২) গীতের তার স্বরে তীক্ষ্ণোচ্চ ঝঙ্কারে কর্ণ-বিবর বুঝি বা বিদীর্ণ হয়। সপ্তমের উপরেও যদি কোনও উচ্চতর 'স্বর গ্রাম' থাকে তা হলে তাহা এই এখানে,—'ত্রিহুত' গীত ধরিবার সময়। বস্তুত এমন তর 'চড়া সুরে' গান ধরিতে অন্যত্র অনুভব করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যাহা হউক আজ 'মজলিসের' ভাব অন্য রকম। পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া বাইনাচ হইতে বন্দর নাচ খুবই হইয়াছিল, কিন্তু গান এক দিনও 'জমে' নাই কিন্তু আজ বিলক্ষণ 'জমাট'। মৃদঙ্গের গভীর নাদে ও 'ত্রিহুতের' আকাশ-ভেদী

* ছোট ছোট ছোকরা নট।

(২) বিদ্যাপতির পদাবলী ও তদনুরূপ গীতকে 'ত্রিহুত' বলে। বলার কারণ, এই সকল গান খাস ত্রিহুতের কীর্ত্তি বলিয়া নয় কি?

গানে 'গান জমিয়াছে', শীত ভাঙ্গিয়াছে, লোক জুটিয়াছে; আর চাই কি? এখন আমি কেবল এই বলিতে চাই. যে মৈথিল যাত্রা অদ্যাপি ইহার আদিম ভাব রক্ষা করিয়া বগায় আছে এবং আমাদের যাত্রার প্রাথমিক অবস্থার ইতিবৃত্ত খুঁজিতে হইলে নমুনা স্বরূপ দৃষ্টিপাত করিতে হয়, এই মৈথিল যাত্রার প্রতি। তবলা বামা ও ক্ষীণ কণ্ঠের ও চুটকি সুরের বিস্তর গুণ গ্রাম, মনোহরণ-শক্তি থাকিতে পারে এবং আছেও বটে—কিন্তু উহারা যে আমাদের যাত্রার জমাট ভাব ধ্বংশ করিয়াছে, বা প্রতি রাত্রেই করিতেছে,—ইহা এক রকম নিশ্চিত।

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৪।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের সামান্য স্ফুলিঙ্গ ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে দুরাকাঙ্ক্ষার শুষ্ক সমিৎ কাষ্ঠের পরিপোষণে কুপ্রবৃত্তির কুবাতাসের পরিসেবনে, দারুণ দাবানলে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনার বাস্তু-ক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া ফেলে, মাক্‌বেথ নাটকে তাহাই দেখান হইয়াছে। মুঞ্জ-তরু যেমন আপনার বীজ-কোষেই বীজ সকল অঙ্কুরিত, আর অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার হৃদয়েই শতশত ক্ষুদ্র তরু ধারণ করে, একটি জীবন্ত মহাপাপ, তেমনই শত শত পাপাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিরাজমান হয়, ইহাই মাক্‌বেথ নাটকের কথা।

প্রথম অঙ্কে অতি সামান্য অঙ্কুর হইতে পাপতরুর পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন; অঙ্কের শেষ ভাগে পাপতরু জট গড়িয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পাপতরু বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় নব নব পুষ্প পত্রে বিরাজমান;

তৃতীয় চতুর্থে সেই বিষতরুর ফল পাকিতেছে, বৃক্ষের উপরই শত শত অঙ্কুর হইতেছে, শত শত পাপ বৃক্ষ, মহা বৃক্ষে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এখন সেই কথাই বলিতে চলিলাম।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, রাজভবনের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাঙ্কো আপনা আপনি ভাবিতেছেন। এই নাটকে কি ভাবে বাঙ্কো মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাহা এই স্থলে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মাক্‌বেথ যেরূপ ডঙ্কানের সেনাপতি ছিলেন, বাঙ্কোও সেইরূপ সেনাপতি ছিলেন; নাটকের আরম্ভেই দেখা গিয়াছে, উভয়েই অতুল সাহসে তুমুল সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মাক্‌বেথ ও বাঙ্কোর সহিত প্রথমে একত্র আমাদের সাক্ষাৎ—তখন নব বিজয়ের উৎসাহে উভয়ে রাজ-শিবিরে আসিতেছিলেন—পথি মধ্যে প্রান্তর ভূমিতে প্রেতিনীগণকে দেখিতে পান। বাঙ্কোই প্রথমে দেখিতে পান; কিন্তু প্রেতিনীগণ প্রথমে মাক্‌বেথকেই অভিবাদন করে। মাক্‌বেথ সিহরিয়া উঠিলেন, বাঙ্কো প্রেতিনীদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। মাক্‌বেথ শিহরিয়া উঠিলেন, কেননা প্রেতিনীরা তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; বাঙ্কো ভৎর্সনা করিলেন যে তাঁহারা দুই জনেই আসিতেছেন, তাহারা একজনকে অভিবাদন করিল, আর একজনকে কিছু বলিল না কেন? বাঙ্কো আপনিই বলিলেন, যে তিনি প্রেতিনীদের অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বা নিগ্রহের আশঙ্কা করেন না; * মাক্‌বেথ কিন্তু একেবারে অভিভূত হইলেন, এই চরিত্র বৈচিত্র আমাদের বিশেষ লক্ষণীয়।

প্রেতিনীরা তিরোহিত হইলে, বাঙ্কো মাক্‌বেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য সত্যই আমরা প্রেতিনী দেখিলাম, না, পাগলা গেঁড়ো খেয়ে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে?" মাক্‌বেথ উত্তর করিলেন "তোমার সন্তানেরা রাজা হইবে।" কি কথার কি উত্তর! বাঙ্কো ভাবিতেছেন,—যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কিনা—মাকবেথ ভাবিতেছেন, তাহারা যাহা বলিল তাহা ফলিবে কি না! দুরাকাঙ্ক্ষার বিষ-বীজ মাক্‌বেথ হৃদয়ে আপনার প্রকৃতি-সঙ্গত রস পাইয়াছে; বাঙ্কোর হৃদয়ে পায় নাই।

---

* Speak then to me, who neither beg nor fear
Your favours nor your hate.

প্রথম অঙ্কে। চতুর্থ দৃশ্যে দেখান হইয়াছে রাজা ডঙ্কান মাক্‌বেথ ও বাঙ্কো উভয়কেই সমান ভাল বাসিতেন, সমান আদর করিতেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখান হইয়াছে, বাঙ্কো মাক্‌বেথ ভবনে প্রবেশ করিয়া মহা আহ্লাদিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সপুত্রক বাঙ্কোর বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই (৩৫৮ পৃষ্ঠায়) দিয়াছি। বাঙ্কো দুঃস্বপ্ন হইতে রক্ষার্থ দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করেন; দুষ্কার্য্যে দুর্ম্মতি তাঁহার নাই। স্বপ্নে যে ডাকিনীদিগকে দেখিয়াছেন সে কথা মুক্তকণ্ঠে মাক্‌বেথকে বলিলেন; মাক্‌বেথ জাগ্রতে স্বপ্নে তাহাদের কথা ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। বাঙ্কো ও মাক্‌বেথ সমান তেজস্বী থাকিলেও পাপের অঙ্কুর উদ্গমে মাক্‌বেথ হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন মাকডফ্ ডঙ্কান হত্যার কথা বলিলেন, তখন বাঙ্কো একবার মাত্র বলিলেন—'মাকডফ্ বল, যে তোমার কথা মিথ্যা?' তাহার পর আর কোন কথা কহিলেন না—কেবল যখন লেডি মাক্‌বেথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান, তখন বলিলেন "ধর, ধর, গৃহিণীকে দেখ।"

ঐ কয়স্থলে মাত্র বাঙ্কোর সহিত আমাদের পূর্ব্ব সাক্ষাৎ, তাহার পর এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজ ভবনের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাঙ্কো আপনা আপনি ভাবিতেছেন;—

এখন সকলি হলো; রাজত্ব, সর্দ্দারি
—যা কিছু বলিয়াছিল, প্রেতিনী মাগীরা
সকলি হয়েছে—কিন্তু বিষম দুষ্কার্য্যে;
তবু তারা বলেছিলো তব বংশে রাজ্য
নাহি রবে; মমবংশে কিন্তু হবে স্থায়ী।
প্রেতিনীরা বলে' থাকে যদি সত্য কথা—
খাটিয়াছে ঠিক ঠাক তোমার বেলায়—
আমার বেলায় যদি সেই মত ফলে,
তাহা হলে আমিও ত আশা কর্ত্তে পারি।"

সম অবস্থার দুই জন লোকের মধ্যে চরিত্র বৈষম্য প্রদর্শন জন্যই মাক্‌বেথের পাশাপাশি বাঙ্কোর সৃষ্টি। দৈবী বাণী হৌক, পৈশাচী বাণী হৌক, এক জনের সম্বন্ধে ফলিয়াছে; আমার বংশে রাজা হবে, এমন একটা কথা সেই

দৈবী বাণীতে শুনিয়াছি, এমন স্থলে কে বল, আশা না করিয়া থাকিতে পারে? সুতরাং বাঙ্কোর মনে আশার ছায়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে কেবল আশা মাত্র; তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার স্পর্শ নাই; আবার মাক্‌বেথের রাজ্য লাভে বাঙ্কোর হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয় নাই। ঈর্ষা থাকিলে এই সময়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম।

বাঙ্কো ভাবিতেছেন,—এমন সময়ে রাজা ও রাণী রূপে দলে বলে মাক্‌বেথ দম্পতি প্রবেশ করিলেন। মাক্‌বেথ বাঙ্কোকে. সেই রাত্রির দরবার-ভোজে প্রধান ভোক্তারূপে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাঙ্কো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কথায় কথায় মাকবেথ জানিয়া লইলেন, যে বাঙ্কো তাঁহার পুত্রের সহিত সন্ধ্যার পূর্ব্বে অশ্বারোহণে বেড়াইতে যাইবেন, এবং রাত্রি দুই চারি দণ্ড না হইলে ফিরিবেন না। মাক্‌বেথ সকলকে বিদায় দিয়া, একাকী ভাবিতে লাগিলেন;—ভাবনার প্রথম কথা—

To be thus is nothing;
But to be safely thus.
এরূপ ভাবেতে থাকা—কিছুই ত নয়,
হতে নিষ্কণ্টক যদি পারা নাহি যায়।

এই কয়টি কথার সহিত হাম্‌লেটের প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তির তুলনা করিলে এই দুই নাটকের নায়কদ্বয়ের চরিত্র বৈচিত্র অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

মহাদুঃখী হাম্‌লেট চিন্তায় জর্জ্জরিত, সন্দেহে বিষম আন্দোলিত, হাম্‌লেটের প্রধান ভাবনা—থাকিব কি না থাকিব?

To be or not to be, that is the question.

মহাপাপী মাক্‌বেথের কেবল আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষা—রাজা হইয়াও এ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। তাহার প্রধান কথা—

থাকিতে যদি হয় ত নিষ্কণ্টকে থাকিতে হইবে।

কন্টক কে? বাঙ্কো। মাক্‌বেথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল বাঙ্কোর ভাবনাই ভাবিলেন, শেষে বলিলেন—

করিলাম এত মহাপাপ কেবল কি
বাঙ্কোর বংশের বুক ভরাইতে আমি?
তা হবে না। অদৃষ্ট রে এসো রে সম্মুখে।
অদ্য যুদ্ধে যরাময়া, দেখিব রে তোরে।

এই মাক্‌বেথ প্রথম প্রলোভনে পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "অদৃষ্টে থাকে হবে, আমার চেষ্টার প্রয়োজন কি?" (৩১৬ পৃষ্ঠা) আজ সেই মাকবেথ, দেখ অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত; এ সকলই পাপের লীলাখেলা। অদৃষ্ট বাদ পাপে প্রবৃত্তি দেয়—পাপীকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

মাক্‌বেথ ইহার পূর্ব্বদিন, দুইজন গুপ্ত ঘাতীর সহিত বাঙ্কোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; সেই লোক দুটাকে পূর্ব্বে মাকবেথ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন; ঐ দিন বুঝাইয়া দেন, যে বাঙ্কো হইতেই তাহারা যন্ত্রণা পাইয়াছিল; তিনি (মাক্‌বেথ) সেই সকল যন্ত্রণাদানের দুষ্কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। আজি আবার মাক্‌বেথ সেই কথা সংক্ষেপে তাহাদিগকে বলিলেন, বাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। শেষে বলিলেন, "বাঙ্কো তোমাদেরও শত্রু, আমারও শত্রু, তাহাকে গোপনে আমি লোকান্তরিত করিতে চাই। এই দিনই করা চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্র ফ্লিয়ান্সকেও যমঘরে পাঠাইতে হইবে। কখন, কোথায়, কিরূপে করিতে হইবে, আমি শীঘ্রই বলিয়া দিব।" ঘাতুকেরা, পিতা পুত্রকে হত্যা করিতে স্বীকার করিল, মাক্‌বেথ তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ভবিতে লাগিলেন;—

এ কপাত হলো; বাঙ্কো তোমার কপালে
যদি স্বর্গ থাকে—হবে অদ্য রাত্রি কালে॥

সমালোচনার প্রথমেই বলিয়াছি, মাক্‌বেথের দুরাকাঙ্ক্ষা বলে—যাহা করিতে হইবে, তাহাতে শুভাশুভস্য শীঘ্রং (৩১৩ পৃষ্ঠা)। এই স্থলের সহিত হামলেট নাটকের এক স্থলের তুলনা করিতে হইবে। হাম্‌লেট আপনার পিতৃহন্তা পিতৃব্যকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন, গিয়া দেখেন, পিতৃব্য উপাসনা করিতেছেন। ভাবিলেন, ইহাকে এখন হত্যা করিলে, ইহার সদ্গতি হইবে,—না, একাজ এখন করা হইবে না। ইহাতেই বলিয়াছিলাম চিন্তাপীড়িত হামলেট নিরন্তরই ভাবেন—শুভাশুভস্য কালহরণং। (৩১৩ পৃষ্ঠা) মাক্‌বেথের কথা—

স্বর্গে যায় যাক—কিন্তু অদ্য রাত্রি কালে।

আবার আর একটি মাহপাপের সংকল্পে এই প্রথম দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইল।

আর্য্যজাতির কর্ম্মকাণ্ড।

(১৮০ পৃষ্ঠার পরে)

১৬। মনুষ্য মৃত্যুর পরে প্রথমত প্রেত লোকে গমন করে, প্রেত ক্রিয়া (দাহ অবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত) যথা বিধি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ পিতৃপদ বাচ্য হয়। এবং তৎপর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গে (২০) ও কেহ বা নরকে (২১) গমন করে। (২২) অনন্তর স্বর্গ নরক ভোগাবসানে, জীব, পুণ্য পাপ কর্ম্মের অনুবন্ধ বশত পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য বা তির্য্যক্ যোনি প্রভৃতিতে (২৩) জন্ম গ্রহণ করে। (২৪)

মনুষ্য জন্মধারণ করিলেও, পুণ্য পাপফলে সুখী বা দুঃখী এবং সুস্থ বা রোগী হইয়া থাকে।

জীব যাবৎ না মুক্ত হয়, এই রূপ স্বস্ব কর্ম্মের ফলভোগ, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে।

১৭। মায়াচ্ছন্ন জীবাত্মার সহজেই সদ্গতি ও মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। কিন্তু কোন না কোন সময়ে তাহার যে শেষ লক্ষ্য প্রাপ্তি হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যেরূপ উত্তাল তরঙ্গায়িত নদীগর্ভে ক্ষেপণী সঞ্চালন পূর্ব্বক বায়ু ও প্রবাহ বেগে কখন হটিয়া, কখন বা অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে

---

(২০) স্বর্গশব্দে কাহারও মতে ভিন্ন ভিন্ন সুখ ভোগের স্থান—যথা পিতৃ-লোক (চন্দ্রলোক), দেবলোক (ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণাদি লোক) ইত্যাদি। কেহ কেহ বিশেষ সুখ ভোগকেই স্বর্গ বলেন।

(২১) তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি দুঃখ ভোগের স্থান গুলিকে নরক কহে।

(২২) 'ততো হসৌ নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মনা।'

শুদ্ধিতত্ত্ব।

(২৩) পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি।

(২৪) তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ লোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

ভগবদ্গীতা।

অথ নরকানুভূত দুঃখানাং তির্য্যক্ত্ব মুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি।

শুদ্ধি তত্ত্ব ধৃত বিষ্ণু সূত্র।

তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়,—যেরূপ উচ্চ প্রাসাদে বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ কালে, অত্যল্প অসাবধানতা হইলেই পতিত ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই ক্রমে উত্থিত হওয়া যায়, এবং যেরূপ বণিক্ স্বকীয় ব্যবসায় প্রসঙ্গে চেষ্টাবান্ হইয়া কখন লাভ ও কখন বা হানি স্বীকার করত অবশেষে সফল মনোরথ হয়—তদ্রূপ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উত্তমাধম ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে।

১৮। কর্ম্মকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। যিনি কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি শীঘ্র হয়। যিনি অধিকাংশ সাত্ত্বিক, অল্পাংশ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এবং যিনি অধিকাংশ রাজসিক তামসিক ও অল্পাংশ সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি আরো বিলম্ব হইয়া থাকে। ফলত যে যেরূপ কর্ম্মই করুক না কেন, কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাত্ত্বিক বদ নিষ্কাম কর্ম্মে রুচি হইয়া তদনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, জ্ঞানযোগে (২৫) অধিকার হইয়া চরমে মুক্তি (২৬) লাভ হইয়া থাকে। মহাপাপিষ্ঠ হইলেও, জীব বহু কোটি যুগান্তরে একদিন, না একদিন অবশ্যই মুক্ত হইবে। হিন্দু ধর্ম্মের এই একটি বিশেষ উদারতা ও মহত্ত্ব।

এই প্রকারে এক কালে সমুদয় জীব মুক্ত হইলে, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় (২৭) বলে।

---

(২৫) জ্ঞানযোগ—তত্ত্বজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্যের মতে অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান। নৈয়ায়িক মতে জীবাত্মাকে তদিতর দেহাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে জানা। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ জ্ঞান।

(২৬) মুক্তি দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি ও পরম মুক্তি। যে দেহাবচ্ছেদে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া অজ্ঞান নষ্ট হয়, যাবৎ সেই দেহ থাকে, তাবৎ 'জীবন্মুক্তি' এবং ঐ দেহপাতের পরেই 'পরম মুক্তি' বা 'বিদেহ কৈবল্য' অথবা 'নির্ব্বাণ'।

(২৭) প্রলয়—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই কয়েক প্রকার। প্রাত্যহিক নাশ হওয়াকে নিত্য প্রলয় কহে। ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনাবসানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়।—এক এক ব্রহ্মার

১৯। দেবতা মনুষ্য এবং পিতৃলোকোদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেবকৃত্য, মনুষ্য কৃত্য, এবং পিতৃকৃত্য বলিয়া কথিত। সাধারণত দেবকৃত্যের কাল পূর্ব্বাহ্ণ (ত্রিধা বিভক্ত দিনের প্রথম ভাগ), মনুষ্যকৃত্যের কাল মধ্যাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দ্বিতীয় ভাগ), ও পিতৃকৃত্যের কাল অপরাহ্ণ (ত্রিধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগ)।

দেবকৃত্য—পূজা, জপ, স্তুতিপাঠ, হোম, যজ্ঞ, দান, স্নান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কার্ত্তিক মাসের আকাশ প্রদীপ, দীপান্বিতায় দীপ দান, দ্বাদশ যাত্রা, উপনয়নাদি সংস্কার ইত্যাদি।

মনুষ্য কৃত্য—মনুষ্য যজ্ঞ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃপূজা, কার্ত্তিকের শুক্ল প্রতিপদে বলিরাজ পূজা, অশোকাষ্টমীতে অশোক কলিকা পান, সায়ং প্রাতর্ভোজন, রাজোপসর্পণ, কৃষ্যাদি বৃত্তি ইত্যাদি।

পিতৃকৃত্য—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিতৃবলি, উল্কাদান, বৃষোৎসর্গ, দাহ, পূরক পিণ্ডদান, গঙ্গায় অস্থি প্রক্ষেপ—ইত্যাদি।

২০। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার। যদিও বেদান্ত মতে নিত্য, নৈমিত্ত্য, কাম্য, প্রায়শ্চিত্ত ও নিষিদ্ধ এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম উক্ত আছে (২৮), কিন্তু সচরাচর কর্ম্মের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিভাগই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

২১। নিত্য কর্ম্ম দুই প্রকার। ১—যাহা প্রত্যহ করিতে হয়। ২—যাহার অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) জন্মে।

১ম শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম—প্রাতঃকৃত্য, মূত্র পুরীষোৎসর্গ, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসন, দেবপূজা, ব্রহ্ম যজ্ঞ, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, দান, ভিক্ষাদান, ভোজন,

---

পরমায়ু শেষ হইলে, সমুদয় পদার্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ আদিকারণে লীন হইয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। অপর ব্রহ্মা জন্মিয়া ঐ সকলের পুনঃ সৃষ্টি করেন।—আত্যন্তিক প্রলয় সর্ব্ব জীবের মুক্তি।

(২৮) তচ্চ পঞ্চবিধং। নিত্য নৈমিত্ত্য কাম্য প্রায়শ্চিত্ত নিষিদ্ধ ভেদাৎ। তত্র আদ্যানি চত্বারি ধর্ম্ম্যাণি। অন্ত্যং অধর্ম্ম্যং।

ইতি বেদান্ত মতং।

ভোজনোত্তর আচমন, সায়ং প্রাতর্হোম, ইতিহাস পুরাণ শ্রবণ, লোকযাত্রা ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম—অনুরহঃ স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, নিত্য পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দান, ভিক্ষা দান, সায়ং প্রাতর্হোম, শৌচ, আচমন, ভোজনোত্তর আচমন; ষষ্ঠী অষ্টমী অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশী তিথিতে স্নান, সংক্রান্তি স্নান, গ্রহণ স্নান, পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান; আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমার দান; একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, রামনবমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত; দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কামদেব পূজা, বাসন্তী পূজা, শ্রাবণী কর্ম্ম, আগ্রহায়ণী কর্ম্ম, গৃহাদিতে বাস্তুযাগ; প্রতি মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শ্রাদ্ধ, অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ, মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, কন্যার্ক শ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, নবোদক শ্রাদ্ধ, যবশ্রাদ্ধ, পূপাষ্টকা, শাকাষ্টকা ও মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ, অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, পুত্র জন্ম নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, সংস্কার কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, প্রত্যাব্দিক শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী ও মাঘী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ, জন্ম নক্ষত্র নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, প্রেত শ্রাদ্ধ; ভীষ্মতর্পণ, দশ সংস্কার, ভ্রাতৃপূজা ইত্যাদি।

২২। নৈমিত্তিক কর্ম্ম (২৯) দুই প্রকার। ১—যে কর্ম্মে দিন, মাস বা বৎসর বিশেষের নিয়ম নাই, যাহা আগন্তুক নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হয় এবং যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ২—যাহা কোন নিমিত্ত জন্য করিতে হয়।

১ম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ; সপিণ্ড মরণাদি নিমিত্তক স্নান, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থ ও পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ, কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, অস্পৃশ্য স্পর্শন জন্য স্নান ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—প্রথম শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও প্রথম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভিন্ন, সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় কাম্য কর্ম্ম।

---

(২৯) নৈমিত্তিক কর্ম্ম হয় নিত্য, না হয় কাম্য হইবে। নিত্যত্ব এবং কাম্যত্ব বিনির্ম্মুক্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম পাওয়া যায় না।

২৩। কাম্য কর্ম্ম—যাহা ফলজনক বা যাহা ফলকামাধিকারীর কর্ত্তব্য। কাম্য ও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১—যাহা শুদ্ধ ফলার্থ বিহিত ও যাহা কোন নিমিত্তানুসারে বিহিত নহে। ২—যাহা ফলার্থ অথচ নিমিত্তানুসারে বিহিত।

১ম শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম—গঙ্গাদি তীর্থ স্নান, তীর্থতর্পণ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন, শিবাদি দেব পূজা, কাম্য বলি ও হোম; তুলসী, বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি প্রদান, অনিমিত্ত বিহিত সকল প্রকার দান, গৃহাদিতে বাস্তযাগ, ঔপচারিক ও গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম—বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের প্রাতঃস্নান, মাকরী স্নান, মৌনী স্নান, ভূত চতুর্দ্দশী স্নান, নারায়ণী স্নান, অক্ষয়া তৃতীয়ায় স্নান, মহা জৈষ্ঠীর গঙ্গাস্নান, মাঘ মাসের গঙ্গাস্নান, জন্ম নক্ষত্র ব্যতীপাত পুষ্যা নক্ষত্র ও বৈধৃতি নক্ষত্রের গঙ্গাস্নান, দশহারা স্নান, সংক্রান্তি স্নান, যুগাদ্যা ও মন্বন্তরা স্নান, ও দান, অষ্টমী স্নান, বারুণী স্নান, চৈত্র মাসে লৌহিত্য স্নান, বুধাষ্টমীতে স্রোতোজলে স্নান, আমাবস্যাতে নদী স্নান, পৌর্ণমাসীর স্নান; অমাবস্যা, দশহারা ও বৈশাখ পৌর্ণমাসীর তর্পণ, ভূতচতুর্দ্দশী ও রটন্তী চতুর্দ্দশীর যমতর্পণ; অক্ষয় তৃতীয়ার বিষ্ণু পূজা, নাগ পঞ্চমী ও কর্কট সিংহ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা, দুর্গোৎসব, কোজাগর কৃত্য, জগদ্ধাত্রী পূজা, গোষ্ঠাষ্টমীতে গোপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তু পূজা, বরদা চতুর্থীতে গৌরীপূজা, শ্রীপঞ্চমী পূজা, বাসন্তী পূজা, রটন্তী পূজা, ফলহারী পূজা; অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, অমাবস্যা ব্রত, ধর্ম্মঘট ব্রত, ললিতাসপ্তমী ব্রত, দুর্গাষ্টমী ব্রত, দুর্গানবমী ব্রত, দধিসংক্রান্তি ব্রত, কার্ত্তিকেয় ব্রত, সর্ব্বজয়া ব্রত, বরদাচতুর্থী ব্রত, শ্রীপঞ্চমী ব্রত, অশূন্যশয়না ব্রত, কোকিল ব্রত, সাবিত্রী ব্রত; বারোপবাস, তিথ্যুপবাস, নক্ষত্রোপবাস, মহাষ্টমীর উপবাস, জন্মাষ্টমীর উপবাস, রামনবমীর উপবাস, শিবরাত্রির উপবাস, একাদশীর উপবাস, শ্রাবণদ্বাদশীর উপবাস, অঘোর চতুর্দ্দশীর উপবাস, সংক্রান্ত্যুপবাস; বার শ্রাদ্ধ, তিথি শ্রাদ্ধ, নক্ষত্র শ্রাদ্ধ, যুগাদ্যা শ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ, পুষ্কর শ্রাদ্ধ, দেব শ্রাদ্ধ, ঋষি শ্রাদ্ধ, মনুজ শ্রাদ্ধ, মৃত ব্যক্তির প্রধান সংস্কার না হইয়া থাকিলে তাহার প্রেতশ্রাদ্ধ; পূর্ত্তকার্য্য, কার্ত্তিক্যাদিতে বৃষোৎসর্গ, দেবব্রত বৃষোৎসর্গ; সংক্রান্তি, যুগাদ্যা, অক্ষয়া ও পর্ব্বাদি নিমিত্তক দান ইত্যাদি।

২৪। মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত কর্ম্ম সকলকে, পুনশ্চ নিত্যনৈমিত্তিক, নৈমিত্তিক কাম্য, এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

নিত্যনৈমিত্তিক—দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

নৈমিত্তিক কাম্য—সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্যকর্ম্ম।

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য—দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে যে যে কর্ম্ম, কাম্য শ্রেণীর মধ্যেও পড়িয়াছে।

ভারতে ইংরাজ।

মহাভারতের কাব্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ভাগ গ্রহণ করিলে এবং রাজনীতিজ্ঞতার আদর্শ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সমালোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের নৈসর্গিক অবস্থানুসারে সমগ্র সসাগর ভারতবর্ষ একাধিপতির শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থাকিলে, ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি, উন্নতি এবং মঙ্গল কদাপি বিরাজ করিতে পারে না। ভারত, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, খণ্ডাধিপতিগণ যখন রাজ্যবিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত, সমরানল যখন সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীগণ যখন কেবল মাত্র বিদ্বেষবশীভূত, ফলত যখন ভারতে একতা, শান্তি ও কুশলের নিরতিশয় অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার মোচন অর্থাৎ ভারতে শান্তি সংস্থাপন করণার্থ স্বীয় অলৌকিক রাজনীতিজ্ঞতা শক্তি প্রভাবে সমগ্র ভারতের রাজবর্গকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের পরিণাম-ফলে ভারত একেশ্বর পাণ্ডবের কর-কবলিত হইয়া উন্নতির শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, এবং সুখ, সৌভাগ্য ও শান্তি বহুকালের জন্য ভারতে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটনের অনতিপূর্ব্বে ভারতের যেরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, ইংরাজের ভারত গ্রহণ কালেও ভারতের ঠিক্ সেই দুর্দ্দশা।

ভারতের যে বিপদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশাল রাজনীতিজ্ঞতার, অনন্ত কাল ব্যাপি দূরদর্শিতার এবং অলৌকিক ক্ষমতার নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষ পরিচয় জগতের যাবতীয় লোক-চক্ষে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংরাজ ঠিক সেইরূপে দ্বিতীয়বার ভারতের ভার মোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইতিহাস প্রকাশ করিতেছে যে, ইংরাজ আগমনের অনতি-পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আবার খণ্ড-রাজ্যে বিভাগ, ক্ষুদ্রাধিপতিগণের মধ্যে রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ একান্ত বলবান, সমরানল প্রজ্বলিত, অকারণ মনুষ্য-ধ্বংস, লোকমধ্যে অনৈক্য, শান্তির অভাব, এবং উন্নতি নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। এবার ভারতের ভারমোচন ইংরাজ সংসাধন করিলেন। ইংরাজ আবার সসাগর ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া শান্তি, উন্নতি ও মঙ্গলের বীজ রোপণ করিলেন। ভারত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতি বিশারদের মহৎ চরিত্র অবলম্বনে ভারতকে একাধিপতির কর-কমলে সমর্পণ করিয়া, ভারতের যে পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, ভাগ্যফলে দেশকালপাত্র বিবেচনায় দ্বিতীয় বার ভারতাদৃষ্টে অবিকল সেই মঙ্গলের নিয়ন্তা—ইংরাজ।

রাজকুল-তিলক মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যৎ বাক্য সফল হইয়াছে; ভারতবর্ষের মানচিত্রের সমস্তই লাল হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষমতাহীন নির্জীব ব্রহ্মরাজ্য অন্য রং মাখিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল, আজ লালেলাল হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র সিকিমের জন্য লাল রং প্রস্তুত হইতেছে। সমস্ত রাজবর্গের অভিষেকে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত-সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞে সম্রাট-প্রতিনিধি বলিয়া রাজা ও লোক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব কে না বলিবে যে ইংরাজই এখন ভারতের একাধিপতি? একাধিপতির ভারত এখন শান্তিময়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিমালয়ের চরণ প্রান্ত হইতে সমুদ্র তরঙ্গ বিঘাতিত কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে চীনের সীমা হইতে অনন্ত পশ্চিমে পেশোয়ারের সীমা পর্য্যন্ত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে একটী আভ্যন্তরীণ বিবাদের কোন সূত্রপাত নাই এবং কোন বিপৎপাতের সম্ভবনা নাই। সাগরবক্ষে

ভারতানুগত দ্বীপ মালাও নির্বিরোধে ভাসিতেছে। সুতরাং শান্তি অবিচলিত ভাবে সসাগর ভারতে বিরাজিত ইহা কে না বলিবে? উত্তরে হিমালয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন; অবশিষ্ট তিন সীমায় সীমাশূন্য মহাসাগর, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; এতাদৃশ চতুঃসীমা বিশিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মানুকূলে নিরাপদ দেশ অন্যের অভেদ্য। বহিঃশত্রুর দ্বারা এ অভেদ্য দুর্গ ভেদ হওয়া অসাধ্য এবং অসম্ভব। সত্য বটে ভারতের উত্তর পশ্চিমের প্রান্তসীমার বহির্ভাগে হিমালয়ের পরপারে সম্প্রতি একখানি কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল; সেই মেঘ ক্রমে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাতে ভারতকে জলপ্লাবনে ভাসমান করিবে, এরূপ আশঙ্কা ভারতবাসীর হৃদয়ে একদিন উদিত হইয়াছিল;—কিন্তু ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত শান্তিময়, ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রবল বায়ুর সবেগ সঞ্চালনে অত্যল্প কাল মধ্যে সে মেঘখণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, রুষরাজ রণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের সিংহদ্বার হীরাটের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীর একটি প্রকৃত পরম উপকার সাধন করিয়াছেন; অর্থাৎ ভাবতবাসীকে রাজভক্তির পরিচয় প্রদর্শনের একটি সুচারু অবসর প্রদান করিয়াছেন। ঐশ্বরিক নিয়ম প্রভাবে সর্ব্বনাশের এক-শেষেও মঙ্গলের নিগূঢ় বীজ নিহিত থাকে। একচ্ছত্র সম্রাটাধীন হওয়া ব্যতীত ভারতের চরম সুখ, অন্য কিছুতেই নাই, চিন্তাশীল ভারতবাসী ভূয়োদর্শন দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; একাধিপতির অধীনতা ব্যতীত ভারতীয় লোকরাশির একতা কদাপি সম্পাদিত হইতে পারে না—এ কথাও তাঁহারা বেশ্ বুঝিয়াছেন; এবং একতা ভিন্ন দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় না, ও শান্তি না থাকিলে উন্নতি লাভ হয় না, কার্য্যকারণ সূত্রে ইহাও তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। সেই জন্যই আশ্রিত রাজবর্গ সম্রাটের বিপদে স্বদেশের এবং আপনার বিপদ বুঝিয়া ধন ও প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; এবং অন্যান্য যাবতীয় লোক-কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই একবাক্যে স্বদেশের অনুকূলে রাজার স্বপক্ষে তরবারি ধারণ করিতে এবং যথাসর্ব্বস্ব প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। দুর্ব্বল বঙ্গবাসী বলেন্‌টিয়ার সাজিয়া বন্দুকের ভারবহন করিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবেদন করিয়াছেন; বঙ্গরমণীকুল, যাঁহারা এ জগতে অলঙ্কারকেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভাবিয়া থাকেন, রাজার এই অভূত-পূর্ব্ব ব্যবহারের যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্যের জন্য অম্লান

বদনে শ্রীঅঙ্গকে নিরলঙ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ সাত শত বর্ষ ভারতবাসীগণ একাদিক্রমে রক্তপাত ও সর্ব্বনাশের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইদানীং ইংরাজাধীনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া কি বলিয়া আজ রাজ পদে এ ভক্তি কুসুমাঞ্জলি অর্পণ না করিবেন, ভারতের হিন্দুগণ কোন কালেই অকৃতজ্ঞ নহে।

হইতে পারে আশ্রিত রাজা মহারাজ বর্গের মধ্যে কেহ কোন কারণে মর্ম্ম-পীড়িত, কাহারও হৃদয়ানল অযথা শাসনে প্রজ্বলিত, কেহ বা সৈন্যের আরোপিত ব্যয়ভারে জর্জ্জরিত, কেহ বা বংশমর্য্যাদার আসনের বিচারে অপমানিত, এবং কেহ বা আরও অধিক সংখ্যক তোপের জন্য লালায়িত। হইতে পারে শিক্ষিত বাবুগণ আরও অধিক চাকরি চাহেন, জাতিভেদে একই পদের বেতনের তারতম্যে জজবাবুর হৃদয় হয় ত দগ্ধ হইতেছে; হইতে পারে চা-করের দৌরাত্মে স্ত্রীহীনের হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে, জটিল আইনের কুতর্কে হয় ত কেহ সর্ব্বস্বান্ত এবং হয় ত কেহ প্রভুর পীড়নে উপবাসী। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের এ সকল দুঃখ কাহিনীর আন্দোলন কি জাতীয় রাজবিদ্রোহিতার চিহ্ন, না, রাজার অনুগ্রহ পূর্ণ প্রজা-বাৎসল্য জনিত স্বত্বভোগের ইচ্ছা মাত্র? যে রাজা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্বত্ব দিয়াছেন, সে রাজা কি লোকের দুঃখ বা অভাবের আন্দোলনে রাজভক্তির ত্রুটি বিবেচনা করিতে পারেন? প্রতাপশালী ইংরাজরাজের সাম্রাজ্য এত বিশাল যে, ইহাতে সূর্য্যদেবের অস্তগমনের অবকাশাভাব। সেই সম্রাজ্যের ভারত একটী প্রশস্ত খণ্ড। সেই ভারতের বিংশ কোটি লোকের নিয়ন্তা কতিপয় বিদেশীয় রাজ কর্ম্মচারী। অতএব লোকের দুঃখ অভাব যে কতক পরিমাণে থাকিবে এটী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই দুঃখের কাহিনী এত অল্প। ভারত একজাতীয় লোকরাশির নিবাস ভূমি নহে, ন্যূনাধিক এক শত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতে বাস করিতেছে; তাহাদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, এবং সকল জাতিই সমস্ত বিষয়েই রাজার সহিত নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন। জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্নতায় একশ্রেণীর মনুষ্যকুল অন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়; এতাদৃশ শতাধিক বিভিন্ন জাতি ভিন্ন জাতীয় রাজার সহিত যে

সম্যক প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন দেশের কোন রাজনীতি বিশারদ মহান ব্যক্তি মুক্ত কণ্ঠে না স্বীকার করিবেন যে, এতাদৃশ ভারতকে ইংরাজ আয়ত্ত করিয়া রাজনীতিজ্ঞতার এবং বিশাল বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় জগতে প্রদান করিতেছেন। ইংরাজ, ইদানীন্তন সমস্ত সভ্য জাতির অনুমোদিত ব্যবস্থানুকরণে বিজেতার সমস্ত জাতীয় স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়া, দেশ প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বধীনতা প্রদান করিয়া, এবং অবশেষে স্বত্বদানের চরমসীমা স্বরূপ "আত্মশাসন" ভার সমর্পণ করিয়া, অভূতপূর্ব্ব মাঙ্গলিক প্রথায় যে, রাজ্যশাসন করিতেছেন, তদ্দ্বারা রাজনীতিজ্ঞতার অভাবনীয় এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পরিচয় দানে জগতকে চমকিত করিয়াছেন। ভারতের এই শান্তিময়ী মোহিনী মূর্ত্তি ইংরাজের বিশাল রাজনীতি-বিনির্ম্মিত। এ রাজার প্রতি যদি ভারতীয়গণ রাজভক্তি প্রদর্শন না করিবে, তবে কোন রাজার প্রতি করিবে?

তবে ভারত করভারাক্রান্ত এ কথা অবশ্য বলিব। সে গুরুভারে ভারতের বিংশতি কোটি লোকের মস্তক সমভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; আর সহ্য হয় না। এইটি যথার্থই ভারতের জাতীয় দুঃখ কাহিনী। করবৃদ্ধির অন্যতম ফল অসন্তোষ বৃদ্ধি। ভারতের প্রজা কেবল কর-জ্বালায় রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট। সত্য বটে প্রজার প্রদত্ত করে রাজ্যে প্রতিনিয়ত প্রজারই সুখ সচ্ছন্দতার উপায় সৃষ্টি হইতেছে, প্রজার দ্বারে দ্বারে অনবরত অযাচিত ঐশ্বর্য্য রাশি বিতরিত হইতেছে, কিন্তু ভারতের নিরন্ন প্রজা-কুল সে সুখৈশ্বর্য্যের রসাস্বাদনে সম্যক্ সন্তোষ লাভে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে হিন্দু ও মুসলমানাধিকারে ভারতের আভ্যন্তরীণ সুখসচ্ছন্দতার এত সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু ভারত করজালেও এত জর্জরিত ছিল না। কার্য্যকা-কারণ সূত্রে তুলনা করিলে এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ রূপ ধনে এ সুখের সামঞ্জস্য কদাপি হয় না। কর-পীড়িত ভারত সুখের প্রলোভনে ভীত হইয়াছে, ঋণদগ্ধ ভারত ঋণে ঐশ্বর্য্য লাভে শঙ্কিত হইয়াছে, নয়নাশ্রুপাতে অমৃতপানে ভারত একান্ত কাতর হইয়াছে।

ব্যয়-সংকুলনার্থই আয়ের সংস্থান। বহুল ব্যয়ে বহুল ধনাগমের আবশ্যক। প্রবাদ এই যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশাপেক্ষা ইংরাজের রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যয় অধিক। ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন অশ্রুতপূর্ব্ব উচ্চ। বিংশতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনের কর্ম্মচারীর পদ ধরামণ্ডলের কোন

দেশে কোন কালে কখনই সৃষ্ট হয় নাই। পুরাকালে ইংলণ্ডে প্রবাদ ছিল যে, ভারতের বৃক্ষরাজিতে সুবর্ণের মোহর ফলে। সেই সংস্কারপূর্ণ হৃদয়-বিশিষ্ট আয়-ব্যয়-নীতিজ্ঞদিগের দ্বারাই ভারতের ব্যয়-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত তাহাই অবিচলিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজের কমিশেরিয়টের কেরানি গোমস্তা, পবলিক ওর্য়াকের ঠিকাদার প্রভৃতিরা এত শীঘ্র অশ্রুতপূর্ব্ব ধনবান্ হইয়া উঠেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে তদ্রূপ হয় না। ব্যয় সম্বন্ধে এই যথেচ্ছাচারিতা এবং বিশৃঙ্খলতার জন্যই ভারতের শিরে করভার প্রতিনিয়তই সমর্পিত হইতেছে। কিন্তু ভারত আর তৃণগাছটীও বহন করিতে পারে না। অতএব ইহাই স্থির বুঝিতে হইবে যে, ভারতে আয়ের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, এখন ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যতীত ভারতের আর উপায় নাই। তদন্যথায় ভারত ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আর একটী অতীব শোচনীয় অবস্থা ভারতের ভাগ্যদোষে সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে। ইংরাজ যে শোচনীয় অবস্থায় ভারতকে, একাধিপতির পবিত্র প্রশস্ত করতল বিস্তার করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আজ কি কারণে বলিতে পারা যায় না সেই ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া ভারতকে সেই শোচনীয় অবস্থায় আবার নিক্ষেপ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। সত্য বটে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ প্রকারে ইংরাজের ভারত গ্রহণ কালের ন্যায় নহে, তথাপি তৎকালে ভারতে যেরূপ শান্তির অভাব হইয়াছিল, আজ অন্য কারণে সেই বিমল শান্তির অভাব হইতেছে। শান্তির অভাবই রাজ্যের অমঙ্গলের চিহ্ন, সেই চিহ্ন আজ আমাদের অদৃষ্টদোষে ভারতের ললাটদেশে অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহে সে শান্তির অভাব হয় নাই, রাজভক্তির অন্যথাচরণে সে শান্তির অভাব হয় নাই, শাসন-বিশৃঙ্খলার সে শান্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু অন্য অভাবনীয়, অতীব নিষ্ঠুর কারণে, সেই পবিত্র মাঙ্গলিক শান্তির নিরতিশয় অভাব হইতেছে। এবং ভ্রমশূন্য মীমাংসায় ইহা সন্তোষজনক রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইংরাজের স্বাধীন ইচ্ছাই, সেই শান্তি-বিধ্বংসী কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তি স্বরূপ।

প্রথম, " ইল্‌বর্ট বিল। " ইলবর্ট বিল সর্ব্বাগ্রে যেরূপ পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থাপক সভায় সমর্পিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে সেই আকারে বিধিবদ্ধ হইলে, ভারত এই মাত্রস্বত্ব লাভ করিত যে, চারিজন মাত্র ভারতীয়

ব্যক্তি ইংরাজ-অপরাধীর প্রতি বিচার বিধান করিতেন। কিন্তু ইংরাজ অপরাধীর প্রতি কি রূপে, কোথায়, এবং কাহার দ্বারা বিচার বিতরিত হয় তাহা ভারতের বিংশ কোটি লোকের মধ্যে কজন জানিতে ইচ্ছা করেন? যে কেহই বিচার করুন, তাহাতে এই বিংশ কোটী লোকের ক জনের কি আসে যায়? এই সাগরসম বিস্তৃত ভারত রাজ্যের বিংশকোটি লোকের মধ্যে চারিজন মাত্র ব্যক্তি এক একটী সুদূর নিভৃত অজানিত সামান্য স্থানের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে ইংলণ্ডের এক একটি পথ পরিষ্কারকের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে, ভারতের কি মহান্ স্বত্ব সংস্থাপিত হইত এবং কি অলৌকিক গৌরব গগণস্পর্শ করিত, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে বিল সে ভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই। অথচ ঐ বিল সম্বন্ধে আন্দোলনের ফলশ্রুতি ভারতের শান্তি নাশের একটী কারণ স্বরূপ। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের কেশ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরতিশয় সাবধানের সহিত একাদি ক্রমে সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিয়া আসিতেছি যে, দেশীয় কৃতবিদ্য জনগণ পঠদ্দশা অতিক্রম পূর্ব্বক সংসারে পদনিক্ষেপ করিয়া চাকরি, ব্যবসায় অথবা যে কোন সূত্রে হোক, সমস্ত জীবন কাল এইমাত্র ব্রত অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, যে ইংরাজের সহিত ভারতীয় জনগণের সৌহৃদ্দ্য সংস্থাপিত হয়। কারণ তাঁহারা ভুয়োদর্শন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়াছিলেন যে এই দুই জাতির সৌহৃদ্দ্য, সমানুভূতি এবং সম্মিলনেই ভারতের যাবতীয় মঙ্গলের এবং উন্নতির বীজ নিহিত আছে। সম্পূর্ণ শতবৎসর কালব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমের পর, সংকল্প সাধনের প্রকৃত সন্ধিসময়ে, এই সর্ব্বনাশক আইনের প্রস্তাবের উত্থাপন এবং সেই মহৎ জাতীয় ব্রতের ধ্বংস হইল। সম্মিলন সম্বন্ধে আবার দুই জাতি শতবর্ষ পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইল এখন এই দুই জাতির মধ্যে শান্তির নিরতিশয় অভাব হইয়াছে।

দ্বিতীয়, "আত্ম-শাসন প্রণালী।" নির্ব্বাচন প্রণালীই আত্মশাসন প্রণালীর অস্থি স্বরূপ। ছাপার কাগজওয়ালারা যতই ঢাক্ পিটুন, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা যতই রং দিয়া রিপোর্ট লিখুন, নির্ব্বাচন প্রথার নিগূঢ় অভ্যন্তরে ব্যবস্থাপকদের যে সুচিক্কণ চাতুর্য্যের দৃঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা মফস্বলে যোগ্য ব্যক্তির মনোনীত হওয়া অসম্ভব। এ দিকে নির্ব্বাচন প্রথার কল্যাণে ভারতের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বতনকালের বিস্মৃতপ্রায়

সামাজিক অনিষ্টরাশির শীর্ষস্থান স্থিত "দলাদলি" প্রথাটীর পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই নির্ব্বাচন প্রথার আঘাতে কোন না কোন প্রকারে আন্দোলিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পদপ্রার্থীগণের যোগ্যতা সমালোচনা সূত্রে অতি-নিকট-কুটম্বগণের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটিয়াছে, সহোদর সহোদরে অনৈক্য হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে। নিমন্ত্রণ বন্ধ ও 'বামুণ' নাপিত বারণ প্রভৃতি অসভ্য কালের দলাদলির ভীষণ অনুচর সকল অবার তীব্র তেজে দেখা দিয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পল্লিগ্রাম সমূহে যে অবস্থা ছিল, আজ আবার সেই অবস্থা। এ সম্বন্ধে আবার আমরা শতবৎসর পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইলাম। আমাদের ঘরে ঘরে আবার শান্তির অভাব হইল।

তৃতীয়, "টেনান্সি বিল।" ভারতবর্ষ রাজভক্তির আদর্শ স্থল। ভারতীয় জনগণ রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে রূপ পবিত্র ভাবে বুঝিতে পারেন, অন্য কোন দেশের লোকে সে রূপ বুঝিতে পারেন না। ভারতে, রাজাপ্রজায় যে স্নেহ ভালবাসা, যে ভক্তিবাৎসল্য, যে নৈকট্যব্যবহার, এবং যে সমবেদিত্ব, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশের রাজাপ্রজার মধ্যে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে, প্রজা রাজাকে দেবতা স্বরূপ দেখেন, রাজাও প্রজাকে পুত্রবৎ নিরীক্ষণ করেন, রাজার প্রতি প্রজার অভক্তি হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; প্রজা পীড়নে রাজার নরকগমন অনিবার্য্য। একটী দীর্ঘায়তন বিস্তৃত রাজ্যের অসংখ্য প্রজার রাজাও যে বস্তু, একটি সামান্য ভূমিখণ্ডের অধিপতি তাঁহার জনৈক মাত্র প্রজার নয়নেও সেই বস্তু। বড়ই হৌন্ আর ছোটই হৌন্, প্রজার নয়নে ভূম্যধিকারী একই পদার্থ। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞেরা রাজাপ্রজার সম্বন্ধে সে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব দেখিতে ভাল বাসেন না। এটী তাঁহাদের চক্ষের শূল। সেই জন্যই কথিত আইনের অবতারণা। এতদ্দ্বারা ভারতের রাজাপ্রজার অবিচলিত সম্বন্ধ বিঘাতিত হইয়াছে। রাজাপ্রজার মধ্যে শান্তির অভাব হইয়াছে।

চতুর্থ, জাতি-বিদ্বেষ-উত্তেজনা। ভারত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদিগের নিবাস ভূমি। ইতিহাস ব্যক্ত করে যে, ধর্ম্ম অন্তত ভাষা এক না হইলে একজাতিত্ব, জাতীয়জীবন, এবং জাতীয়-একতা কখনই গঠিত হয় না। ইংরাজের অনুকূলতায় ইংরাজি শিখিয়া একভাষী হইয়া ভারতে একজাতিত্ব সম্পাদিত হইতেছিল। ইংরাজিশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষী

ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থানস্থিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে একতা সংস্থাপনে তাঁহারাই অভি-নেতা। ইংরাজের কৃপায় মহতী জাতীয় একতার পরিপোষণ হওয়াতে যখন অতীব প্রার্থিত মাঙ্গলিক সময়ের আবির্ভাব হইল, ভগবান্ বলিতে পারেন কেন, সেই ইংরাজ আবার তাহা যুগান্তরে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প। প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ খড়্গহস্তে একান্ত মনে সেই সন্ধি সময়কে সজোরে ছিন্নভিন্ন করিতে লালায়িত। সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্পষ্টাক্ষরে মুসলমানকে হিন্দুর সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন, হিন্দুর প্রতি হিংসা দ্বেষ ও জাতীয় বৈরীতার অনিষ্টকর বিষের বীজ মুসলমান-হৃদয়ে সযত্নে রোপণ করিতেছেন। আবার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানার্থ মুসলমানকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চপদ প্রদান করত, অযথা দয়ার হস্তে তাঁহার গাত্রসেবা করিতেছেন। ওদিকে সর্‌লিপেল গ্রেকিণ্ মহারাষ্ট্রীকে বাঙ্গালির প্রতি ঘৃণা করিতে শিখাইতেছেন। প্রদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্ব স্ব প্রদেশে বাঙ্গালির প্রবেশনিষেধের অনুজ্ঞা পর্য্যন্ত প্রচার করিতেছেন। অতএব একতা, একজাতিত্ব এবং জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় সময়েই তাহার ধ্বংস নিষ্পাদক কার্য্য সম্পাদিত হইল। এখন ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে শান্তির অভাব।

ভারতের শান্তিসংহারক উপর্য্যুক্ত প্রস্তাব চতুষ্টয় মঙ্গলোদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতের দুরদৃষ্টদোষে অনিবার্য্য কারণ সূত্রে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষময় ফল প্রদান করিল, অথবা প্রথম হইতেই কোন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞের দুরভি-সন্ধির পরিণাম-নির্দ্দিষ্ট ফলই প্রসব করিল,—তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই বলিতে পারেন। যাহাই হৌক্ এখন ভারতে ইংরাজে ও ভারতীয়গণে ঐক্য নাই, এক জাতির সহিত অন্য জাতির ঐক্য নাই, এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের ঐক্য নাই, রাজায় প্রজায় ঐক্য নাই, নগরের লোকরাশির মধ্যে ঐক্য নাই, সুহৃদ, অন্তরঙ্গ, আত্ম কুটুম্বের মধ্যে ঐক্য নাই, এমন কি, এক পরিবারের লোকদিগের মধ্যে পরস্পরে ঐক্য নাই। অতএব ভারতে আভ্যন্তরীণ কুশলের নিরতিশয় অভাব। সুতরাং শান্তির অভাব। এখন ভারতের শোচনীয় দুরবস্থা।

প্রশ্ন,—এ শোচনীয় অবস্থার নিয়ন্তা কে ?

উত্তর,—বিশারদ রাজনীতিবিশারদ লর্ড রীপণ এবং লর্ড ডফরিণ !!

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } চৈত্র, ১২৯৪। } ৯ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৬।

যদি বল অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলকে অবরুদ্ধ করার নাম যদি সমাধি হয়, তবে উহা আবার সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত নামে দুই প্রকার হইল কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার ভেদ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিতর্ক বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

পদচ্ছেদঃ—বিতর্ক-বিচার-আনন্দ-অস্মিতা-অনুগমাৎ, সম্প্রজ্ঞাতঃ।

পদার্থঃ—স্থূল—সাক্ষাৎকারো বিতর্কঃ, তন্মা[illegible]—সাক্ষাৎকারঃ বিচারঃ, ইন্দ্রিয়াণাং সাত্ত্বিকরূপসাক্ষাৎকার আনন্দঃ, আত্মনাবুদ্ধে রেকাত্মিকা সংবিৎ (অভেদজ্ঞানং) অস্মিতা, অনুগমঃ যোগঃ সম্বন্ধো বা, পঞ্চম্যা হেতুরর্থঃ, সম্প্রজ্ঞাত শব্দস্য তু সম্যক্ সংশয় বিপর্য্যয় রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাত ইতিব্যুৎপত্ত্যা সবীজসমাধিরূপেঽর্থঃ। কেচিত্তু স্থূলসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ, সূক্ষ্মসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ আনন্দ আহ্লাদ ইত্যাহুঃ।

অন্বয়ঃ—বিতর্কশ্চ, বিচারশ্চ আনন্দশ্চ অস্মিতাচ তাসামনুগমাৎ সম্বন্ধাদ্ধেতোঃ (স সমাধিঃ) সম্প্রজ্ঞাতঃ কথ্যত ইতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ।—সমাধির্নাম দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ অসম্প্রজ্ঞাতশ্চেত্যুক্তং। তত্র সম্প্রজ্ঞাতো নাম সমাধিশ্চতুর্ব্বিধঃ (১) বিতর্কানুগতঃ-সবিতর্কঃ (২) বিচারানুগতঃ

সবিচারঃ (৩) আনন্দানুগতঃ সানন্দঃ (৪) অস্মিতানুগতঃ সাস্মিত ইতি, বিতর্কাদীনামনুগমাদেবহেতোঃ সম্প্রজ্ঞাত ইতি কথ্যতে।

অনুবাদ—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চার প্রকার অবস্থা যুক্ত হওয়ায় উহার নাম সম্প্রজ্ঞাত।

সমালোচনা। সম্প্রজ্ঞাত শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যে অবস্থায় কিছু জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃভাবের একেবারে বিলোপ হয় না। সূত্রকার বলিলেন যোগীর প্রথম অবস্থা, প্রথমবৃত্তির নিরোধ হইতে একটী মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাহা,—যখন ক্রমে ক্রমে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চারটি অবস্থাবিশেষ দ্বারা অনুগত হয়, তখন সুতরাং উহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। ঐ চারিটির স্বরূপ ভাষ্যকার বলিলেন—

"বিতর্কঃ চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচারঃ, আনন্দোহ্লাদঃ একাত্মিকা সংবিদস্মিতা।"

বারম্বার বলা হইয়াছে আমাদের চিত্ত বৃত্তি-সঙ্কুল, সে সকল বৃত্তির একেবারে নিরোধ অসম্ভব, তবে উহাদের মধ্যে একটিকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া অন্য গুলির গতি রোধ করিতে পারা যায়। ঐ রূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে যখন সেই একবৃত্তিই স্থায়ী হইয়া অপরের স্থান অধিকার করিয়া বসে, তখন আবার তাহাকে সংকুচিত করত ক্রমে তাহাকে সূক্ষ্ম করিয়া নির্ম্মূল করিতে হয় এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা মন বৃত্তি শূন্য হইয়া একেবারে স্থিরভাব ধারণ করে।

এই অসংখ্যবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানকেই সর্ব্বব্যাপী করিয়া অন্য বৃত্তিগুলিকে অপসারিত করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ জ্ঞান প্রকাশময় সত্ত্ব প্রধান, জ্ঞানাবস্থায় রজো বা তমোগুণ চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে না। এবং বিষয় অনুসারে জ্ঞান মহাস্থূল এবং অতি সূক্ষ্ম, এই উভয় স্বরূপই প্রাপ্ত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, মনের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য একমাত্র জ্ঞানকেই প্রথমে সর্ব্বব্যাপী করিয়া অন্য বৃত্তি গুলিকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিতে হইবে। পরিশেষে ঐ একমাত্র জ্ঞান সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে ঐ জ্ঞানকে আবার সূক্ষ্ম করিয়া ক্রমে নির্ম্মূল করিতে হইবে। জ্ঞানকে ঐ রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম করিবার পদ্ধতি বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—যেমন প্রথম ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাসকারী ব্যক্তিরা অগ্রে বড় বড় স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া হাতের তিগ্‌ ঠীক করিতে শিখে, স্থূল পদার্থে লক্ষ্য স্থির হইলে ক্রমে সূক্ষ্ম পদার্থ ধরে, সেই রূপ প্রথম যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীগণ কোন স্থূল ভৌতিক পদার্থ-

বিষয়ক জ্ঞানকে প্রবল করত চিত্ত হইতে অপর বৃত্তি গুলিকে অপসারিত করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐ জ্ঞানকে আবার সূক্ষ্ম করিতে থাকে। এক্ষণে দেখ, প্রথম যোগী মনস্থির করিবার নিমিত্ত যে কোন স্থূল ভূতকে আশ্রয় করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে প্রবল করত মন হইতে অন্য বৃত্তি অপসারিত করিবে। কিন্তু সেই স্থূল ভূত নিছক একটা পাহাড় পর্ব্বত না হইয়া যদি পরম পবিত্র সত্বময় কোন বস্তু হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয়। মনে কর, শিব মূর্ত্তির ধ্যান হইল 'রজত গিরিনিভং' যেন একটি রূপার পর্ব্বত। পর্ব্বতের মত স্থূল পদার্থ আর কি আছে? তাতে রূপার পর্ব্বত। উপাসকের মন, শিক্ষিত অশিক্ষিত যেরূপ কেন হোক না, অণুমাত্র আয়াস ব্যতীতই সহজে রূপার পর্ব্বতের ধারণা করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ একমাত্র ভৌতিক স্থূল পদার্থের জ্ঞানের সর্ব্বময়ত্ব সম্পাদনের নাম বিতর্ক। তর্ক শব্দের অর্থ অনুসন্ধান।

ভৌতিক স্থূল পদার্থ মাত্রেই নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সুতরাং যে কোন ভৌতিক স্থূল পদার্থের পূর্ণজ্ঞান করিতে হইলে সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অনুসন্ধান করিতে হয়; কেবল রূপার পর্ব্বতের মত একটা প্রকাণ্ড শ্বেতপিণ্ডের জ্ঞানে সম্পূর্ণ শিবমূর্ত্তির জ্ঞান হয় না, তাহার সহিত পর্ব্বতের পাঁচটি চূড়ার মত পাঁচটি মুখ, এক একটি মুখে তিনটি করিয়া চক্ষু, এবং কপালে এক কলা করে চন্দ্র, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অনুসন্ধান রাখিতে হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করে দেখ, ঐ রূপ জ্ঞান মোটের উপর এক বিষয়ক হইলেও, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সংস্রব থাকায়, অনেক বৃত্তিতে সমাকীর্ণ, সুতরাং উহার প্রাবল্যে অন্যবিধ বৃত্তির নিরোধ হইলেও ইহার নিজান্তর্গত বৃত্তির বাহুল্য হেতু চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কাযেই যোগীর স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম আশ্রয় করিতে হয়। দীর্ঘকাল এক বিষয়েরও সাক্ষাৎকারে নিরত থাকায় মনের বৃত্ত্যুদ্ভাবিনী শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়, মন যে কোন এক বিষয়ে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনেকটা আয়ত্ত হয়, কাযেই একবারে সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার আর তাহার পক্ষে আয়াসসাধ্য নহে। এক্ষণে বলিতে পার ভৌতিক পদার্থের মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম সকলইত সাবয়ব, তবে সূক্ষ্মের জ্ঞানকে প্রবল করার বিশেষ ফললাভ কি হইল? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, মন তখন ভৌতিক পদার্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ভূতের

কারণের সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূতের উপাদান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র। তন্মাত্র সকল অতি সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব। স্থূল ভূত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার তন্মাত্রের মধ্যে যে কোন একটি আশ্রয় করিয়া মন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করে, তদাকারে পরিণত হয়। এইরূপ জ্ঞানের অনুশীলনের নাম বিচার সুতরাং যখন আমাদের মন কোন এক তন্মাত্রের আকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, পঞ্চ স্থূল ভূতকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়, মনের সেই অবস্থাকে সবিচার সমাধি বলে। বিচার শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তন। এক একটি তন্মাত্র সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব হইলেও উহা এক একটি বিশেষ দ্রব্য পরস্পর কাহারও সহিত কাহার ঐক্য নাই। সুতরাং তন্মাত্রের সাক্ষাৎকারের নাম বিচার। এরূপ জ্ঞানের সময় অন্য বৃত্তির নিরোধ হইলেও চিত্তে কতক গুলি বৃত্তি থাকে। কেননা "তখন আমি জানিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকে। কাযেই তখনও আত্মায় তন্মাত্র এবং তাহার জ্ঞান এই কয় বিষয়ের বৃত্তি থাকে, অতএব তখনও চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা সম্পাদনের অনেক বাকী। সেই জন্য যোগী উহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিলম্ব দেখিয়া গ্রাহ্য বস্তু একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়দিগের অন্যতমের পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সাক্ষাৎকার করে। এই ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের নাম আনন্দ। কারণ ইন্দ্রিয় সকল সত্বগুণ প্রধান অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং প্রকাশশীল, সুতরাং মন যখন ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হয়, তখন উহাও সত্ব প্রধান হয়, কাযেই ঐ ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞান কেবল আনন্দময়। ঐ ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুশীলন রূপ সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলা যায়। বিজ্ঞান বলেন মন যখন স্থূল বা শূক্ষ্ম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুভব জন্য আনন্দ মাত্রের পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হয়, সেই সাক্ষাৎকারকে আনন্দ বা আহ্লাদ বলে। ঐ রূপ আনন্দের অনুশীলন রূপ যোগকে সানন্দ যোগ বা সমাধি বলে। সে অবস্থায় অপরবৃত্তির কথাত দূরে থাকুক না, স্থূল পদার্থ না সূক্ষ্ম পদার্থ কিছুরই জ্ঞান হয় না, কেবল "আমি সুখী" এই একমাত্র জ্ঞান থাকে।

এক্ষণে বিবেচনা কর "আমি সুখী" ইহা একটি জ্ঞান হইলেও ইহার অন্তর্গত তিনটি বৃত্তি থাকে; প্রথম আত্মবিষয়ক বৃত্তি, যে বৃত্তিদ্বারা আপনার অস্তিত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অনুভব হইতেছে দ্বিতীয় সুখ বিষয়ক, তৃতীয় তাহার

জ্ঞান বিষয়ক। স্থতরাং এ অবস্থায়ও মনের সম্পূর্ণ স্থিরতা সম্পাদন হইতে পারে না, কাযেই যোগীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়।

তখন যোগী আর সব পরিত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত মনের ঐক্য সম্পাদন করিয়া আত্মার সাক্ষাৎকার আরম্ভ করে। তখন মনে আর কোনরূপ বৃত্তিই রহিল না, সকল বৃত্তির নিবৃত্তি হইল, কেবল আমি এই জ্ঞান রহিল। আত্মার সহিত মনের ঐক্য জ্ঞানের নাম অস্মিতা; অস্মি শব্দের অর্থ অহং; 'অস্মিতা' শব্দের অর্থ অহংএর ভাব অর্থাৎ কেবল আমিই সব, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ মনোবৃত্তির নাম অস্মিতা। এই অস্মিতায় অনুশীলনরূপ যোগকে সাস্মিত সমাধি বলা হয়।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ এই সাস্মিত অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাতের চরম অবস্থা। এ অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তিরই নিরোধ হইয়াছে। তখন আর বৃত্তিগণ তরঙ্গমালার মত একটার পর একটা, তার পর আর একটা, এইরূপ অবিশ্রান্ত ভাবে উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে আর ব্যতিব্যস্ত করে না, চিত্ত তখন থমথমে ভাব ধারণ করিয়াছে, কেবল একটি মাত্র বৃত্তি আছে। 'আমি' এইবৃত্তি টুকু আছে বলিয়াই ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই বৃত্তি টুকুর লোপ হইলেই যোগের দ্বিতীয় (অসংপ্রজ্ঞাত) অবস্থা হইবে; ঐ অসম্প্রজ্ঞাতই যোগের চরম অবস্থা। পরস্থত্রে ইহার বিষয় সবিস্তর বলা যাইবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় না বলিয়া উহাকে সবীজ সমাধিও বলা হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহাও বুঝা গেল যে কেবল জ্ঞানময় বৃত্তির অবস্থান হেতুই ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। প্রথমে স্থূল ভূতের জ্ঞান, তাহার পর সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান, অনন্তর ইন্দ্রিয় জ্ঞান, তাহার পর আত্মার জ্ঞান। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল ভূত এবং শব্দ আদি পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সর্ব্বদা জ্ঞেয়,। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞেয় এবং গ্রাহ্য এই দুই শব্দের একই অর্থ। এই নিমিত্ত সবিতর্ক এবং সবিচার এই উভয়বিধ সমাধিকে গ্রাহ্য সমাপত্তি বলা হয়। কারণ গ্রাহ্য বস্তুকে আলম্বন করিয়া ঐ উভয় বিধ সমাধির অনুশীলন করা হয়। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের সাধন, সংস্কৃত ভাষায় সাধন এবং গ্রহণ এই দুইটি একার্থক শব্দ। এই নিমিত্ত সানন্দ সমাধিকে গ্রহণ সমাপত্তি বলে; কারণ জ্ঞানের সাধন কোন এক ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া উহার অনুশীলন করা হয। আত্মা বা চৈতন্য-ময় পুরুষ, একমাত্র জ্ঞাতা; জ্ঞাতা আর গৃহীতা একই কথা। এই জন্য সাস্মিত

সমাধিকে গৃহীতৃ বা গ্রাহক সমাপত্তি বলা হয়। এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের যাবতীয় পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞেয়, (২) জ্ঞানের সাধন, (৩) জ্ঞাতা, যাহার জ্ঞান হয়। এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যোগ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যোগী, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রথমে জ্ঞেয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়; জ্ঞেয় বস্তু আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার; কাযেই তাদৃশ নবীন যোগীর চিত্ত প্রথমে স্থূল, তাহার পর সূক্ষ্মকে আশ্রয় করে। জ্ঞেয় বস্তুর পর জ্ঞানের সাধন; তাহার পর জ্ঞাতাকে আশ্রয় করাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিমিত্তই মোক্ষধর্ম্মকার বলিয়াছেন স্থূলে বিনির্জিতং চিত্তং ততঃসূক্ষ্মে শনৈর্নয়েৎ।" চিত্তকে যখন আপনার ইচ্ছানুসারে অপর বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া কোন এক স্থূল বস্তুর আকারে পরিণত করিতে পারা যাইবে, তখন স্থূল ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ চিত্তকে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যাইবে। যেমন পৃথিবী আদি ভূতগণ স্থূল এবং পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্ম; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং অস্মিতা বা অহঙ্কার সূক্ষ্ম; কারণ সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কারই ইন্দ্রিয়গণের উপাদান। ভোজবৃত্তিকার বলেন, সবিতর্ক, সবিচার, এই দুই প্রকার সমাধি আবার যথাক্রমে নির্ব্বিতর্ক এবং নির্ব্বিচার এই দুই প্রকার অবস্থা পাইতে পারে। সবিতর্ক সমাধি যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুসন্ধান শূন্য হয়, তখন উহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সবিচার সমাধি কেবল সূক্ষ্ম-ধর্ম্মিমাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রবিষ্ট হয়, তৎসংশ্লিষ্ট দেশকাল কিছুরই বিচার না করে, তখন তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলা যায়।

শিকার।

(সোনাথালী—মল্লিকবাড়ী পাহাড়—বসন্ত কাল)

শ্যামল বাসন্তি বন্দ * কানন নির্ঝরে,
ঢালিছে দয়ায় দ্রব হৃদয় তাহার,
লতায়ে শ্যামল লতা শ্যাম তরুবরে,
দেখিতেছে গভীরতা কত করুণার!
অস্ফুট ভাষায় যেন ফোটা ফুল রাশি
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা রয়েছে প্রকাশি!

---

* দুই উচ্চ টিলার মধ্যস্থ সমতল নিম্ন ভূমিকে বন্দ বা বাইদ বলে।

২

বড়ই করুণাবতী অই স্রোতস্বতী,
জননীর মত স্নেহ সকলে সমান,
তৃণ হতে উচ্চ তরু সকলের প্রতি
জীবন রূপিণী রূপে সদা বহমান!
এত স্নেহ এত দয়া আছে আর কার?
ঠিক্ যেন দয়াময়ী—জননী আমার!

৩

বিছাইয়া আছে বন্দে শ্যাম তৃণদল,
লীলা নিকুঞ্জের মত, ঝোপ ঝাপ শত শত
খেলাইছে ছোট ছোট সবুজ অচল!
নিঝরের দুই কূল, শ্যামল হিজল মূল
বিলাসিনী হরিণীর কেলিলীলা স্থল!
গভীর গুজার * বন, নল তারা অগণন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি কানন শ্যামল,
নবতরু নবলতা নব ফুলদল!

৪

বসন্তের শ্যাম রাজ্য রাজত্ব তোমার,
আপনি প্রকৃতি রাণী, পরাইছে যত্নে আনি
যেথানে যা সাজে ভাল রত্ন অলঙ্কার!
সজ্জিত গজাড় † বন, উচ্চ টেক ‡ সিংহাসন,
লতার ললিত কুঞ্জে শয়ন তোমার!
কোকিল কোমল গানে, শ্যামা সুললিত তানে,
শ্রবণে সঙ্গীত সুধা ঢালে অনিবার!
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার!

---

* গুজা = শ্বেত বর্ণের বন্য গোলাপ।

† গজাড় = গজারি।

‡ টেক = টিলা।

৫

প্রতিযোগী শূন্য রাজ্য অনন্ত কানন,
তোমার একাধিপত্য, অসীম শক্তি সামর্থ্য
কে আছে দ্বিতীয় হেন করিবে হেলন ?
তোমার বনের লতা, তোমার বনের পাতা
কাঁপা'তে আপনি ভয়ে কাঁপে সমীরণ !
পড়িতেছে দৌড়াইয়া, এ গাছে ও গাছে গিয়া,
কেমনে পলা'য়ে যাবে ফাঁফর পবন !
দিনে দিবাকর ভাতি, শরতে চাঁদনী রাতি
সশঙ্কে প্রভাত সন্ধ্যা করে আগমন,
বার মাস সাত বার ঋতু ছয় জন !

৬

অসীম বীরত্ব বীর্য্য বিক্রম দুর্ব্বার,
কোটি বজ্র পরাভব, গভীর গর্জ্জন তব
কাননের মাটী ফাটে দাপটে তোমার !
ভীষণ নখর চয়, বজ্র দন্ত সমুদয়
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বাঁধা হাতিয়ার !
অমিত সাহস বল, পরিপূর্ণ বক্ষস্থল
লোলজিহ্বা মহামূর্ত্তি রক্ত পিপাসার !
মাত যবে রণ রঙ্গে, কে আঁটে তোমার সঙ্গে
ভয়ঙ্কর দিক্‌দাহী অগ্নি অবতার !
রাজাধিরাজেন্দ্র তুমি, তোমারি এ বনভূমি,
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার,
অসীম বীরত্ব তব বিক্রম দুর্ব্বার !

৭

এস দেখি আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
এস হে শার্দ্দূল রাজ, দু'জনে যুঝিব আজ,
বুঝিব তোমারে তুমি কত বলবান !
এস বজ্র নখ নিয়ে, বীর বেশে হুঙ্কারিয়ে,
পাল হে বীরের ধর্ম্ম বীরেন্দ্র প্রধান।

নতুবা চোরের মত, হও হে কুপথ গত
পলাইয়ে রাখ তুচ্ছ ঘৃণিত পরাণ,
চাহি যুদ্ধ আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান!

৮

তোমার শান্তির রাজ্য কানন শ্যামল,
আমি হে বিদ্রোহী তার, চাহি তার অধিকার
রাখ দেখি নিজ রাজ্য থাকে যদি বল,
বরাহ ভল্লুক চয়, তব সেনা সমুদয়
বধেছি সঙ্গীনধারী মহিষ সকল!
নাহি অবশিষ্ট আর, এই দেখ এই বার,
মুহূর্ত্তে কানন রাজ্য করিব দখল!
ধরিয়াছি ব্রহ্ম অস্ত্র দেখ রাইফল!

৯

এই যে ছুটিল গোলা অগ্নি উগারিয়া,
ছুটিল নক্ষত্র বেগে, বিজলী জ্বলিল মেঘে,—
লও দেখি কত শক্তি বক্ষ বিস্তারিয়া!
দেখি কণ্ঠে কত বল, কাঁপাইয়া বনস্থল
গোলার গর্জ্জন ঢাক বজ্রে গরজিয়া!
ছুটিল জ্বলন্ত গোলা আকাশ ভাঙ্গিয়া!

১০

"ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
অই গোলা অগ্নিময়, দেখিয়া পাইব ভয়,
এতই ঘৃণিত কি হে পশুর পরাণ?
ও গোলা ত তুচ্ছ অতি, যদি ক্ষেপে সুরপতি
একত্রে অযুত বজ্র তথাপি—সম্মান—
তথাপি জাতীয় মান, প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান
দিব না সে বজ্রমুখে না দিয়ে পরাণ!
ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান?"

১১

" কি বলিব ঐরাবত পশুর অধম,
হইয়ে তোমার দাস, যদি না করিত নাশ
স্বজাতীয় স্বাধীনতা বীর্য্য পরাক্রম!
না আনিত পিঠে করি, চার্জ্জামা হাওদা ধরি
পারিতে কি প্রবেশিতে কানন দুর্গম?
আনিয়াছে গৃহে শক্র পশুর অধম!"

১২

" আনিয়াছে গৃহে শক্র নতুবা কি আর,
সাম্রাজ্য নিবিড় বন, আজ তার সিংহাসন
চাহিতে মানব, প্রাণে,—কি সাধ্য তোমার?
শশক শঙ্কায় তুমি, ঘেঁসিতে না বনভূমি,
থাকুক অজেয় বীর্য্য বীরত্ব আমার!
বংশ নাশী বিভীষণ, বধিল রাক্ষসগণ
সেইরূপ ঐরাবত পশুকুলাঙ্গার!
আনিয়াছে গৃহে শক্র, কি বলিব আর?

১৩

" যাক্ পাপিষ্ঠের কথা বলিয়ে কি ফল!
জ্বলন্ত উহার স্মৃতি তীব্র হলাহল!
ও দাস হয়েছে বলি, ভাবিও না বনস্থলী
একেবারে বীরশূন্য বীরভূ শ্যামল!
এই পাতিলাম বুক, সরিব না একটুক
দেখ এই বজ্র বক্ষে ধরি কত বল,
ছাড় তব ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড় রাইফল!

১৪

স্বাধীন হৃদয়ে আর, বৃথা তব অহঙ্কার
সহেনা হে, তুমি ক্ষুদ্র নর হীন বল!
এ বজ্র নখরাঘাতে, এই ভীম বজ্র দাঁতে
বিদারি তোমার গর্ব্ব স্ফীত বক্ষ স্থল,
আকণ্ঠ করিব পান শোণিত তরল!"

১৫

এই ছাড়িলাম গোলা রক্ষা নাই আর,—
গরজিল রাইফল "সেণ্ট্রাল ফায়ার" !—
এ কি হে মুহূর্ত্তে হায়, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণ বক্ষ মৃতের আকার,
বীরেন্দ্র শার্দ্দূল রাজ, এত যে অযত্নে আজ
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার ?
হা হৃদয় কি অজ্ঞান, এই আত্ম বলিদান,
এই আত্মবধ চিত্র দেখি পুনর্ব্বার,
সমাহিত স্মৃতি রোগ জাগা'লে আবার !

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

লর্ড কানিঙের ধীরতা।

(১৮৫৭ অব্দে কলিকাতার ঘটনা।)

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই খানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক নরনারী, বালক ও বালিকা একত্র জড় হইয়াছিল। ইহাঁরা দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছিল; এজন্য ইহাঁদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কোন চেষ্টা ছিল না। দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে অতিবাহিত করাতে ও দীর্ঘকাল আপনাদের নিরীহভাবের পরিচয় দেওয়াতে ইহাদের চিত্তবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার অপরাপর অধিবাসিগণও সবল ও সাহস-সম্পন্ন ছিল না। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে উদারান্নের সংগ্রহে তৎপর থাকিত, নিরুদ্বেগে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং নিরাপদে আপনাদের অবলম্বিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিত। ইহাদের আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন ছিল না। উদ্ধত ইংরেজেরা ইহাদের উপর অনেক সময়

অত্যাচার করিতেন। যৌবনসুলভ তেজস্বিতায়, অদূরদর্শিতামূলক আত্মম্ভরিতায় ও অমানুষোচিত আত্মপ্রাধান্যমত্ততায় ইহারা কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত করিয়া আপনাদের নিকৃষ্টতর সুখে আপনারাই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। বে-সরকারী ইংরাজ সম্প্রদায় ক্রয়বিক্রয়ে আপনাদের ক্ষতিলাভ গণনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কার্য্য-প্রসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের যতটুকু মিশিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা কেবল ততটুকু মিশিতেন। সুতরাং সাধারণ অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। তাহাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব প্রভৃতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা রাজধানীর সুরম্য প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। জনসাধারণের মনোগত ভাব বুঝিয়া অপরের মানসিক প্রকৃতি পরিজ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করিতেন না, এবং আপনাদের অবলম্বিত বাণিজ্যব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দূরতর প্রদেশের কোন বৃহৎ ব্যাপারের পর্য্যালোচনাতেও ব্যাপৃত হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা মহা-রাষ্ট্রখাতের সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর থাকিতেন। তাঁহারা এইসময়ে মহারাষ্ট্রখাতবাসী বলিয়া অভিহিত হইতেন। রেলওয়ে হওয়াতে ইংরেজেরা সময়ে সময়ে কলিকাতায় বাহিরে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বহুদর্শিতা অধিকতর প্রসারিত হইত না। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই বাণিজ্যপ্রধান মহানগরে বাস করিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে চীনদেশের মানচিত্রকারকদিগের যেরূপ ধারণা ছিল, সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ধারণা উহাপেক্ষা বড় বেশী ছিল না। চীনের মানচিত্রকারক যেমন চীন সাম্রাজ্যকে সমগ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিতেন, উল্লিখিত ইংরেজ সম্প্রদায়ও তেমনি ভারতের সুদৃশ্য প্রসাদ-ময়ী রাজধানীকে সমগ্র ভারতের প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের ভয়ঙ্কর সংবাদে এই শ্রেণীর লোকে যে সন্ত্রস্ত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা মিরাটে ঘটিয়াছে, দিল্লীতে যাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালাতেও যে, তাহাই ঘটিবে, এই শ্রেণীর লোকে কেবল ইহা ভাবিয়াই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত; এবং শঙ্কিতহৃদয়ে আপনাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট

চাহিয়া থাকিত। প্রাণের দায়ে তাহাদের এরূপ উদ্ভ্রান্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তাহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে বাস করিয়া আসিতে ছিল; নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে আপনাদের বৈষয়িক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিত; এবং আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াই পরাজিত পরাধীন জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিত। এই দীর্ঘকালে তাহারা কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, এবং যে জাতির প্রতি তাহারা এই দীর্ঘকাল অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আসিতেছিল, সেই জাতি হইতে যে তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, ইহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এখন ঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা এই সংবাদে সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে আপনাদিগকে বিপদে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহানগরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গি ও পর্ত্তুগীজেরাই ইহাতে অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল, ইংরেজেরাও ভয়ের হস্ত হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অনেকে আপনাদের নিরাপদ করিবার জন্য জাহাজে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা অন্ধকারময় গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী পল্লিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ইংলণ্ড যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিলেন; কেহ কেহ বা বন্দুক ও পিস্তল কিনিয়া সর্ব্বদা সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া রহিলেন *।

* য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের এইরূপ অবস্থা মে মাসে ঘটিয়াছিল। জুন মাসে ইহারা অধিকতর সন্ত্রস্ত হয়। যাহা হউক, মে মাসে ইহাদের যেরূপ আশঙ্কা হয়, তৎসম্বন্ধে একখানি সংবাদ পত্রে এরূপ লিখিত হইয়াছিল :— "অনেকে আপনাদের গাড়ীতে পিস্তল লইয়া যাইতেন; এবং আপনাদের বেহারাদিগকে ঐ পিস্তল শীঘ্র শীঘ্র ভরিতে ও ছুড়িতে শিখাইতেন। ভাগীরথীতে যে সকল জাহাজ ছিল, তাহা রাত্রি কালে য়ুরোপীয়গণে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। শত্রুপক্ষ রাত্রিতে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া, য়ুরোপীয়গণ ঐ সকল জাহাজে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা সকল স্থানেই ও সকল সময়েই আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিতেন। যখন সহসা কোন বিপদ ঘটে, তখন মনের এরূপ ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে।"

এই সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙের স্বাভাবিক ধীরতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনরূপ গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রশস্ত মুখমণ্ডলে এ সময়েও প্রশান্তভাব বিরাজিত ছিল। প্রশস্ত ললাট-ফলক এ সময়েও উদ্বেগের আবিলতা হইতে বিমুক্ত ছিল। কলিকাতার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের এ সঙ্কটকালেও ধীর ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অসন্তোষের সহিত তাঁহাকে স্বশ্রেণীর স্বধর্ম্মের লোকদিগের রক্ষায় উদাসীন ও উপস্থিত সময়ে গুরুতর রাজকীয় কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার য়ুরোপীয় প্রবাসী ও ফিরিঙ্গিগণ যে অকারণে ভীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের ভয়ের অনেকগুলি কারণ ছিল। যে সকল সিপাহী পূর্ব্বে কোম্পানীর প্রধান সহায় হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন সহসা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ইংরেজের শোণিতে আপনাদের উদ্দাম প্রতিহিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুরে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থান করিতেছিল। ইহারা এক রাত্রিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া য়ুরোপীয়দিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে পারিত। কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ, কারালয়ের অপরাধীদিগের বিমুক্তীকরণ, ইহাদের অসাধ্য কার্য্যমধ্যে পরিগণিত ছিল না। মিরাটে, দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, কলিকাতাতেও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কলিকাতার য়ুরোপীয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মহাবিপ্লবের পূর্ণ মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল, এবং আপনারা প্রণষ্টসর্ব্বস্ব হইবে মনে করিয়া ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য কাতরভাবে গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড কানিঙ্ বিশেষ না ভাবিয়া সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে থাকিয়া এবং ধীরতার সহিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে প্রবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আশঙ্কার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, আতঙ্ক উদ্বেগের তরঙ্গে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ যখন সমভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও লর্ড কানিঙের ধীরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল,

লর্ড কানিঙ্ প্রতিদিন ধীরভাবে বিপদাপন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং ধীরতার সহিত উপস্থিত বিপদ নিরাকৃত করিতে যত্ন, উদ্যম, ও চেষ্টার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ইংরেজ সম্প্রদায় এই সময় ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণরজেনেরল বিপদের পূর্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। যে হেতু তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে, ভাবিয়া এখনও বিচলিত হন নাই। কলিকাতা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে য়ুরোপীয়দিগের দশা কি ঘটিবে, তাহা তিনি ভাবিতেছেন না; এবং য়ুরোপীয়দিগের আশঙ্কা যে, কিরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় যে, কতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ব-বিধ্বংস-ভাবনার করালছায়া যে তাহাদিগকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণর জেনারলের মুখমণ্ডল যদিও প্রশান্তভাবে শোভিত ছিল, তথাপি উপস্থিত বিপদের পূর্ণভাব বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাসীন্য জন্মে নাই।*

দূরতরপ্রদেশে যাহারা বিপদাপন্ন হইয়াছে, যাহাদের জীবন ও সম্পত্তি ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাইতে তিনি কিছুতেই বিমুখ হন নাই। এই সকল বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করিতে তিনি হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিতে ছিলেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থানে থাকিয়া বিপ্লবের সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাদিগকে আপনারাই বিনষ্টপ্রায় মনে করিতে ছিল, গবর্ণরজেনরেল তাহাদিগের প্রতিও সমবেদনা দেখাইতে কাতর হন নাই। তিনি তাহাদের গভীর আশঙ্কার কারণ বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যসম্পাদন বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিপদাক্রান্ত জনপদরক্ষা করাই

---

* লর্ড ক্যানিঙ্ এই সময় যে সকল চিঠি পত্র লিখিয়া ছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়াযায়। তিনি বিশপ্ উইল্‌সনকে এসময়ে যে পত্র লিখেন, তাহার ভাব এই—"আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি উহা পরিষ্কৃত হইবার চিহ্ন অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ধীরতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যথোচিত পূর্ব্বসাবধানতা ও শক্তির সহিত কার্য্য করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান হইবে না। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ও বারাণসীতেই বিপদ অধিকতর প্রবল হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রভুত্বশক্তি-সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ আশা আছে যে, আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইব।

অগ্রে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়া ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন। অগ্রে কলিকাতা রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত না করাতে যাঁহারা তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া ছিলেন, তাঁহার তদীয় হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারেন নাই। গবর্ণর জেনেরল যে স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সে স্থান অপেক্ষায় অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের করাল ছায়া পূর্ণ মাত্রায় বিস্তৃত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল ঐ সকল স্থানের রক্ষা বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ সম্প্রদায় ইহা না বুঝিয়া গবর্ণর জেনেরলের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। যে হেতু, গবর্ণর জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

মে মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে কলিকাতার ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিকদল ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলিকাতায় বাণিজ্যসমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভা হইতে এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের নিকটে আবেদন হইতে লাগিল। ফরাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদেশিক জাতিও এ বিষয়ে ইংরেজদিগের সহিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। আবেদনকারীরা সকলেই সৈনিকদিগের ন্যায় যথানিয়মে সজ্জিত ও শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী রক্ষার জন্য সখের সৈনিকদল সংগঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় এই উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা বিশেষ কনষ্টেবলরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। গবর্ণর জেনেরলের উত্তরে ইংরেজ সম্প্রদায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অপরিসীম বিরাগ ও ক্ষোভের সহিত মনে করিতে লাগিলেন যে গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই তাহাদের কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল যে, আবেদনকারীদিগের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। এই সময়ে বাহিরে সাধারণের সমক্ষে আপনাদের গভীর আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এরূপ করিলে হয়ত সাধারণের হৃদয় অধিকতর

উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ইংরেজদিগকে সকল বিষয়ে আট ঘাট বাঁধিতে দেখিয়া সাধারণে হয়ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিঙ্ সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল জাতিরই শাসন, পালন ও রক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিজ কলিকাতা ও সহরতলীতে সকলেই যারপর নাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিবাস ভূমিতে এক শ্রেণীকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করিবার জন্য যাহা করা যাইবে, হয়ত তাহাতে অন্য শ্রেণী অধিকতর ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। যাহাতে সকলেই শান্ত হয়, সকলেই সর্ব্বব্যাপী আশঙ্কার আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, উপস্থিত সময়ে তাহাই করা উচিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ ভয়ে যারপরনাই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা আপনাদের জাতিনাশ হইবে বলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় বিচলিত হইতেছিল, এবং আপনাদের জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। নানাবিধ বিস্ময়কর বাজার গুজব সকল বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। লর্ড কানিঙ্ প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা, যাহাতে এই সকল কাহিনীর অমূলকত্ব সপ্রমাণ করেন, তজ্জন্য ইংরেজ সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড কানিঙ্ ২০এ মে লিখেন, "বাজার গুজব উঠিয়াছে যে, আমি হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য, যে সকল পুষ্করিণীতে হিন্দুগণ স্নান করে, তৎসমুদয়ে গোমাংস ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছি; জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য মহারাণীর জন্ম দিনে সমস্ত মুদীর দোকানই বন্ধ করা হইবে। যে সকল লোকের এ সময়ে ধীরভাবে বুঝিয়া চলা উচিত, তাহারাও আগ্রহের সহিত বলিতেছেন যে, ঐ সকল গুজবের প্রত্যেকটি যেমন বাজারে প্রচারিত হইবে, অমনি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা তাহা অলীক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা কর্ত্তব্য। এরূপ করা হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল লোক পিস্তল লইয়া সজ্জিত হইতেছেন। এইরূপ জনরবের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য, আমার বিবেচনায় যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত চলিলে আমি আশা করি,

সাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে।" মহামতি লর্ড কানিঙ্‌ এইরূপ ধীরভাবে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন এবং সম্প্রদায় বিশেষের কটূক্তি ও উত্তেজনার মধ্যেও দৃঢ়তা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া শান্ত-ভাবে শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন।

ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙ্‌ যেরূপ উদারতা ও সমদৃষ্টি দেখাইয়া ছিলেন, এখন প্রগাঢ় শান্তির সময়ে সেইরূপ উদারতা ও সমদর্শিতা রক্ষিত হইলে, শাসিত জনপদের যে, কতদূর মঙ্গল হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গুরুশিষ্যের সমন্ধ।

আমরা মানুষ বলিয়া অনেক সময়ে অহঙ্কার করিয়া থাকি। প্রকৃত মানুষ হইতে পারিলে অহঙ্কারের কথাও আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ কাহাকে বলিব? আহার, নিদ্রা, ভয়, ভোগ, লালসাদি কতকগুলি সাধারণ প্রবৃত্তি আছে, ঐ সকল বৃত্তি মানুষেরও যেমন, পশুরও তেমন। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা পশু হইতে মানুষ পৃথক্‌ করিতে পারা যায় না। সেই জন্যই হিতোপদেশকার বলিয়াছেন—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

অর্থাৎ "আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি পশুরও যেমন মানুষেরও তেমন। মানুষের কেবল জ্ঞানটী মাত্র বেশী। যাহার জ্ঞান নাই সে পশু।" আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি বৃত্তির সহিত যখন জ্ঞান মিলিত হয় তখনই মানুষের মানুষত্ব; যতদিন জ্ঞান মিলিত না হয়, ততদিন তাহার পশুত্ব দূর হয় না, মনুষ্যত্ব জন্মে না।

তবেই দেখা গেল, আমরা জন্মিয়াই মানুষ হই না। জন্মকালে আমাদের মানুষের মত চোক, মুখ, নাক, কাণ, সবই হয় বটে, কিন্তু তথাপি আমরা মানুষ নই। এই জন্ম আমাদের প্রাণি জন্ম, মনুষ্য জন্ম তখনও হয় নাই, আমাদের মনুষ্যত্ব তখনও জন্মে নাই। পিতা আমাদের জন্মদাতা, তাঁহারই কৃপায় আমরা এ জগতে আসিয়াছি, তিনি আমাদের গুরু, তিনি আমাদের পূজনীয়, আরাধনীয়। কিন্তু আমাদের উৎকৃষ্টতর জন্ম, এখনও বাকী। সেই উৎকৃষ্টতর জন্মদাতা, বা জ্ঞানদাতাও আমাদের পিতা। সেই জ্ঞানদাতা পিতা, আমাদের শিক্ষক, গুরু, আচার্য্য। মনু বলেন ঃ—

"আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।"

আচার্য্য বা শিক্ষক পরমাত্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা জন্মদাতা, সেই জন্য পিতাকে প্রজাপতির মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। আচার্য্য জ্ঞানদাতা, সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা, জ্ঞানদাতা পিতাকে একটু উচ্চে স্থান দিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত। পিতা আমার জন্মদাতা, এজন্য আমি তাঁহার কাছে ঋণী। কিন্তু আমি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মহা জরায়ুতে আজিও পড়িয়া আছি। কিছুই দেখিতে পাই না, জগতের কিছুই জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। আমি কি তা জানি না, পশুতে আমাতে প্রভেদ কি, সে জ্ঞান আমার নাই। যে গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা আমার মত অজ্ঞান তিমিরান্ধ প্রাণীরও চক্ষুরুন্মীলিত করেন, তিনি যে উৎকৃষ্টতর জন্মদাতা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদেই আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াছি। সাধারণ প্রাণী জীবন অপেক্ষা মনুষ্য জীবন যেমন শ্রেষ্ঠ, উৎপাদক পিতা অপেক্ষা জ্ঞানদাতা পিতা তেমনি শ্রেষ্ঠ।

মনু বলিতেছেন ঃ—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।"

অর্থাৎ জনক ও শিক্ষক দুইই পিতা, যেহেতু উভয়ই জন্মদাতা। তাঁহাদের মধ্যে উৎপাদক পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদাতা অর্থে বেদের উপদেষ্টা বা প্রকৃত জ্ঞানদাতা।

নয়নোন্মীলন অপেক্ষা জ্ঞানোন্মীলনের আদর চিরকালই বেশী। শিশু

অপেক্ষা গুরুর বয়স কম হইলেও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে। এই বিষয়ে মনুতে এই সুন্দর গল্পটি আছে।

অঙ্গিরার পুত্র শিশুকবি তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রদিগকে পড়াইতেন, এবং "হে পুত্রক" বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপ সম্বোধনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট "পুত্রক" শব্দ যুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করেন। দেবতারা মিলিত হইয়া বলিলেন, "শিশু তোমাদিগকে ঠিকই বলিয়াছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ সেই বালক, যিনি উপদেষ্টা, তিনিই পিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন।" মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান হয়েন, তবে তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলেন। গুরু বয়সে কমই হউন আর বেশী হউন, তিনি শিষ্যের মান্য, তিনি শিষ্যের পিতা, উৎপাদক পিতা অপেক্ষাও সম্মানের পাত্র।

আজকাল গুরু শিষ্য বলিলে আমরা দুই রকমের গুরু ও দুই রকমের শিষ্য বুঝি। প্রথম, শিক্ষক ও ছাত্র, দ্বিতীয়ত দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত শিষ্য। আমি এ পর্য্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্র অর্থেই গুরু শিষ্য কথা দুইটীর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, পরেও করিব। শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় লইয়াই এই প্রবন্ধ।

শিক্ষাগুরু আবার পূর্ব্বে কার্য্যভেদে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইতেন। যিনি উপনয়ন দিয়া সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করাইতেন তিনি আচার্য্য নামে কথিত হইতেন এবং যিনি অর্থলাভের জন্য বেদের এক দেশ বা বেদাদি পড়াইতেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হইত। এখন গুরু বলিলে সাধারণত জ্ঞানদাতা মাত্রকেই বুঝায়; সেই জন্য উপাধ্যায় ও আচার্য্য দুই অর্থেই গুরু শব্দের ব্যবহার করিলাম।

যতদূর দেখা গেল, তাহাতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা কি কতক বুঝা গেল? গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কেবলমাত্র পার্থিব নয়, লৌকিক নয়, সামাজিক নয়, তাহাতে লৌকিকতা প্রভৃতি সমস্ত ত আছেই, আরও কিছু বেশী আছে,— সেটুকু আধ্যাত্মিকতা। এই সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর নয়, ইহা সত্য, অজর, অমর, অবিনশ্বর, অনন্তকাল স্থায়ী। ভৌতিক দেহের সহিত এই সম্বন্ধের ধ্বংস নাই। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"আচার্য্যস্তু যাং জাতিং বিধিবৎ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা, সাজরামরা॥"

বেদজ্ঞ আচার্য্য গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা যে জন্ম উৎপাদন করেন তাহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ বলিয়া সত্য, অজর, অমর। যাঁহার প্রসাদে আমরা ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পাইতে পারি, তাঁহার সহিত সম্বন্ধকে কোন মতেই ক্ষণিক বলা যাইতে পারে না।

গুরুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু যাহা বলেন তাহার মর্ম্মানুবাদ এই—ধার্ম্মিক অধ্যাপক শিষ্যদিগের উপর কোনরূপ গুরুতর হিংসা না করিয়া শিক্ষা দান করিবেন। মধুর ও মৃদু বাক্যে শিষ্যের প্রীতি উৎপাদন করিবেন। ইত্যাদি

শিষ্যের কর্ত্তব্য অনেক। মনুর শ্লোক তুলিবার আবশ্যক নাই। মনু যেরূপ শিষ্যের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ শিষ্য ভারতে আর কোন কালে হইবে কি না সন্দেহ। শিষ্যের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন তাহার কয়েকটা এই ;—

শিষ্য জিতেন্দ্রিয় হইবে, রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইবে না, গুরুর প্রতি কখনও অভক্তি, অনাদর, অনাস্থা দেখাইবে না। মিথ্যাচরণ সকল সময়েই গর্হিত কার্য্য, ছাত্রাবস্থায় আরও বেশী গর্হিত। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যাহাতে উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা শিষ্যের নিতান্তই প্রয়োজন। বেশ ভূষাদির শোভা সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিবে না, বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া ছাত্রের কর্ত্তব্য নহে। ইত্যাদি—

ছাত্রের সহাধ্যায়ীর ছাত্রের প্রতি ভাইয়ের মত ব্যবহার করা উচিত। একজনের দুঃখে অপরে দুঃখ অনুভব করিবে, এবং সুখে সুখ অনুভব করিবে।

শিষ্য যে স্থানে গুরুর নিন্দা বা পরীবাদ শুনিবে, হয় সেস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইবে, অথবা কাণ ঢাকিয়া রাখিবে। মনু বলেন—

"গুরোর্যত্র পরীবাদ, নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, কিরূপ আচরণ ছিল তাহার ছায়ামাত্র আমি দেখাইলাম। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণই প্রধানত গুরু ছিলেন। তাঁহারা বেদ অধ্যাপন করাইতেন। সুতরাং এখন আমরা অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ এখন কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখা যাউক।

ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশের কথা আমি জানি না। বাঙ্গালাতে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক স্থির করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক যে

বাঙ্গালায় গুরু শিষ্য এক রকম নহে। এখন বাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে দুই রকম শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত। সুতরাং দুই রকম গুরু শিষ্য দেখিতে পাই। দুই শিক্ষাপ্রণালীতে যখন অনেক প্রভেদ, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্ক দুই রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। টোলে ও ইংরাজি স্কুলে সম্পূর্ণ পৃথক্ নিয়মে অধ্যাপনা হয়। টোল পূর্ব্বনিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিতে চান, পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষা করিতে চান। কিন্তু স্কুলে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ অন্যরূপ। সেখানে কোন বিশেষ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কেহ চলে না। ছাত্রগণ তাহাদের সাধারণ জ্ঞানে গুরুকে যতদূর ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত মনে করে, তাই করে। টোলের ছাত্রগণ গুরুবাক্য লঙ্ঘন মহাপাপ মনে করে, স্কুলের ছাত্র অনেক সময়ে কিছুই মনে করে না।

যদিও পূর্ব্বনিয়ম রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, তথাপি টোলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক-মর্য্যাদা রাখিয়াছে। টোলে অধ্যাপক আজিও ছাত্রের "পিতা" অধ্যাপকের ভ্রাতা "খুড়ো" সহাধ্যায়ী ছাত্র "দাদা" বা "ভায়া"। টোলের পূর্ব্ব গৌরবের সহিত আধুনিক দুরবস্থার তুলনা করিলে যদিও টোলের অনেক অবনতি হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহার গৌরব একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইহা বেশ বলিতে পারা যায়। টোলের অধ্যাপকগণ এখনও পূর্ব্ববৎ নিস্পৃহ, অথবা সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট। যতদিন অধ্যাপকগণ এইরূপ নিস্পৃহ থাকিবেন, যতদিন বিলাসিতার মোহন মন্ত্রের ছলনে না ভুলিবেন, যতদিন নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বাভাবিক তেজ, শাস্ত্রানুশীলনে আসক্তি, স্বকীয় ধর্ম্মে অবিচল অনুরাগ হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইবেন, যতদিন শাস্ত্রচিন্তায় জলাঞ্জলি না দিয়া, নিজের বংশপরম্পরাগত সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চাটুকারবৃত্তিতে দীক্ষিত না হইয়া, নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবেন, যত দিন "উপাধি ব্যাধি" গ্রস্ত হইয়া ঘৃণিত পদানুসরণ না করিবেন, ততদিন আমরা টোলের মধুর শিক্ষা, পবিত্র শিক্ষা, স্বর্গীয় শিক্ষার জ্যোতি দেখিতে পাইব; সহাধ্যায়ীর মধ্যে সহোদর-প্রীতি দেখিয়া হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে পারিব; গুরুর প্রতি ছাত্রের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে পারিব।

এইস্থানে আমি টোলের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে, টোলের কি নিয়মানুসারে পড়া হয়, কি নিয়মে থাকা হয়, অধ্যাপক ছাত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার

করেন, তাহা বলা আবশ্যক। অনেক দিন হইল "সাধারণীতে" প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই,—

ছাত্র ভোরে উঠিয়া "আবৃত্তি" আরম্ভ করেন। টোলের ছাত্রগণ আবৃত্তিকে পাঠের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ আবৃত্তি—অর্থ বুঝা অপেক্ষাও ভাল। আবৃত্তি শেষ হইলে তাঁহারা অধ্যাপকের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। গুরু আসনে উপবেশন করিলেন, ছাত্রগণ সম্মুখে বসিলেন। ছাত্রের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল, গুরুভক্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ হইল, ছাত্র গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া পাঠারম্ভ করিলেন, পাঠশেষ হইলে গুরুকে আবার নমস্কার করিয়া স্থানান্তরে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতে লাগিল। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি অচল, প্রগাঢ়; শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ অচল, অটল, প্রগাঢ়।

বৈকালবেলা নূতন পড়া হয় না। সকালবেলা যাহা পড়া হয়, তাহার আলোচনা। এইরূপ আলোচনাকে টোলের ছাত্রগণ "পাঠ চাওয়া" বলেন। এই সময়ে ছাত্রে ছাত্রে অলৌকিক ভ্রাতৃভাবে পরিচয়। ছাত্রের প্রতি ছাত্রের স্বর্গীয় প্রীতির দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক অধিক পাঠের ছাত্রকে পাঠ চাওয়ান, তার পর যাহার অপেক্ষা যে কম পড়ে, সে তাহার কাছে পাঠ চায়। অধিক পাঠের ছাত্রকে অল্প পাঠের ছাত্র অগ্রজের মত ভক্তি করেন, তিনিও তাঁহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করেন। এই সকল নিয়মের গভীরতা না বুঝিতে পারিয়া অনেকে টোলের সমস্ত প্রথারই দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। বাস্তবিক টোল নিন্দার বস্তু নয়। পূর্ব্বে হিন্দুদের গুরু শিষ্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা টোলে গেলেই কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অন্যরূপ। পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে টোলের নিয়ম চলিত। এখন সংস্কৃত কলেজ হইতেও সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এখন অপর স্কুলেও গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক, সংস্কৃত কলেজেও তাই।

ইংরাজি স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বালকগণ যতদিন নিম্নশ্রেণীতে পড়ে, ততদিন তাহাদের কোমল, সরল, নির্ম্মল, হৃদয়ে গুরুভক্তির একটু রেখা দেখা যায়। কোমল জিনিষে রেখা বেশী দিন থাকে না, শিশুর কোমল হৃদয়ের ভক্তি রেখাও জল রেখাবৎ বিলুপ্ত

হইয়া যায়। শিশুকালে যে গুরুভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাই, উহা গুরুভক্তি কিম্বা ভয়ের রূপান্তর মাত্র, বুঝিতে পারি না। স্কুলের ছাত্রগণে গুরুভক্তির অভাবই পদে পদে লক্ষিত হয়।

যাঁহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, তাঁহার কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? সন্দেহ, দ্বৈধভাব, অবিশ্বাস শিক্ষার বিশেষ অন্তরায়। আমাদের ছাত্রগণের অধ্যাপকের উপর কথায় কথায় সন্দেহ। তাহারা "গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্য সন্তৎ" গুরুর কথাই ঠিক, অপর মিথ্যা, এই মহাবাক্যের অনুসরণ করে না। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, সুতরাং গুরদক্ষিণার ঘটাটা একটু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক পাঠের জন্য কোনরূপ তিরস্কার করিলেন, ছাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাস্তায় গুরুদক্ষিণার বন্দোবস্ত করিয়া গেল। পূর্ব্বে গুরুদক্ষিণার বন্দোবস্ত ছিল "উপহারে" এখন "প্রহারে।" ছাত্রদের অবশ্যই দোষ নাই, "প্র" উপসর্গটা যুটিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এমন স্কুল আজকাল বড়ই বিরল, যেখানে এমন গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে একবার গুরুভক্তির একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সময়টা আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ১৮৮২ সাল। এক শ্রেণীর ছাত্রগণ, দেওয়ালের গায়ে গুরুর অশ্রাব্য স্তুতি লিখিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। তাহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্লাসের সমস্ত বালক তাড়াইয়া দেন। গুরুর অপমানের জন্য একটা ক্লাসের সমস্ত বালক তাড়াইতে হইল, ইহাপেক্ষা হিন্দুর আর কি অধঃপতন হইবে?

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ-শিথিলতার এইখানেই শেষ হয় নাই। গুরুনিন্দা গুরুপ্রহার, গুরুতিরস্কার করিয়াই আধুনিক গুরভক্তগণ খুসী নয়, যেখানে সেখানে, যখন তখন, তাহারা গুরদানব-পরাজয় কাহিনী, অট্টহাস্য হাসিয়া, ঈষৎ গম্ভীরতা, ঈষৎ তরলতার সহিত বলিয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে। বলিয়া থাকে—"কত মাষ্টর পণ্ডিত ঠিক করে দিয়েছি।" এইরূপ গুরু-দক্ষিণার বন্দোবস্ত কলিকাতায়ই বেশী। পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে যদিও গুরুভক্তির বেশী একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এতটা অধঃপতনের চিহ্ন দেখা যায় না।

তার পর সহাধ্যায়ীর প্রতি ব্যবহার। তাহাতেও স্কুলের ছাত্রের প্রশংসা করিতে পারি না। সহাধ্যায়ীর সহিত সদ্ভাব জন্মান ত দূরের কথা, দুই তিন

বৎসর একত্র পাঠ করিয়া ছাত্রেরা পরস্পর নাম পর্য্যন্ত জানেন না। মানুষ একেবারে আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে না, তাই দুই এক জনের সহিত আলাপ থাকে। ইহাতে সহাধ্যায়ীর প্রতি উচিত ব্যবহার করা হইল বলিয়া, বোধ হয়, কেহই স্পর্দ্ধা করিবেন না।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, স্কুলে যত ছাত্র পড়ে সকলেই গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করে। এখনও স্কুলে অনেক গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুভক্তির জন্য, মাতৃভক্তির জন্য, বা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য আবার প্রশংসা কি? উহা ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আমরা ক্রমে এতদূর শোচনীয় দশায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আমাদের গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বধর্ম্মে বিশ্বাসও একটা প্রশংসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক দিন পরে ছেলেকে ছেলে বলাটাও হয়ত প্রশংসার কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

এরূপ হইল কেন? গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কেন এতদূর শিথিল হইল? তাহার কারণ অনেকগুলি। আমার বোধহয়, এই কয়টী কারণই—প্রধান।

প্রথম। গুরুর সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠতার অভাব। পূর্ব্বে গুরুর বাড়ীতে শিষ্য বাস করিত, সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া গুরুর আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি শিষ্যের অভ্যাস হইত। সর্ব্বদা দর্শনে, সর্ব্বদা সম্ভাষণে তাহাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইত। স্কুলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শিক্ষক বদল হয়, দিনে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে অবশ্যই ঘনিষ্ঠতার আশা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বের মত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্কুলে হইতে পারে, এ আশা দুরাশা মাত্র।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে গুরু একজন থাকিতেন, এখন তাহার স্থানে অনেক। একের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে যতটা সুবিধা, দশের প্রতি অবশ্যই ততটা নহে। প্রতি বৎসর শিষ্যের নূতন নূতন শ্রেণীতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ছাত্রেরও কর্ত্তব্য বাড়ে। গুরু এক রকমের হইলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজ। কিন্তু এখন একটা ছাত্রের নয়টা গুরু। নয়টী আবার নবরঙ্গের। একজনের হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ, একজন খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী, আর একজন হয়ত কোন একটা উপধর্ম্মের উপাসক। হিন্দু শিক্ষক বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ "পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।" অপর একজন বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, "ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সম্বন্ধ।" খ্রীষ্টান অধ্যাপক হয়ত আর এক রকম বলিবেন। এখন ছাত্র কি শিখিবে? কাহাকে খুসী

করিবে? সুতরাং শিষ্যের ঘাড়ে গুরুকে অসন্তুষ্ট করার দোষ একটু পড়িবেই পড়িবে।

তৃতীয়। গুরুর কর্ত্তব্যের শিথিলতা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অবশ্য-ম্ভাবী ফলই গুরুর কর্ত্তব্যের ত্রুটি। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক সম্বন্ধ। গুরু পড়ান, পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য নয়,—কেবল অর্থের জন্য। কর্ত্তব্য পালনে ধর্ম্ম হয়, কি শিষ্যের পাঠের ব্যাঘাত হইলে অধর্ম্ম হয়, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। দিনটী গেলেই দুইটী টাকা পাইবে, দুই টাকায় রোজ দুই ঘণ্টা করিয়া খাটিবে, ঘণ্টাটী বাজিলেই বাড়ী চলিয়া যাইবে—এই তাঁহাদের হিসাব। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য দুই ঘণ্টা সময় অধিক ব্যয় করিতে তাঁহাদের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্যই এমন কোন মহাত্মা থাকিতে পারেন, যিনি অর্থের লালসা না করিয়া ছাত্রের উন্নতির জন্য অতি-রিক্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার কার্য্যকে সকলেই প্রশংসা করিবেন, আমিও করি। কিন্তু সাধারণত কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, আর্থিক সম্বন্ধের জন্যও শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্বন্ধের শিথিলতা ঘটিয়াছে।

চতুর্থ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষেও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা শিথিল হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞানগত। জ্ঞান তাহার মূল ভিত্তি। জ্ঞান যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, সে শিক্ষায় জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত জ্ঞান দান করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাদের জ্ঞান পরীক্ষা গত; পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইল সেই জ্ঞানী, যে উত্তীর্ণ হইল না সে অজ্ঞান। সুতরাং যাহাতে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাই শিক্ষকগণ শিখাইতে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, মহাজ্ঞানী হইল, ঐ খানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঘুচিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের কথায় আমার একটা বৈরাগীর জামার কথা মনে পড়িল। বাউলদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক রকম জামা দেখা যায়, সেই সকল জামা উনপঞ্চাশ বা বেশী রকমের ছিটের দ্বারা প্রস্তুত। সকল রকমের ছিটখণ্ড স্থচী সূত্রের মাহাত্ম্যে জামারূপে পরিণত হয়। যখন আমরা ঐ জামার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তাহার বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হই, শিল্পীকে বাহবা দিই। কতকদিনের পর, সূত্রের জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রযুক্ত কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ছিট খণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহার প্রকৃত মূল্য বাহির হইয়া পড়ে আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার টুকরা দিয়া একটী জামা প্রস্তত করিয়া ছাত্রের গায়ে দিয়া দেন, দুই দিন পরে যখন তাহাদের মেধা সূত্র ছিন্ন হয়, তখন সেই জামার কিছুই থাকে না। জ্ঞানই যখন জন্মিল না, তখন জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকিবে, কেমন করিয়া ?

পঞ্চম। পূর্ব্বে ছাত্রগণ ইচ্ছামত শিক্ষক বাছিয়া লইতে পারিত। এখন ইচ্ছামত স্কুল বাছিয়া লইতে পারে। স্কুলে তাহার অদৃষ্টে কিরূপ শিক্ষক লাভ হইবে ; তাহা সে জানিতে পারে না। হয়ত স্কুলে প্রবেশ করিয়াই দেখিল শিক্ষক তাহার মনের মত নয়। অগত্যা তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হইল। এইরূপ স্কুল পরিবর্ত্তনও গুরুশিষ্যের সম্পর্ক শিথিলতার কারণ।

ষষ্ঠ। স্কুলে সকল শিক্ষক সমান নয়। দুই একজন শিক্ষক, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "প্রহ্লাদ চরিত্রের" ষণ্ডামর্কের মতও আছেন ; প্রহ্লাদ শিষ্য ত আর সব স্থানে যোটে না, সুতরাং নানা রকম অন্যায় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু দক্ষিণার গুরুতর ঘটার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ শিথিলতার যে কয়টি কারণ দেখাইলাম, ইহার অনেক গুলি টোলে নাই, সুতরাং টোলে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এতদূর শোচনীয় হয় নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে স্কুলেও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক পবিত্র ছিল। মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার, প্যারিচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি অধ্যাপকগণ আজিও ছাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের স্নেহ, মমতা, ছাত্রবৎসলতা, সর্ব্বজন বিদিত। যদি ছাত্রকে আপনার মত দেখিতে না জানি, আপনার মত ভাবিতে না পারি, তবে সেই বা আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে কেন ?

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নানা কারণে শিথিল হইয়াছে দেখাইলাম। উহার কারণ ছাত্রের দোষ, শিক্ষা-প্রণালীর দোষ, শিক্ষকের দোষ, প্রভৃতি সকল প্রকার দোষের সমষ্টি। এই বিষয়ে কতকটা সংস্কার আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ গুরুশিষ্য ভাব ছিল আবার তাহা কর, যে নিয়ম আজিকার দিনে ভাল বলিয়া বিশ্বাস না হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেও, এরূপ কথা আমি বলিতে চাহি না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে আমি বড় ভয় করি। আমি বলি, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা নেহাত ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ বলিয়া বালকগণ যাহাতে মনে না করে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা হিন্দু, এই কথাটা আমাদের মনে রাখা

উচিত। আমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষকের সম্মান করিতে না জানি তবে কেবল যে তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি করিলাম এমন নহে, নিজেরও সম্মান হানি করিলাম। হিন্দু কোন কালে অকৃতজ্ঞ নহেন। যাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান রত্ন লাভ করি, তিনি শত দোষের আকর হইলেও আমার কাছে তিনি পূজ্য, আমার ভক্তির পাত্র। নানা কারণে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতা হইতেছে না বলিয়া, গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান অকৃতজ্ঞের ধর্ম্ম। শিক্ষা কালে গুরু আমাদিগকে এমন অনেক কথা বলেন যাহার একটী কথা পালনে সমর্থ হইলেও আমরা অনন্ত কাল সুখে কাটাইতে পারি। বেদে আছে—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ
স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি।"

একটী শব্দ যদি উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করা যায়, এবং তাহার অর্থগ্রহ করা যায়, তবে স্বর্গে, মর্ত্তে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। কূর্ম্ম পুরাণ বলেন :—

"আত্মনঃ সর্ব্ব যত্নেন প্রাণত্যাগেণ বা পুনঃ
পূজনীয়া বিশেষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা।"

অর্থাৎ মঙ্গলেচ্ছুগণ প্রাণপণে গুরুদের পূজা করেন। অত্রিসংহিতা বলেন ;—

"এক মপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃশিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ একটী অক্ষরও যে গুরু শিক্ষা দিয়াছেন, শিষ্য জগতের কোন বস্তু প্রদান করিলে তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এইরূপ হিন্দুর কৃতজ্ঞতা! সেই হিন্দু কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকৃতজ্ঞতার কালী মুখে মাখিয়া গুরুর অমর্য্যাদারূপ মহা পঙ্কে যাহাতে পতিত হইতে না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কি ছাত্র মাত্রেরই উচিত নয়? কত বার দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের সহিত সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়াছেন, অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিয়াছেন, কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখন ভুলেন নাই; গুরুর অঙ্গে শর বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার পদ বন্দনা করিতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের বিষয় যতই ভাবা যায়, ততই তাহার মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়, ভাবে বিভোর হইতে হয়, গুণের মহিমায় চমৎকৃত হইতে হয়। গুরুকে গুরুর মত দেখিলে, ছাত্রের হৃদয়েও অসীম আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। দাতা দান করিয়া যতদূর আনন্দ উপভোগ করেন, ভিক্ষুক দান পাইয়াও ততদূর আনন্দ পায় কি না

সন্দেহ। তাই বলি, ছাত্রগণ! তোমরা গুরুকে যতদূর সম্ভব সম্মান করিবে, তাহাতে তোমাদের সম্মান বাড়িবে। মনে রাখিও

"অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাৎ শ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥"

অর্থাৎ যে শিক্ষক ছাত্রকে অল্পই হউক বা অধিকই হউক, শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিতে হইবে।

আর মনে রাখিও,—অধ্যাপক তোমাদের অন্যায় ব্যবহার সংশোধনের জন্যই তোমাদের উপর শাসন করিয়া থাকেন,—তোমরা ত অধ্যাপকের পর নও। অধ্যাপকছাত্রদের শাসন করেন, পরের ছেলে বলিয়া শাসন করেন না। নিজের কোন অঙ্গে রোগ হইলে যেরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ তোমাদের দোষ সংশোধনের জন্য শাসন করেন। যে ছাত্রের মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, সন্তোষের চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি, তাহার সহিত কি ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ? যাহার দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, যাহার কথা শুনিলে কাণ জুড়ায়, যাহার উন্নতি শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, যাহাদের সহিত কথোপকথনে স্নেহময়ী জননীর কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাই, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কি ক্ষণভঙ্গুর?

ধরণী ও রমণী।

বঙ্গ ধরণীর প্রধানত দুই মূর্ত্তি, বাসন্তী মূর্ত্তি ও প্রাবৃট্ মূর্ত্তি। বঙ্গরমণীরও প্রধানত দুই মূর্ত্তি—সেইরূপ বাসন্তী মূর্ত্তি ও প্রাবৃট মূর্ত্তি।

শীতের অবসানে হিমের তেজ কমিয়া আসে দিঙ্মণ্ডল ক্রমশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়, গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ পরিস্ফুট হয়, চারিদিকে তাহাদের বিমল ও কোমল জ্যোতি বিভাসিত হয়। শীতে তরু লতা পত্র-পুষ্প শূন্য ছিল, অনেক গাছ একেবারে ডাঁটা সার হইয়া দীন হীন বেশে জীর্ণ

রোগীর মত অস্থি পঞ্জর লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসন্তাগমে যেন তাহারা কোন মোহিনী শক্তিবলে পুনরুজ্জীবিত হইল, আবার যেন মৃত শরীরে রক্ত সঞ্চার হইল, নূতন নূতন নানা রঙ্গের পাতা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে সাদা সাদা, লাল লাল ফুলের কুঁড়ীগুলি উঁকি মারিতে লাগিল। যে উত্তরীয় বায়ু স্পর্শে শরীর জড়সড় হইত, আজ আর সে উত্তরীয় বায়ু বহিতেছে না, এক্ষণে মৃদুমন্দ মধুর মলয় মারুতের কাল পড়িয়াছে। তবে মাঝে মাঝে অনেক দিনের পুরাতন সদ্ভাব ভুলিতে যেন না পারিয়াই, উত্তরীয় বায়ু সময়ে সময়ে এক একবার দেখা দিয়া যান। কিন্তু অসময়ে আসিলে এমনি হয়, দেখিবামাত্র ধরণী আপনার বদনমণ্ডল কুজ্ঝটিকা অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন। এইরূপ দিন কতক চলিয়া গেলে উত্তরীয় বায়ু আর বড় দেখা দিতে সাহস করেন না। এক্ষণ দক্ষিণাবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে। গায়ে লাগিলে শরীর শীতল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু যখন সায়ংকালে কাল বৈশাখী বেশে, কখন ঘোর ঘূর্ণী বায়ুরূপে, কখন ভীম ঝঞ্ঝাবাতরূপে আসিয়া সমুপস্থিত হয়, তখন বড়ই ভয়ানক; আবার কখন বৃষ্টিপাত, কখন করকাঘাত—সেইটীই আরও ভয়ানক।

বসন্তকাল ফুলের রাজত্ব সময়; নানাবিধ ফুল, চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চারিদিক আকুল করিয়া তুলে, যেমন শোভায় তেমনি গন্ধে, হৃদয় মন আনন্দে ভরপুর করিয়া তোলে। বাগানে, মাঠে, জঙ্গলে, বনে, যেখানে তাকাইবে সেইখানেই ফুল। চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া প্রকৃতিদেবী যেন ফুল ক্রীড়ায় বিভোর। অনেক গাছে আজও পাতা দেখা দেয় নাই কেবল ফুলে আচ্ছন্ন; কোনটী কেবল সাদা, কোনটী কেবল লাল। গ্রামে আমের মুকুল, বনে শাল পিয়ালের মুকুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে পূর্ণ করে। বসন্তে ধরণী ফুলময়ী—ধরণী শোভাময়ী—ধরণী গন্ধময়ী। কেবল এই টুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে বসন্ত বর্ণনা ফুরায় না। বসন্তের অপর অঙ্গ কোকিল, পাপিয়া, দহিয়াল, ভ্রমর প্রভৃতির সুমধুর শব্দ। যখন নবরাগভরে নবকিশলয়মধ্য হইতে কোকিল পরদায় পরদায় আওয়াজ চড়াইতে থাকে, পাপিয়া, দহিয়াল প্রভৃতি প্রত্যূষে ক্রমোন্নতি সহকারে ডাকের উপর ডাক ছাড়িতে থাকে, ভ্রমর আম বা শালের মুকুলের ভিতর দলবদ্ধ হইয়া গুণ্ গুণ্ রবে সুর ধরিতে থাকে, তখন মন বিভোর করিয়া তোলে। আপনা আপনি বিস্মৃত হইতে হয়। অমনি যেন বোধ হয় ধরণী এক নূতন সাজে নূতন আওয়াজে মোহিনী

মূর্ত্তিতে আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং বসন্তের ধরণী ফুলময়ী—ধরণী শোভাময়ী—ধরণী গন্ধময়ী—ধরণী মধুর শব্দময়ী।

আর বর্ষায় ধরণীর আর এক বেশ। এখনও সেই দক্ষিণাবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে, তবে বসন্তের মত সময়ে সময়ে উত্তরের বায়ু আর দেখা দেয় না; মাঝে মাঝে পূর্ব্ব হইতে বায়ু বহিতে থাকে তাহাতে শরীরে জড়তা আনিয়া দেয়, মনের স্ফূর্ত্তি হানি করে, কিন্তু বসন্তের উত্তরের বায়ুর মত ইহাতে ধরণী কুজ্ঝটিকাচ্ছন্না হয় না। বসন্তের ঘূর্ণাবায়ু, বসন্তের কাল বৈশাখী, বসন্তের ঝঞ্ঝাবাত, বসন্তের করকাপাত এখন এ সকল কিছুই নাই। এখন সময়ে সময়ে অজস্রধারে বারি বর্ষণ হয় আর কখন কখন আকাশমণ্ডল রোষপরবশ হইয়া বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত দেখাইয়া আমাদিগকে ভয়ে জড়সড় করেন। বসন্তে ধরণী ফুলময়ী, বর্ষায় ধরণী ফলময়ী। কিন্তু তা বলিয়া বর্ষায় ফুল ফুটে না, বলিলেও চলিবে না। যে কালে জলে কমল কুমুদ কহ্লার, স্থলে কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, সে কালে ধরণী ফুলসৌভাগ্য হীনা এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে এখন ফুলে সে রঙ্গের চটক নাই, সে গন্ধের উন্মত্তকারী তেজ নাই। বর্ষায় ধরণীর বেশভূষার আর একটু প্রভেদ,—বসন্তে ধরণী নানা রঙ্গে সুসজ্জিত, বর্ষায় ধরণী আগা গোড়া ভরপুর সবুজে ঢাকা, মাঝে সাদা সাদা বড় বড় ফুল। যেন মা নিজের আনন্দ নিজে রাখিতে না পারিয়া খল খল রবে হাসিয়া বিহ্বল। এই টুকু বড়ই শোভাময়। বর্ষায় নদী খাল বিল সমস্তই জলে ভরপুর। কূলে কূলে জল। এখন অল্প জল লইয়া কুল কুল করিতে করিতে নদী প্রবাহিত নহে, এখন জল প্রাচুর্য্যে গম্ভীরভাবে একই মনে একই গতিতে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছেন। এখন আর নদীর জোয়ার ভাটা নাই, কেবলই এক টানা ভাটা অভীষ্টাভিমুখে অনন্যমনা অনন্যপন্থা হইয়া চলিয়াছে। তার পর বর্ষায় আর একটী কথা আছে—শব্দ। বর্ষার শব্দ মধুর কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় মন বিভোর করিয়া তোলে। যিনি কখন নিশীথ সময়ে নদী বক্ষে থাকিয়া নদীর তীব্র বেগের ভিতর হইতে একটী অতি মহান্ গম্ভীর শব্দ অনুভব করিয়াছেন, যিনি কখন বজ্রের কড় কড়ানি, বৃষ্টির তড় তড়ানি বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের একত্র সংস্থানে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, যিনি কখন শস্য ক্ষেত্রে খাল বিল হইতে অনন্ত কীট পতঙ্গের অজস্র একতান লয়যুক্ত স্বরের সহিত সহস্র জলচর বিহঙ্গের কলরবে বিমোহিত হইয়াছেন,

তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বর্ষায় ধরণীর যে শব্দ, তাহা মধুর না হইলেও মহান্ বটে কিনা, হৃদয় মন বিভোর করিতে পারে কি না। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বসন্তে ধরণী মাধুর্য্যময়ী, বর্ষায় গাম্ভীর্য্যময়ী।

যুবতীরও দুই মূর্ত্তি; নবমুকুলিতা বাসন্তী তরুণী মূর্ত্তি, ও ক্ষীর-ভর-পয়োধরা গণেশ জননী মূর্ত্তি। প্রথম মোহিনী মূর্ত্তিটীতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাবণ্যময় প্রস্ফুটিত। অঙ্গের আভায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত, নয়নের জ্যোতিতে চারিদিক চমকিত, কণ্ঠের সুমিষ্ট স্বর বেণু বীণা বিনিন্দিত। সেই পৃষ্ঠ পরিপূরিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই নয়ন—চঞ্চলতা পরিপূর্ণ, সেই ললাট—চিন্তাচিহ্ন বিরহিত। সেই ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বর, সেই অঙ্গ জ্যোতি; সেই অশন বসনে ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায় বিলাসের আবেশ, আসুরক্তির লক্ষণ। আবার বসন্তের আকাশের মত সময়ে সময়ে অভিমান জনিত রোষ—সুবিমল বদন সুধাকরকে ঘোর ঘনাচ্ছন্ন করে। শীত ঋতুর উপশমে যখন হিমের চিহ্নমাত্র আর না থাকে, তখন সুনীল, সুবিস্তৃত নভোমণ্ডলে সেই পৃষ্ঠ পরিপূরিত, সুদূর বিলম্বিত কেশরাজি প্রত্যক্ষ করি। গ্রহ নক্ষত্রের জ্যোতি হিমের অবসানে পরিস্ফুটিত, চন্দ্র সূর্য্য কিরণ শীতব্যত্যয়ে আবার তেজোময়, চারিদিকেই প্রকৃতি নিজের কোমল আভা দেখাইয়া—তরুণীর অঙ্গ জ্যোতি মনে পড়ান। এই জ্যোতি, এই তেজ,—নিদাঘের জগৎ দাহনকারী প্রখর সূর্য্যকিরণ নহে, ইহাতে কোমলতা মূর্ত্তিমতী, এই জ্যোতিতে চক্ষু জুড়ায়, হৃদয়ে শান্তি হয়। আবার বসন্তে চারিদিকে নূতন নূতন পত্র পুষ্প বিকশিত, সঙ্গে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। এই প্রস্ফুটিত পুষ্প রাজি মধ্যে তরুণীর সুস্নিগ্ধ হাসি দেখিতে পাই। কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি যখন জীলের উপর পরদায় পরদায় আওয়াজ চড়ায়, তখন তাহাদের সেই হৃদয় রঞ্জন মধুর স্বর শুনিয়া আর একটি হৃদয় আনন্দ কারিণী সুমিষ্ট ধ্বনি মনে পড়ে। বসন্তাগমে যখন সময়ে সময়ে মেঘখণ্ড আসিয়া সেই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য সমাচ্ছন্ন করে, তখন মনে হয় সেই হৃদয় আনন্দকারী মনোহর বদন রোষের আবেশে সমাচ্ছন্ন। বসন্তেও যাহা দেখিতে পাই তরুণী মূর্ত্তিতেও তাহাই দেখি,—সেই ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, মধ্যে মধ্যে দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টিপাত, আবার কখন কখন বা করকাঘাত।

তার পর আর একটি মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটিকে আমরা গণেশ জননী মূর্ত্তি বলিয়াছি। এখনও যৌবন আছে, কিন্তু যৌবনের আর সেই বিলাস বিভ্রম

নাই। অঙ্গে জ্যোতি আছে, কিন্তু এখন সে জ্যোতি প্রশান্ত ও শীতল। নয়নের সে চপলতা নাই বরং তৎপরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ অনুভূত হয়। এখন সেই সুন্দর ললাটে একটু একটু চিন্তার চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে আনুরক্তির বিলক্ষণ আবেশ আছে; কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই আনুরক্তি, আর এই বর্ত্তমানাবস্থার আনুরক্তির ভিতর একটু বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। প্রথম বয়সের আনুরক্তি স্বার্থান্বেষিণী, স্বার্থময়ী, আর পরিণত যৌবনার আনুরক্তিতে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। ইহা ছাড়া এই মূর্ত্তিতে আর একটি জিনিস আছে—সেটি তেজ। "তেজ" বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি, এ তেজ সে তেজ নহে,—এ তেজ অঙ্গের জ্যোতি নহে, রূপের মোহিনীশক্তি নহে, অপাঙ্গ দৃষ্টির অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নহে। এ তেজ অন্যরূপ, কি তাহা পরে বলিব। তাহার পর সেই পূর্ব্বের ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বর যাহাতে এত মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা এক্ষণে গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে পরিণত, এখন আর সে কোকিল পাপিয়ার ঝঙ্কার নাই, এখন কণ্ঠের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, আওয়াজ ভরাট হইয়াছে—শুনিতে বেশ গম্ভীর, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর। প্রকৃতি প্রতি বর্ষায় আমাকে এই শেষোক্ত অতীব মোহিনী মূর্ত্তিটী দেখাইয়া যান। নব যৌবনা ছাড়িয়া পরিণত যৌবনার রূপের মাধুর্য্য, অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু আমি এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটীতে, এই গণেশ জননী মূর্ত্তিতে যতদূর মোহিত হই, নব যৌবনা তরুণী মূর্ত্তিতে আমাকে এতদূর বিমোহিত করিতে পারে না। সেইজন্যই বর্ষায় আমার মন বেশী আকৃষ্ট। বসন্তের কথা চারিদিকে শুনি বটে, বসন্তের শোভা সম্পদ চারিদিকে দেখি বটে, বসন্ত বর্ণনা সকল কবির রচনায় পড়ি বটে, কিন্তু বসন্তে কেমন একটা ফাকা ফাকা লাগে; বর্ষায় যেন সৌন্দর্য্য পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়—সে ফাকা ফাকা ভাব থাকে না—সমস্তই গম্ভীর—সুন্দর—মধুর।

বসন্তের বায়ু মৃদুমন্দ মধুর মলয় মারুত বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহাতে ঘূর্ণী বায়ু আছে, তাহাতে কালবৈশাখী আছে, ঝঞ্ঝাবাত আছে। বসন্তের বায়ুর মত তরুণীর ভালবাসা টলমল করে, কখন কমে, কখন বাড়ে, কখন সে ভালবাসায় কালবৈশাখী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ষার একটানা গঙ্গার মত পরিণত যৌবনার প্রেম চিরদিন একই মুখে, একই গতিতে প্রবল বেগে চলিয়াছে। চিরদিন ভরপুর, তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি নাই,

জোয়ার ভাঁটা নাই। মাঝে মাঝে তুফান আছে বটে, কিন্তু তখনও তরঙ্গ সমুদ্রাভিমুখী।

তার পর বসন্তের নৈসর্গিক শোভার কথা—চারিদিকেই নব বিকশিত কুসুমকিশলয়—শোভা ধরে না। এখানে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলি ফুটিয়া বায়ুতে গন্ধসঞ্চার করিতেছে, ওখানে নবমুঞ্জরিত বনপাদপ ধূপছায়ার নামাবলি গায়ে মহাযোগীর মত গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান, চারিদিকেই মধুর শব্দ, মনোহর শোভা। কোথাও সাদা সাদা ফুল, কোথাও লাল লাল পাতা। ইহাতে রমণীর সেই প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ায়; সেই বেশভূষার চটক আর সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্য। তার পর বর্ষার দিকে দেখুন। ফুল পাতার সে চটক নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। তরুণী বাসন্তী গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙ্গে ছোপান কাপড় পরিয়া মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করেন, কিন্তু প্রাবৃট রূপিণী ধরণীকে আগা গোড়া সমান ভাবে ভরপুর সবুজে সুসজ্জিত দেখিলে আরও বিমোহিত হইতে হয়। বসন্তে ছোট ছোট মল্লিকা যুঁয়ের ন্যায় ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন মাত্র যে অঙ্গে বিরাজ করিত, বর্ষার সে বদন প্রফুল্ল কমল কুমুদের বিকশিত হাস্যে পরিণত। এখন আর সে চাপিয়া চাপিয়া ভয়ে ভয়ে বা ভাব বিভোরে মুচকি হাসি নাই, এখন বর্ষার সরল প্রাণে মনের আনন্দ প্রাণ ভরিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনের প্রারম্ভে তরুণীর আনুরক্তি স্বার্থান্বেষী, স্বার্থময়ী। তিনি আপনার সুখের জন্য যাহাকে সুখী করিতে হয় করেন; কিন্তু বয়স একটু পরিণত হইলে সে স্বার্থ ভাবটুকু কাটিয়া যায়, তখন আনুরক্তি এক পাত্রে আবদ্ধ থাকে না, ছড়াইয়া পড়ে; ক্রমশ পরিবারবর্গ, দাসদাসী, প্রতিবেশী, স্বদেশীতে, তারপর পিতৃলোক, দেবলোকে সে আনুরক্তি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। আনুরক্তি, প্রেম, ভক্তির ভালবাসার এইরূপ বিকাশ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।

আর একটী কথা আছে। তরুণী সারা দিন আপনার অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে তৎপর। প্রাতঃকাল হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত কিসে তাঁহার শারীরিক শোভা বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই চেষ্টাতেই নিমগ্ন। কখন সাবান বা সর বেশম,. কখন বা ফুলেল কি গোলাপী তেল মাখিতেছেন, কখন পমেটম ল্যাবেণ্ডার ব্যবহার করিতেছেন, কখন মাথা বাঁধিতেছেন, টিপ কাটিতেছেন, অঙ্গের ধূলাটী

ঝাড়িতেছেন, গাত্রমার্জ্জনী সঙ্গে সঙ্গে আছে। বস্ত্রাঞ্চল কোথায় রাখিলে, কিরূপ বেশ ভূষা করিলে, কতদূর শোভা হয়, সারা দিন সেই ভাবনাতেই ব্যস্ত। এই এক ভাব। তার পর কিছুদিন গত হইলে, যৌবনের একটু পরিণতি হইলে, দুই একটী সন্তান জন্মিলে, আর একভাব। এখন আর সে অঙ্গ সৌষ্ঠবে যত্ন নাই, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য কমে না। এখন যেন অসাবধানতাতেই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। মাথার চুল রুখু রুখু হইয়া উড়িতেছে, মাথা বাঁধিবার যত্ন নাই, কেহ জোর বা যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিল, তা হইলে হইল; নচেৎ চুল আর বাঁধা হয় না। স্নান না করিলে নয়, তাই স্নান করা। দেহে যত্ন নাই, পোষাকের চটক নাই, কিছুতেই যেন আর মনোযোগ নাই। এখন নিজের ভাবনা আর আপনাকে ভাবিতে হয় না, এখন তাঁহার ভাবনা অনেকে ভাবেন, বাড়ীর বৃদ্ধতম কর্ত্তা মহাশয় হইতে পরিচারিকা দাসী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার ভাবনা ভাবেন; তিনি এখন সংসার পবিত্র কারিণী, সাক্ষাৎ সাবিত্রী, বর্ষার ধরিত্রী। বর্ষায় বৃষ্টি হইয়াছে বা অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে, ভূস্বামী ও কৃষক সকলেই ক্ষেত্রের ভাবনা ভাবিতেছেন, জল অধিক দাঁড়াইলে শস্য নষ্ট হইবে, আইল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোথাও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ফসল শুকাইয়া যাইবার ভয়ে জল সেচনের বন্দোবস্ত হইতেছে। সকলেই ক্ষেতের ভাবনা ভাবিতেছেন, কোথায় ঘাস হইয়াছে নিড়াইতে হইবে, কোথায় কিরূপ করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি হইবে,—সকলেই সেই ভাবনায় ব্যস্ত। ওদিকে কর্ত্তা মহাশয় প্রাতে উঠিয়া গৃহিণীকে বলিতেছেন, "কাল রাত্রিতে খোকা দুই বার কাশিয়াছিল, বৌমাকে জল ঘাঁটিতে দিও না, বাসী বা পান্তাভাত যেন না খান," ওদিকে পরিচারিকা আসিয়া বলিতেছে "বৌদিদি খোকার আবার অসুক করিবে, তুমি কাপড় ছাড়িয়া দেও, কাচিয়া দি।" যাহাতে তাঁহার সময়ে স্নান আহার হয়, শরীর সুস্থ থাকে, সকলেই সেই ভাবনায় ব্যস্ত। সকলেই এই গণেশ জননীর সেবায় নিরত। তাঁহাকে আর আপনার ভাবনা নিজে ভাবিতে হইবে কেন? তাঁহারও এখন নিজের সুখান্বেষণ নাই। তিনি পূর্ব্বে যখন তরুণী রমণী ছিলেন, তখন মানবী, এখন গণেশ জননী, সংসার পবিত্রকারিণী দেবী হইয়াছেন। বসন্তের ফুলে মুকুলে কিসসয়ে দেবার্চ্চনা হয়, কিন্তু বর্ষার "শস্য শ্যামলা" ধরণী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী, পরমারাধ্যা দেবতা। বসন্ত ও বর্ষায়, নব মুকুলিতা বাসন্তী তরুণীতে ও ক্ষীর-ভর-পয়োধরা গণেশ জননীতে এই ভেদ। একজন পরের পূজার উপাদান, অপর স্বয়ং অর্চ্চনীয়া।

তার পর শেষ কথা, পূর্ব্বে যে কথা বলিতে ছিলাম—তেজ। তরুণীর যদি কিছু তেজ থাকে, সে কেবল এক জনের উপর; গণেশ জননীর তেজ সকলের উপর সমান। বর্ষায় ধরিত্রী দর্পভরে বলিতে পারেন—"এখন আমি বসন্তের ন্যায় বাহ্যিক শোভাশালিনী নহি, কেবল শোভা দেখাই না, গন্ধ ছড়াই না। এখন আমি জীব লোকের জীবনরূপিণী। এই বক্ষে অসংখ্য শস্য ক্ষেত্র ধারণ করিতেছি, ইহা সমস্ত জীব লোকের জীবনের উপাদান। আমি আছি বলিয়াই তোমাদের সকলের উপায় হইতেছে।" গণেশ জননী বক্ষে শিশু পুত্র ধারণ করিয়া তেমনি দর্পভরে বলিতে পারেন, "আমি এখন বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহি, এই দেখ আমার সোণার চাঁদ সাত রাজার ধন, তোমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। এই বিশুদ্ধ তেজশালিনী দর্পময়ী, অথচ বিনয়াবনতমুখী দেবী, শোভায় বল, আভায় বল, সকলদিকেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তা, গাম্ভীর্য্যে গৌরবিণী।

পাঠক,—তোমার বয়স কত? তুমি বসন্তের মাধুর্য্যই বুঝিয়াছে, বর্ষার গাম্ভীর্য্যে এখনও মজ নাই কি?

সখী সম্বাদ।

শুনিতাম যথা তথা—
অতি সে পবিত্র কথা—
বঙ্গ ধামে অতি পুরাতন;
পিরীতি পিযূষে ভরা,
অতীব সে মনোহরা,
পুরাতনে নিতুই নূতন।

কে ক'বে হে পুনরায়
শুনাইবে সে গাথায়,
শ্যাম-প্রেম লালসা লাঞ্ছিত;
সুধা সিন্ধু প্রমথিয়া
বিন্দু মাত্র উঠাইয়া,
কে বাঁচাবে পরাণ মূৰ্চ্ছিত?

গিয়া সেই দ্বারকায়,
ভেটিয়া সে শ্যামরায়,
কে কবে হে সে সখী সম্বাদে ;
পাষাণ গলিত হবে,
ময়ূরী নাচিবে রবে,
শক্তি পাবে মহাশক্তি রাধে।

"হে যোগী উদ্যোগী বর!
দুর্যোগে যন্ত্রণা হর,
অনুদিন করুণা ভিখারী"!
প্রেমগুরো গুণধর!
হে মহামহিম বর,
শক্তিধর নিকুঞ্জবিহারী।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে,
তুমি হে বিশ্বের নেত্রে,
সুনিষ্কাম ধর্ম্ম অবতার!
হে রাখাল হে ভূপাল,
অনাদি অনন্তকাল,
হে নবীন প্রবীণ রাধার।

হে শ্রীমান্, হে ধীমান্,
মহিমায় হে মহান্,
হে মহাপুরুষ মমতায়!
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু,
দীনবন্ধো এক বিন্দু
দেহি নাথ দেহি রাধিকায়।"

বলি সখী যোড় করে,
যেন অভিমানভরে,
সমীরণ ভরে যেন নবকিশলয়,

মৃদু কাঁপি থর থর
সে বিনোদ কলেবর,
বলে "এবে কি হবে হে হরি দয়াময়!

যে দেখিনু দশা তার,
হয়েছে পঞ্জর সার,
শুকাইয়া স্বর্ণলতা কালিমা বরণ,
বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তায়,
ভুলে আছ ভুলিয়াছ মদনমোহন!

তাকাইয়া আশাপথে
জীয়ে আছে কোন মতে,
হা কৃষ্ণ! হ' কৃষ্ণ! বলি করিছে রোদন
তোমার কি মনে নাই,
সে প্রকৃতি সেই ঠাঁই,—
অনুদিন অনুগতে রক্ষ নারায়ণ!

গোঁয়ার গোপের দলে
নিরন্তর কেলি ছলে,
কত প্রলোভনে সতী ভুলাইতে চায়;
মরমে মরমে মরি,
তুয়া মুখ চাহি হরি
কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র আছে রাধিকায়।

আছে বটে অবিকল,
তুঁহারি যমুনা জল,
সে কেলি কদম্বতল অতল প্রেমের,
আছে ধীর সমীরণ,
মধুবন নিধুবন
কিন্তু নাই কান্তি সেই কষিত হেমের।

বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তায়,

যমুনার কিনারায় শূন্য বৃন্দাবন!
মরুভূমি লীলাভূমি,
হে শ্যাম ভুল না তুমি!
দয়া করি রাধিকায় দাও দরশন।

হবে কি সে দিন আর,
ঘুচাইবে অন্ধকার,
তুঁহারি সে বৃন্দাবনে দুরন্ত দুর্দ্দিন?
অমিয়া বচন শুনি
পীরিতি পাইয়া পুনি,
লভিবে তুঁহারি রাধা জীবন নবীন।

বৃন্দাবন রসশূন্য;
ম্লান মনে ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ,
বৃন্দাবনবাসী সবে বিচ্ছেদে বিধুর;
সবে স্তুতি গীতি গায়,
কবে কৃষ্ণ করুণায়,
পরাইবে শ্রীরাধায় কম কহিনুর।

তবে রাজরাজেশ্বরী
ভূলোক আলোক করি,
বিরাজিবে বিনোদিনী নিকুঞ্জ বিহারে;
ঘুচে যাবে যমভয়,
সখীরা গাহিবে জয়,
জয়দেব বিদ্যাপতি মধুর ঝঙ্কারে।

সে সঙ্গীতে দেবতায়
শুনিবে হে শ্যামরায়!
রাঙ্গাপায় রুণু ঝুণু নূপুরের রোল;
ময়ূরী নাচিবে রবে,
যমুনা উজান ববে,
অন্তরে বাহিরে হবে হরি হরি বোল।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

দামিনী। সংস্কৃত পড়িবে বলিয়াছিলে; কৈ পড়িতেছ কি?

যামিনী। না ভাই পড়া হইল না। বর্ণ ও বানান শিখিয়াছিলাম।

দামিনী। তবে বই পড়িলে না কেন?

যামিনী। একখানি প্রথম ভাগ ঋজুপাঠ বই কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তা কিন্তু পড়া হইল না।

দামিনী। কেন?

যামিনী। পড়িলাম—"কস্মিংশ্চিৎ বনে"-তার পর দেখি—বড় ঠাকুরের কথা—আর কেমন করে পড়ি বল?

বিনয় বচন।

বৃন্দাবন বাবু বড়ই বিষম উদ্ধত স্বভাবের লোক। নবীন তাঁহার মোসা-হেব, একদিন কথায় কথায় বলিল "বৃন্দাবন বাবু কাজে বড় দক্ষ ও যোগ্য।" বিনয় কথাটা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিল। নবীন বলিল, "হাসিলে যে?" বিনয় বলিল, "বৃন্দাবন বাবু কাযে বড় দক্ষ ও যোগ্য, তা বলতে পারি না—তবে কাজে দক্ষযজ্ঞ করেন বটে।"

কুঞ্জ-বিহারী।

মাষ্টর কুঞ্জলাল বাবু পঞ্চাশ বছর বয়সে হুগলি কলেজ হলে এল, এ দিতে-ছেন। না দিলে, বি এ দিতে দেয় না; বি এ না দিলে, পদোন্নতি হয় না। একটার অবকাশ সময়ে কুঞ্জ বাবু মালীর ঘরে তামাক খাইতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের পাড়ার আর একজন পরীক্ষার্থী বিহারী বাবুও উপস্থিত। কুঞ্জ বাবুকে দেখিয়া বিহারী কুণ্ঠিত হইলেন। কুঞ্জ বাবু হাসিতে হাসিতে বলি-লেন "হে বিহারী আমাকে আর সমীহ কেন ভাই? এখন আমরাত এক সূর্য্যেই ধান শুকাই!" বিহারী মস্তক নত করিয়া বলিল "আজ্ঞে হাঁ তা এক সূর্য্যে ধান শুকাই বটে, তবে আমরা সকালে, আপনি বৈকালে!"

কৃষ্ণ-ভক্তি।

রোগী। ডাক্তার কৃষ্ণ বাবু এখনও আসিতেছেন না?

বন্ধু। সেদিন কামারপাড়ার যে রোগীটাকে তত ডাকাডাকি করিয়াও জবাব পান নাই, আজি তাহাকেই ঔষধ খাওয়াইতে বিব্রত হইয়াছেন।

রোগী। তবে এবার সে কৃষ্ণকে জবাব দিবে।

আসাম—শিলং।

শিলং আসামের রাজধানী। স্বয়ং চীফ্ কমিসনর বাহাদুর এখানে সদলে বাস করিয়া থাকেন। ইহা অতি দূর খাসিয়া পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নানা যানে, নানা উপকরণে, এখানে আসিতে হয়। পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিতে তিন সপ্তাহ, সময়ে সময়ে বা ততোঽধিক কাল লাগিত; আজ কাল ইংরাজ-রাজের প্রসাদে, চারি দিনেই আসা যায়, তবে কিঞ্চিদধিক ব্যয়-সাধ্য,—ব্যয়ের লাঘব করিতে গেলে ৮ দিন লাগে। কলিকাতা হইতে ধুবড়ি পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের বন্দোবস্তে আসা যায়, ইহার মধ্যে নানা স্থানে গাড়ি ও ষ্টীমার বদ্‌লাইতে হয়। ধুবড়ি হইতে গৌহাটী কলিকাতাস্থ ম্যাক্‌নীল কোম্পানীর ষ্টীমারে আসিতে হয়, এই ষ্টীমার ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। গৌহাটীতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যাদেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত—সহর হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় তিন মাইল। আসাম-প্রবাসী বঙ্গবাসীমাত্রেরই এই পবিত্র তীর্থ দর্শন করা উচিত। গৌহাটী ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে আগমন কালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপুর হইতেই এই কল-কল-নাদী অনন্তকাল প্রবহমান মহানদের অবিচলিত তরঙ্গ-শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। পরশুরামের অভিসম্পাতে ইহার জল হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র নহে, কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন—বাসন্তী মহাষষ্ঠীর দিন—ইহাতে স্নান প্রসিদ্ধ। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল, এইটুকুই পার্ব্বত্য পথ। এ পথে পর্ব্বতবিহারী অশ্বযান টোঙ্গায় আসাই সুবিধা; এতদ্দ্বারা ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে এই সুদীর্ঘ পথ আসা যায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ—এক জন মাত্র আরোহীর ভাড়া ৩০৲ টাকা, মালপত্রের জন্য পৃথক্ মাশুল দিতে হয়। প্লাণ্টার্স্ ষ্টোর্স্ এণ্ড এজেন্সী কোম্পানী লিমিটেড্—নামক কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ব্বে ইহার ঠিকাদার ছিলেন; সম্প্রতি (জনাই নিবাসী) অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হায়দার ও তাঁহার পুত্রগণ ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহেবদিগের সময় কিছু স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য ছিল; অধুনা এই বঙ্গবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতায় এই যাতায়াতের পথ সুবিধাজনক হইয়াছে; ইঁহারা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন এবং আরোহীবর্গের সুখসচ্ছন্দতা বিধানে সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করেন না। অধিকন্তু

৩০৲ টাকা ভাড়া দেওয়া অনেকের অবস্থাতীত বোধে ইঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট লোকদিগের জন্য ১৫৲ টাকা ভাড়া স্থির করিয়া অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ পথে আসার অন্যতম উপায় গো-যান; পরিবারাদি লইয়া আসার পক্ষে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এতদ্দ্বারা আসিতে অন্যূন চারি দিন লাগে। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য—৪।৫ টাকা ব্যয়েই আসা যায়।

আসামের মধ্যে শিলং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান। পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তবিনোদনকারী; চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী শৈলমালা সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া বিরাজমান—মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকা, বনজ বিহঙ্গের কাকলি, নির্ঝরের কুল-কুল-ধ্বনি—বড়ই শ্রুতিসুখাবহ। এখানকার জলবায়ুও আসামের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিকর; অন্যত্র সকল স্থানেই নানারূপ পীড়া দেখা যায়—এখানকার লোক একরূপ রোগশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে পর্ব্বত-সুলভ প্রাকৃতিক শৈত্য চির দিন বিরাজমান; শীতের সময় নবাগত লোকের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সিমলা বা দার্জ্জিলিঙ্গের মত শীতের মাত্রা প্রখর নহে। বর্ষার ভাগও এখানে অধিক; চিরাপুঞ্জি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষাপ্রধান স্থান। ইহার নিকটে অবস্থিত বলিয়াই—এখান হইতে চিরাপুঞ্জি ৩৩ মাইল—বোধ হয়, এখানে এত বর্ষার প্রকোপ; বর্ষার সময়েও অত্রত্য অধিবাসীবর্গের কিঞ্চিদধিক ক্লেশ হয়, তবে এক সুবিধা, এখানে কর্দ্দমের যন্ত্রণা নাই; বৃষ্টিধারা বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরেই পথ পূর্ব্ববৎ শুষ্ক, বরং অধিকতর সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত। বৈশাখে এখানে বসন্ত, নিম্নবঙ্গে মাঘের শেষে ও ফাল্গুনের প্রথমে যেরূপ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব, যেমন একটু প্রাণ-ভুলানি, মন-মজানি ফুর-ফুরে বায়ু, প্রকৃতির যেমন একটু মন্মোহন দৃশ্য, এখানে বৈশাখ সেইরূপ। শিলংএর অতিদূরে দুই মাইলের মধ্যে একটী জলপ্রপাত আছে; ইহা বিডন্ ফল্ নামে প্রসিদ্ধ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে তুষার-ধবল বারিপুঞ্জ অবিরাম গতিতে নির্ঝরিত—প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ ভাব দর্শকের বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক। শিলংএর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও স্বভাবের অন্যতম মহৎ নিদর্শন; শুনা যায়, ইহার উপরিভাগ হইতে ব্রহ্মপুত্রকে একটি সূত্রখণ্ডের ন্যায় দেখা যায়।

এখানে ইদানীং সভ্যতার ও বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই আছে।

লাটের রাজভবন (চীফ্ কমিসনরের রেসিডেন্সি) বিলাসীর বিলাস-কানন; ক্রীড়োন্মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের প্রার্থনা-স্থান—কিছুরই অভাব নাই। ইংরাজ-উপভোগ্য সকলই আছে; ডাকঘর, তারঘর ত থাকিবেই, হোটেল, চিত্র-শালা, গির্জ্জা, গোরস্থান—বালক বালিকা বিদ্যালয়, মিসনস্কুল প্রভৃতি পাঠের বন্দোবস্তও আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকের যত্নে এখানে ইংরাজী পড়িবার রিডিং ক্লব, বাঙ্গালার সাহিত্য সভা, বঙ্গ-বালিকা-বিদ্যালয়, উপাসকের ব্রহ্মমন্দির, আমোদপ্রিয়ের নাট্যশালা, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা নিরতিশয় প্রশংসার কথা। সকলই আছে, কিন্তু একটী প্রধান জিনিস নাই—পরস্পর ঐক্য বা মনের প্রীতি এখানে সম্পূর্ণ বিরল; প্রবাসীর মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান, শ্রীহট্ট, আসাম ও ঢাকাঞ্চল নিবাসী লোকই অধিক; ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, একস্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিন্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালীর এ কলঙ্কে প্রায় সর্ব্বস্থান কলুষিত; একতার অভাবে বঙ্গভূমি অনুক্ষণ লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও বিদলিত হইতেছে—ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসী একতা শিখিতে চেষ্টা করিলেন না, ইহা সামান্য পরিতাপের কারণ নহে। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক কতদিনে ঘুচিবে অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। ঐরূপ সভ্যতানুমোদিত নানারূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিয়া, অত্রত্য প্রবাসীগণ যদি পবিত্র একতার সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা হইলে সমাজের গৌরব রক্ষণ হইত, দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইত, অন্তরে শান্তির সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত।

এখানকার আদিম অধিবাসী খাসিয়া জাতি। পূর্ব্বে ইহাঁরা নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। অধুনা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ রেবরেণ্ড জার্ম্মাণ জোন্স মহোদয়ের শিক্ষকতা গুণে এবং ইংরাজ ও বঙ্গবাসীর সংঘর্ষে সভ্যতার সুন্দর মূর্ত্তি ইহাঁদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। অত্যল্প কালের মধ্যে ইহাঁরা যে পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কালে ইহাঁরা সভ্যতার ও সৎশিক্ষার শীর্ষস্থানে উঠিবেন, এরূপ সহজেই আশা করা যাইতে পারে। বলিতে কি, উপরোক্ত জোন্স্ সাহেবই ইহার অন্যতম নিয়ন্তা। তাঁহার নিকট শিক্ষিত খাসিয়া মাত্রই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এমন কি অনেকে তাঁহাকে পিতা ও গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন; বস্তুত তিনি সেইরূপ ভক্তির পাত্র।

আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্ম্মানুভূতি নিতান্ত কম ছিল; ইহাঁরা উপদেবতার উপাসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও অশিক্ষিত খাসিয়া সমাজে ঐরূপ প্রেতোপাসকদিগের সংখ্যাই অধিক। অধুনা অনেকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে কথঞ্চিৎ অনুরাগ, আবার কেহ বা হিন্দু-ধর্ম্মের দিকেও অল্পে অল্পে অগ্রসর। এই শেষোক্তের মধ্যে মান্যবর জীবন রায় মহাশয় প্রধান। প্রত্যুত ইনি খাসিয়া সমাজের অগ্রণী; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন—সকল বিষয়েই ইনি শ্রেষ্ঠ; ইনি এখানকার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর। কোন খাসিয়াই এ পর্য্যন্ত এরূপ উচ্চ আসন লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী ও হিন্দু সমাজের সহিত ইহাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

সম্প্রতি অত্রত্য অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত রাবণ-বধ নাটক অভিনীত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা সকল অংশের সুচারু অভিনয় হওয়া পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভাবনাসত্ত্বেও এ অভিনয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এরূপ অভিনয় দ্বারা প্রবাস-যন্ত্রণা দূরীভূত হয়, অতএব ইহার অনুষ্ঠাতাগণ ধন্যবাদের পাত্র। অভিনয়ে কয়েকটী ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছিল; ভরসা করি, নাট্য-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিবেন। রাবণ-জননী নিকষার বেশ বড়ই অরুচিকর ও অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল—তাঁহার ধীরা, স্থিরা, স্থবিরা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, রাবণ হেন পুত্রের সম্মুখে, কৃষ্ণকেশা যুবতীবেশা মূর্ত্তি দর্শনে আমরা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। রঙ্গ-মঞ্চে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব রাবণ-বধ নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব্বকণ্ঠ-নিঃসৃত টোড়ী-ভৈরবী-মিশ্রিত হর-হৃদি-নিবাসিনী রণরঙ্গিণীর স্তোত্র-সংগীত বড়ই হৃদয়াকর্ষী;—অত্রত্য রঙ্গভূমে আমরা এ দুইএরই সম্পূর্ণ অসদ্ভাব দেখিয়াছিলাম। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার দৃশ্যও তাদৃশ হৃদয়-ভেদী হয় নাই। ঐকতান বাদ্যে অনৈকতানতাই অধিক লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও এত ভগ্নস্বর যে শ্রোতার কর্ণে সহজে প্রবিষ্ট হয় নাই। রাম, সীতা ও রাবণের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল;—সুগ্রীব-মিতা "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" দেখাইয়াছিলেন, বোধ হয়, এ কার্য্যে তিনি এই প্রথম ব্রতী। অন্যান্য অংশ মন্দ হয় নাই।

অত্রত্য চীফ্ কমিসনার ফিটজ্ পেট্রিক বাহাদুর অতি সুযোগ্য এবং সুনীতি পরায়ণ। তাঁহার সেক্রেটারী লায়েল বাহাদুরও তাদৃশ দক্ষ এবং ততোধিক পণ্ডিত। এই মণি-কাঞ্চন সংযোগে প্রত্যেক কার্য্যে নিরপেক্ষ বিচার ও শাসন

প্রণালী দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী। ইহাঁদিগের দৃষ্টিতে শ্বেত-কৃষ্ণের পার্থক্য নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ইহাঁরা এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া আসামে শান্তি ও সুমঙ্গল বিধান করুন।

এখানে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির মাত্রা কিছু অধিক। অন্ধকার হইতে অনেকেই জ্যোতিতে পৌঁছিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রীহট্টবাসীর সংখ্যাই অধিক। ইচ্ছা হইলেই, রবিবার সান্ধ্যালোকে সমাজ-মন্দিরে ভ্রাতা-ভগিনী-গণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করা যাইতে পারে। মাননীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন ভগিনীদলের অগ্রণী; মোহাচ্ছন্না অন্যান্য ভগিনীবর্গের উন্নতির বাসনা থাকিলে ঐ ভগিনীশ্রেষ্ঠার নিকট শিক্ষা লাভ করাই বিধি। শীঘ্রই এখানে পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আসিবার কথা আছে। জানি না, তিনি এই ভ্রাতা-ভগিনীগণের জ্যোতি ভেদ করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না।

রাজশক্তি ও সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু কেবল সাহিত্য ভিন্ন সংবাদপত্রাদির সহিত আরও অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ের সংশ্রব আছে; তন্মধ্যে রাজশক্তির সংশ্রব ও সংঘর্ষণ অতি গুরুতর ব্যাপার। সংবাদপত্র দ্বারা রাজা ও প্রজার মনের ভাব জানিতে পারা যায়। সংবাদ-পত্র দ্বারা রাজা—প্রজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হন। প্রজা রাজাজ্ঞা সমস্ত জানিতে পারে। এস্থলে বলা উচিত, সংবাদপত্র জিনিসটা বিলাতী ও আধুনিক এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার একটী সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রাদি না থাকিলে ইউরোপখণ্ড এত অল্পদিন মধ্যে এতদূর উন্নত হইতে পারিত কি না বলা যায় না। ইউরোপ যখন একটু একটু সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল সেই সময় হইতে তথায় সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি, তাহার পর সেই সভ্যতার যত উন্নতি হইতে লাগিল তথায় সংবাদ-পত্রেরও তত আদর বাড়িতে লাগিল। এস্থলে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, যদি সংবাদপত্র সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশ ত এক সময় সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল তবে এদেশে সংবাদপত্র ছিল

না কেন? ইহার উত্তরে নানা কারণ দর্শাইতে পারা যায়। প্রথমত এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির সহিত ইউরোপের সভ্যতা ও উন্নতির মূলে অনৈক্য রহিয়াছে। অন্তর্জ্জগতের আলোচনায় আমাদের উন্নতি হইয়াছিল, আর বহির্জ্জগতের আলোচনায় ইউরোপ আজি সভ্যতার দিকে উন্নত হইতেছে। তাহার পর, ভারত চিরকাল রাজভক্ত, চিরকাল রাজশক্তির অধীন। ভারতের রাজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ ছিল না, প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখা, প্রজাপালন হিন্দুরাজার প্রধান স্বার্থ; রাজা পিতা, প্রজা পুত্র। পিতা চিরকাল পুত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন, পুত্রকে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ভাবিতে হইতেছে না, যেখানে এরূপ পবিত্র সম্পর্ক, পবিত্র ভাব, সেখানে স্বতন্ত্র একটা প্রজাশক্তি থাকিলেও কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিবার কখন আবশ্যক হয় নাই, প্রজাকে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য, আপনাদিগের স্বার্থের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, কখন কাগজ কলমে যুদ্ধ করিতে হয় নাই; রাজা নিজেই প্রজার স্বার্থ ভাবিয়া কাজ করিতেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন হইবে কিরূপে? কিন্তু ইউরোপের সভ্যতা ও তথাকার রাজনীতি স্বতন্ত্র। প্রথমত ইউরোপের সভ্যতা বহির্জ্জগৎকে লইয়া, সুতরাং তথায় ইহার উন্নতির জন্য সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজন। তাহার পর, তথাকার রাজনীতিতে রাজার স্বার্থ স্বতন্ত্র, প্রজার স্বার্থ স্বতন্ত্র। তথায় রাজায় প্রজায় আন্তরিক মিল নাই। আবার রাজা আপনাকে সর্ব্বে সর্ব্বা জানিয়া প্রজাশক্তি নষ্ট করিয়া প্রজাকে আপন বশে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ওদিকে প্রজা রাজাকে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি বা ভৃত্যের অধিক ভাবিতে চায় না, রাজশক্তিকে যতটা সম্ভব প্রজাশক্তির অধীন করিতে চায়; এই কারণে তথায় সর্ব্বদা রাজায় প্রজায় বিবাদ ঘটিতেছে, সংবাদপত্র যন্ত্রস্বরূপ হইয়া প্রজাসাধারণকে তাহাদের স্বার্থ বুঝাইয়া দিতেছে, আরার দূতস্বরূপ হইয়া প্রজাশক্তির বল ও আকাঙ্ক্ষা রাজশক্তির নিকট নির্ভয়ে জানাইতেছে, আবশ্যক হইলে যুদ্ধের ভেরীরবও শুনাইতে ভীত হইতেছে না। এক কথায় প্রজাশক্তির উন্নতির জন্য, প্রজার স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডে সংবাদপত্রের প্রয়োজন। আমাদের দেশেও যখন রাজা প্রজায় আর সে পূর্ব্বভাব বজায় নাই, যখন রাজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ ও প্রজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ দাঁড়াইয়াছে, তখন আমাদের দেশেও আজকাল সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইউরোপের সংবাদপত্রের সহিত

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের অনেক উদ্দেশ্যগত পার্থক্য আছে। তথাকার সংবাদপত্র প্রজাশক্তির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রাজশক্তির সহিত সর্ব্বদা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া রাজা এই শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কঠোর আইন করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টায় থাকেন। আর আমরা একে রাজভক্ত, তাহাতে নিরীহ,সুতরাং আমাদের দেশে এখনও ততদূর কোন চেষ্টা হয় নাই। কেবল লর্ড লিটন একবার এই প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি অনেক গুণ অধিক, এজন্য তথায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও অধিক। এখানে রাজশক্তি প্রজাশক্তির অধীন বলিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচ করিবার বড় একটা সুবিধা হয় নাই। ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশে প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তির বল অধিক বলিয়া তথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এতাদৃশ নহে। ইংলণ্ডের অধীনে ভারতের আর যত দুঃখ থাকুক না কেন, এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে ইউরোপের অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য অপেক্ষা আমাদের অনেকটা সুবিধা আছে। লর্ড লিটনের সময় যখন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, তখন সেই শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেও আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর কোন দেশে স্বাধীন অবস্থাতেও ততদূর স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের প্রজাশক্তির অধীনে আমরা থাকায় আমাদের এইটুকু লাভ; আবশ্যক হইলে আমরা রাজার দোষ রাজার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে পারি, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি।

অনেকদিন হইল, প্রভাকর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নবজীবনে দেশীয় সংবাদপত্রের এক ইতিহাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন, এদেশে অল্পদিন মধ্যে সংবাদপত্রের অবস্থা কতদূর উন্নত হইয়াছে। আর আজ এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শভূমি, পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অগ্রণী ফরাসিভূমিতে রাজতন্ত্রকালে তথাকার সংবাদপত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিতেন ও সংবাদপত্রের চালকদিগকে কিরূপ কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া কাজ করিতে হইত, তাহাই দেখান যাইতেছে। রাজশক্তির অধীনে অবস্থানকালে প্রজাশক্তির মুখপাত্রস্বরূপ ফরাসি সংবাদপত্র সকলকে কঠিন রাজনিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইত, কিন্তু ফরাসীজাতি

যেরূপ এককালে সকল কার্য্যেই বাহবা লইয়াছিল, রাজশক্তির অধীন এই শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেও তাহাদের সংবাদপত্রসমূহ সেইরূপ আপন বিক্রমে কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সম্পাদকের ও সংবাদপত্রের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১৬৩১ অব্দের ১লা এপ্রেল ফ্রান্সভূমিতে "গেজেট" নামক প্রথম পত্রের সৃষ্টি হয়। এই পত্র "গেজেটার" নামের অনুকরণ করিয়া বাহির হয়। ক্ষুদ্র আট পৃষ্ঠা পরিমিত আকারে ফ্রান্সের রাজচিকিৎসক রেণাল্ডট্ এই পত্র সপ্তাহে একবার করিয়া বাহির করিতেন; প্রথমত ইহাতে কোন প্রকার সংবাদ ছাপা হইত না। মার্শমান সাহেবের বাঙ্গালা দিগ্‌দর্শনের মত গল্প ও পুস্তকের সমালোচনায় এই কাগজ পূর্ণ করা হইত। ইহাই ইউরোপখণ্ডের বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শভূমি ফ্রান্সের প্রথম সংবাদপত্র। সম্ভবত রোম ব্যতীত ইউরোপখণ্ডের এই প্রথম সংবাদপত্র। গেজেটের অবস্থা এই প্রকার হইলেও এই নূতন জিনিস তথাকার লোকের চক্ষেও একরূপ ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই ইহাকে অল্পবিস্তর ভয় করিত। পাছে এই পত্র প্রকাশে কেহ কোন বাধা দেয়, এই কারণে প্রতি সংখ্যার গেজেটে এই কথাগুলি থাকিত;—

"আমি বৈদেশিক রাজাগুভাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমার সংবাদপত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করেন না। আমার এই গেজেট সেরূপ জিনিস নহে যে, তাঁহারা ইহাঁকে বন্ধ করিতে পারেন। স্রোতসলিল যেরূপ বাধা পাইলে স্ফীত হইয়া উঠে, আমার এ কাগজও সেইরূপ বাধা পাইলে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে।"

ইহার পর ক্রমে দেখাদেখি ফ্রান্সে ২। ৪ খানি করিয়া কাগজ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ উন্নতি কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

১৭৮৯ সালের বিপ্লব ফ্রান্সের সংবাদপত্রের উন্নতির পক্ষে একটী প্রধান ঘটনা। এই বিপ্লবে প্রায় দেড় শত নূতন সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করে ও ইহার মধ্যে অনেকগুলি সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সকল পত্রে রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে ও ফ্রান্সের সেই সময়কার অনেক প্রধান প্রধান বিখ্যাত লোক এই সকল পত্রে লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। সভ্য প্রধান দেশে সংবাদপত্রের উন্নতির এই প্রথম অবস্থা; ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের অপরাপর দেশেও ঠিক এই সময় সংবাদপত্রের শৈশবাবস্থা; কেবল ইংলণ্ডে একটু উন্নতি লক্ষিত

হইয়াছিল, তথায় এই সময় "টাইম্‌স" পত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার অল্পদিন পরে ফ্রান্সে দৈনিক পত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই সংবাদপত্রের প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ে ও তাহার ফল স্বরূপ রাজাজ্ঞা দ্বারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কেবল যে সকল পত্রের ভাষা বিশেষ তীব্র ছিল না, বা কেবল শিল্প সাহিত্যাদি লইয়া নাড়াচাড়া করিত, রাজনীতির সংস্পর্শে বড় একটা যাইত না, সেইগুলিই রাজাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলক্ষণ সংকোচ করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন অপরাপর কার্য্যে যত উদার হউন না কেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এখনকার ন্যায় তখন যে সে লোক ইচ্ছা করিলেই সংবাদপত্র বাহির করিতে পারিত না। সে সময় কেহ কোন পত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমে রাজার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত; ফ্রান্সে অধিবাসী লোক ভিন্ন অপর কোন দেশীয় লোক তথায় কোন পত্র প্রচারে অনুমতি পাইত না। সংবাদপত্রের সম্পাদককে রাজসমীপে কতকগুলি বিশেষ নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সর্ব্বদা রাজপক্ষ সমর্থন করিব, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে কখন কোন কথা বলিব না, এই সকল বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলে তবে সে সময়কার গবর্ণমেণ্ট সম্পাদককে কাগজ বাহির করিতে আজ্ঞা দিতেন। নেপোলিয়ন বড় যুদ্ধানুরক্ত ছিলেন বলিয়া এই শপথের মধ্যে যুদ্ধ বিভাগের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইত। এই সকল কারণে নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সুর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল পত্র বোর্ব্বোঁবংশের কিছু গুণগান করিত, সে সকল পত্রকে সম্রাট বিষচক্ষে দেখিতেন। আবার যে সকল পত্র নেপোলিয়নের বিপক্ষ ছিল না, অথচ সপক্ষেও কিছু বলিত না, তাহাদিগকেও তিনি পছন্দ করিতেন না, শত্রু জ্ঞান করিতেন। নেপোলিয়ন স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার সময়ের সংবাদপত্র সকলকে তাঁহার রাজনীতির পক্ষ সমর্থন করিতে আজ্ঞা করিতেন। নেপোলিয়নের সময় সংবাদপত্রের অবস্থা ত এই, মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা ইহাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। নেপোলিয়নের পর বোর্ব্বোঁবংশীয়েরা আবার যখন সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন সংবাদপত্র সমূহকে নেপোলিয়নের ন্যায় ততদূর কঠোর শাসনাধীনে না রাখিলেও তাঁহারা কোন প্রকার অনুগ্রহভাব দেখাইতেন না। তবে বোর্ব্বোঁবংশীয় সম্রাট অষ্টাদশ ই

নৃপতির সময় ফ্রান্সের সংবাদপত্রের দ্বিতীয়বার উন্নতি লক্ষিত হয়। এই সময় সম্রাট স্বয়ং ফ্রান্সের অনেকগুলি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশকদিগকে উৎসাহিত করেন, এই সময় সম্রাটের উৎসাহে রাজ্যের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও রাজকর্ম্মচারী পুনরায় সংবাদপত্রের উন্নতি কল্পে লেখনী ধারণ করেন ও ইহাঁদিগের যত্নে ফ্রান্সে সংবাদপত্রের যুগান্তর উপস্থিত হয়।

আমাদের এখানে যেমন পাইওনিয়র, ইংলিসম্যান, সিবিল মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের তরফের কাগজ আছে, ফ্রান্সে নেপোলিয়নের পতনের অব্যবহিত পরে ও বোর্বোঁবংশের রাজ্য গ্রহণের প্রথমাবস্থায়, এই প্রকার ছয় খানি প্রধান কাগজ ও প্রজা পক্ষের ছয় খানি প্রধান কাগজের গ্রাহক সংখ্যা তুলনায় সকলে বুঝিতে পারিবেন, রাজ্যে কোন পক্ষের বল অধিক।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ	গ্রাহকসংখ্যা	প্রজার পক্ষ	গ্রাহকসংখ্যা
লি জর্ণাল দে পারী।	৪১১৫	লি কনষ্টিটিউশনাল।	১১২৫০
লি ইটইলি।	২৭৪৯	লি জর্ণাল দে দিবেট।	১৩০০০
লি গ্যাজেট।	২৩০০	লি কোটিদিয়েন্।	১০৮০০
লি মনিটর।	২২৫০	লি কুরিয়র ফ্রান্কে।	২৯৭৫
লি ড্রাপিয়ান ব্লাঙ্ক।	১৯০০	লি জর্ণাল দে কমিউন্।	২৩৮০
লি পাইলোটি।	৯০০	ল্যারিষ্টাক।	৯২৫
	মোট—১৪,২৭৪		মোট—৪১,৩৩০

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি কত হীন বল। রাজতন্ত্র দেশে রাজার প্রতি প্রজার কত কম টান। এই সংবাদপত্রের হিসাবে দেখা যাইতেছে রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি তিন গুণ অধিক, প্রকৃত হিসাবে আরও কত গুণ অধিক, তাহা বলা যায় না। আমরা এই তুলনায় প্রথম বৎসরের হিসাব মাত্র দেখাইলাম, প্রতি বৎসরের হিসাব তুলিয়া দেখাইলে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেন, রাজতন্ত্র ফ্রান্সে প্রজাশক্তি প্রতি বৎসর কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নেপোলিয়ন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করিয়া প্রজাশক্তির গলা টিপিয়া মারিতে গিয়াছিলেন, নেপোলিয়নের পতনের অল্পদিন পরেই সেই প্রজাশক্তি পুনরায় আপন বল লাভের চেষ্টা করায়, ছয় খানির স্থানে পাঁচ শত সংবাদপত্র প্রজা পক্ষে জন্মগ্রহণ করিল।

ইহার মধ্যে প্রধান আঠার খানির গ্রাহক দুই হাজার হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত। লুই ফিলিপি প্রজা পক্ষের সংবাদপত্রের আকস্মিক এতাদৃশ বৃদ্ধিতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়নের ন্যায় তাঁহার সাহস ও বল না থাকায় তিনি কোনরূপে এই শক্তিকে দমন করিতে পারেন নাই। লুই ফিলিপির ভয়ের একটা বিশেষ কারণ এই যে, এই সময় ফ্রান্সের সকল সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় এতদিন যাহা কেবল সঙ্গতিপন্ন ও ভদ্রলোকের পাঠ্য ছিল, এক্ষণে তাহা সর্ব্ব সাধারণের পাঠ্য হওয়ায় ছোট বড় ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীস্থ লোকেই রাজকার্য্যের সমালোচন আরম্ভ করায়, রাজার স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িল। কিন্তু এই সময় মূল্য হ্রাস হইয়া সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি হইলেও এক বিষয়ে ফ্রান্সের সংবাদপত্রের অবস্থা বড় শোচনীয় ভাব ধারণ করে। এই সময় সংবাদপত্রের প্রচারকগণ দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা আপনাদিগের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। আর সম্পাদকগণ আপনাদিগের গ্রাহকগণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া সেই অনুযায়ী কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সুযোগে সংবাদপত্রের লেখকদিগের বিলক্ষণ আর্থিক উন্নতি হয়। অনেক প্রধান পত্রের-লেখক এই সময় বৎসরে কুড়ি হাজার হইতে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। এই সময় হইতে সংবাদপত্রে পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ ও গালাগালির কিছু বাড়াবাড়িই হয় এবং আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন এই সময় হইতে ফ্রান্সে সংবাদপত্রে স্ত্রীজাতির বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়, সুতরাং অশ্লীলতারও যে আরম্ভ হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায় এই সময় হইতে সংবাদপত্রের রুচির পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই সকলের বড় আলোচনা হইত না, তখন কেবলমাত্র রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় পত্র পৃষ্ঠা পূর্ণ করা হইত। স্ত্রীজাতির বিষয় আলোচনার সুরু হওয়ায়, স্ত্রীজাতির জন্য কয়েক খানি পত্রেরও এই সময় প্রথম সৃষ্টি হয়।

১৮৫২ অব্দে ফ্রান্সে নেপোলিয়নবংশ আবার প্রাধান্যলাভ করায় সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে সংবাদপত্র আবার শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়। নেপোলিয়ন বংশধর নেপোলিয়ন অপেক্ষা শত গুণ কঠোর শৃঙ্খলে ফ্রান্সের সংবাদপত্র সমূহকে আবদ্ধ করেন। লুই নেপোলিয়নের আদেশক্রমে সংবাদ বা

সাময়িক যে কোন পত্র হউক না কেন, এবং তাহা যে কোন বিষয়েরই আলোচনা করুক না কেন, রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহই তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার পর এই সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম হইল, ফ্রান্সের অধিবাসী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন প্রকারের পত্রিকা প্রচারে অধিকারী হইবে না। এই সকল পত্রের অধিকারী ও সম্পাদকের সাবালক হওয়া চাই, শুদ্ধ ইহাই নহে, আবার মিউনিসিপাল অধিকার থাকা চাই। সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর পরিবর্ত্তনের সহিত রাজার অনুমতি পুনর্ব্বার গ্রহণ আবশ্যক। এই সময় যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিন্ন দেশীয় পত্রের গ্রাহক হইত বা ভিন্ন দেশীয় পত্র ফ্রান্সে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহা হইলে তাহাকেও এই সকল নিয়মাধীনে চলিতে হইত। এই সকল রাজাজ্ঞার কেহ ব্যতিক্রম করিলে, তাহার হয় অর্থদণ্ড, না হয় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তাহার পর কেহ কোন পত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রচারানুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার অধিকারীকে জামিন স্বরূপ পনর হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টে জমা রাখিতে হইত। কোন পত্র লুই নেপোলিয়নের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, এই টাকা গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। যদি কেহ রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা জামিনের সমস্ত টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে পত্রিকার প্রচারারম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড ব্যতীত দীর্ঘ কারাদণ্ড হইত। মুদ্রাকরকে পর্য্যন্ত ইহাতে টান পড়িত। ইহার উপর ষ্টাম্প খরচা, বিদেশী সংবাদপত্রাদি ফ্রান্সে আনিলে তাহার আমদানী মাশুল, কোন প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের বিরক্তিকর বোধ হইলে গুরুতর অর্থদণ্ড ও কারাবাস উভয়বিধ লাভ, রাজসভার কোন কার্য্য বিনানুমতিতে প্রকাশ করিলে বা গবর্ণমেণ্ট যে কাগজকে যে কার্য্যের জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছেন, পুনরায় সেই কার্য্য করিলে,—কাগজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। রাজকীয় বিজ্ঞাপনাদি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত বিনা মূল্যে সম্পাদককে প্রকাশ করিতে হইত। যদি কোন পত্রের প্রকাশক বা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের এই সকল আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে লুই নেপোলিয়ন তাহাকে ইচ্ছামত শাস্তি দিবার ক্ষমতা স্বহস্তে ধারণ করিতেন। এই সময় কেহ কোন সচিত্র পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছা করিলে বা কোন প্রবন্ধ চিত্রযুক্ত বাহির করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপ যত বার ও যতগুলি চিত্র পত্রিকায় প্রকাশের

আবশ্যক হইত, তত বার পৃথক পৃথক্ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। পুস্তক ও বক্তৃতাদি সম্বন্ধেও লুই নেপোলিয়ন অনেক কঠিন নিয়ম করিয়াছিলেন কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সকল উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় আর তাহা বলা হইল না।

লুই নেপোলিয়ন এই প্রকার কঠোর শাসনে তাঁহার প্রথম বৎসরেই এক শত কুড়ি খানি সংবাদপত্রের বা প্রায় এক তৃতীয়াংশ পত্রিকার অকালমৃত্যু হয়, কিন্তু তথাপি ফরাসী প্রজার বল, এত কঠোর শাসনেও দমিয়া যায় নাই। এই বৎসর ফ্রান্সে চৌদ্দখানি দৈনিক পত্র গবর্ণমেণ্টকে ৩১৩, ৫৬২ ফ্রাঙ্ক দণ্ড দিয়াও ১৬১,৩৫০ কাপি করিয়া প্রত্যহ ফ্রান্সবাসীকে উপহার দিয়াছিল।

লুই নেপোলিয়নের পর হইতে ফ্রান্সে সাধারণত ঐ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। যদিও ফ্রান্সে এক্ষণে সংবাদপত্রাদির আর সে শোচনীয় অবস্থা নাই, তথাপি স্বাধীনতায় এক্ষণেও ইহা ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন। ফ্রান্স ব্যতীত, জর্ম্মণি, রুশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে দেখা যায়, প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি বলবান, সেইখানেরই সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ইউরোপখণ্ডের মধ্যে ইংলণ্ড সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়াছে। আর আমরাও আজ ইংলণ্ডের প্রসাদে সেই স্বাধীনতার কিয়দংশ ভোগ করিতেছি। এস্থলে পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা উচিত, পূর্ণ রাজশক্তিসম্পন্ন দেশে সংবাদপত্রাদির কিরূপ অবস্থা তাহা দেখাইবার জন্যই কেবল ফ্রান্সের কথার অবতারণ করা হইয়াছে, এবং সেই পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট রাজা নিজ স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত প্রজাশক্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজার যন্ত্র ও দূত স্বরূপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াও প্রজার মনের আগুন চাপা দিতে পারিলেন না, তিনি প্রজার মুখবন্দের নানা চেষ্টা করিলেও ফ্রান্সের পনর আনা প্রজা লুই নেপোলিয়নের বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, ও তাহার ফলস্বরূপ ফ্রান্সভূমিতে আজ একবারে রাজশক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে; ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে প্রজাশক্তির অধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই লুই নেপোলিয়নের দলের লোক আছেন, ইঁহারা প্রজার মনোভাব মনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য প্রজার মুখ বন্ধ করিবার জন্য, প্রজাশক্তি নষ্ট করিবার জন্যগবর্ণমেণ্টকে দেশীয় সংবাদপত্রের শক্তি ও ক্ষমতা সংকোচ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন; তাঁহাদের ভাবা ও দেখা উচিত যে, কেবল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিলেই প্রজার মুখ বন্ধ করা যায় না, তাহাদের মনে পাষাণ চাপা দেওয়া যায় না; লুই নেপোলিয়ন একগুণ প্রজাশক্তি নষ্ট

করিতে চেষ্টা করায় সেই শক্তি যেমন শতগুণ বলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার অপ্রিয় হইয়া প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের বলক্ষয় করিয়া ভারতবাসীকে নিজ করতলস্থ রাখিতে যান, তাহা হইলে ইংরাজগবর্ণমেণ্টকেও এক দিন নেপোলিয়নের ন্যায় হতাশ ও ভগ্নমনোরথ হইতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে বলি, ফ্রান্সের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তাঁহাদের শিখিবার অনেক আছে। পায়োনিয়র বা ইংলিশম্যান্ প্রেস্ আক্‌টের ভয় দেখাইলেই, আমরা ভয় পাইব কেন?

নাটক।

সৃষ্টিকাল।

যে সে সভ্যসমাজে লোক মনে করিলেই, যখন তখন নাটক সৃষ্টি করিতে পারে না। এ কথা—ঠিক কথা।

নাটক বল, নবেল বল, কাব্য বল, দর্শন বল, জগতে জড় অজড় সকল পদার্থেরই বিকাশ, বিশেষ নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই আগম নিগমের—নিয়ম ও ক্রম আছে। সাহিত্যেরও সকল অবয়বের বিকাশের ক্রম নিয়ম আছে। সেই সকল ক্রম নিয়ম যে কি, তাহা বুঝা বড় কঠিন, তবে মোটামুটি এতটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, কোন দেশে পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতা যুগপৎ বৃদ্ধি পাইলেই যে সেই দেশে সাহিত্যের সর্ব্ব অবয়বের সুন্দর বিকাশ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বড় বড় জাতির বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতির ক্ষুদ্র বঙ্গ সাহিত্যেই দেখুন—পণ্ডিত ও রসজ্ঞ অনেকেই আছেন, কিন্তু রাম বসুর মত আগমনী বা বিরহ, বা হরু ঠাকুরের মত সখীসংবাদ কেহ লিখিতে পারেন কি? না, তা পারেন না। যখন তখন, যে সে জিনিস, মনে করিলেই হয় না।

প্রাচীন গ্রীসের একটি বিশেষ সময়ে, এবং আধুনিক ইংলণ্ড, স্পেন, ফরাসি দেশের বিশেষ বিশেষ সময়ে, বড় বড় নাটককার জন্মিয়াছিলেন, এইটি

দেখাইয়া, এস্কাইলস্, সেকস্পিয়র, হুগো প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া, য়ুরোপীয় সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সভ্য দেশে, যুদ্ধবিক্রমের, বাহু-বল-বিপ্লবের, জড় জগতের সহিত মানবের কার্য্যশক্তির—বিশেষ প্রাবল্য হয়, তখনই নাটক সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তাঁহাদের কথা এই যে, দেশে জীবন্ত ভাবে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত-জীবনময়-নাটকের সৃষ্টি হইবে। দেশে ঘাত-প্রতিঘাত না থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত হইবে কেন?

আমরা কাব্য সাহিত্যের সমালোচনায় অনেকেই য়ুরোপীয় সমালোচকগণের মন্ত্র শিষ্য, কাজেই আমরা ঐ মতের অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালিকে নাটক লিখিতে নিষেধ করি, লিখিলে অবজ্ঞা করি, বিজ্ঞতা দেখাই; উপহাস করি, ঘৃণা দেখাই।

কিন্তু সংসারের ঘাত প্রতিঘাত মধ্যে আমরা যে নিয়ম স্থির করিতেছি, বা য়ুরোপীয়েরা স্থির করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, যাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, সেই নিয়মটি একটু বিচার বিতর্ক করিয়া আমাদের এখনকার দিনে দেখা আবশ্যক।

এই কলিকাতায় এক দিকে, যেমন একজন প্রধান ধনীসন্তান, লক্ষপতি বলিলে যাঁহার অবমাননা হয়—এহেন লোক নিভৃতকক্ষে পঞ্চ পারিপার্শ্বিকে পরিবৃত হইয়া তোষামোদ সেবনের মায়া কাটাইয়া, অথবা তদপেক্ষা আরও নিভৃতকক্ষে মুহুরি মহাফেজ লইয়া কড়া ক্রান্তির হিসাবের মমতা ভুলিয়া, বিপুল অর্থদানে, ভূরি সময় দানে, নাটকের রঙ্গোৎসাহে অগ্রসর,—অন্য দিকে, তেমনই কবি-প্রসিদ্ধ দারিদ্রের সহচর কবিবর—রামায়ণ মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ সুখের মায়া কাটাইয়া, ছোট ছোট খোস গল্পের ছাঁকনি বাঁধুনি গাঁথুনির মমতা ভুলিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ঋণদায়ে জড়িত হইয়া, সেইরূপে বঙ্গ নাটকের রঙ্গোৎসাহে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ। আর বৎসর দেখা গেল, নববিধানীরা বাঁশের বেড়ায় গোবর-মাটীর প্রলেপ দিয়া বঙ্গ নাটকের সেবা করিতেছেন, আবার এ বৎসর দেখা যাইতেছে, ষ্টার কোম্পানি সুবৃহৎ, সুরম্য, মর্ম্মর-গ্রথিত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া নাটকসেবার উদ্যোগে আছেন। এমন উৎসাহের দিনে, নাটকের সৃষ্টিস্থিতির বিলাতী নিয়মটি আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

নাটকের জীবন—ঘাত প্রতিঘাত বটে। কিন্তু অত অল্প কথায় বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। আমরা অনেক স্থলে ঐ কথাটী অনেক প্রকারে

বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও এখনও অনেক কথা বলিবার আছে—তথাপি অদ্য ও কথার আর নাড়াচাড়া করিব না। কিন্তু নাটকের জীবন ঘাত প্রতিঘাত বলিয়াই—কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজে নাটক সৃষ্ট হইবে—তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান সভ্য জাতি। মুসলমান ইউরোপের সাক্ষাৎ শিক্ষা গুরু। মুসলমান হিন্দুর নিকট, য়ুনানীর নিকট, স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছে, সেই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান অতি সন্তর্পণে আবার আপনার শিষ্য য়ুরোপীয়গণকে শিক্ষা দিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্ম শাস্ত্র কোরাণ একরূপ সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। পারসী ভাষার গীতি কাব্য হিন্দু গ্রীকের সমতুল্য। যুদ্ধ বিক্রমে, দিগ্বিজয়ে, আস দণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতে, পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমান জগতে অতুল্য ছিল বলিলেও হয়।—এত ঘাত প্রতিঘাতেও ত মুসলমানের সাহিত্যে—আরবী পারসী, তুরকীতে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক এক খানিও নাই। তবেই বোধ হইতেছে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, তাহাদের সাহিত্যেও ঘাত প্রতিঘাতের ছায়া পড়িবে, এই নিয়ম সকল স্থলে খাটে না। এখন কথা হইতে পারে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজের সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত থাকিবে—এ কথা ঠিক নহে বটে কিন্তু সমাজে ঘাত প্রতিঘাত না থাকিলে, যে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক হইবে না,—তাহা ঠিক। এ কথারও বিচার করা আবশ্যক।

কোন একটি সমাজের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্রের ঝঞ্ঝনাণি, অঙ্গ গ্রন্থির কন্‌কনানি না থাকিলেই, যে সে সমাজে, কিঞ্চিন্মাত্র ঘাত প্রতিঘাত নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে নির্জীব প্রায় এই বঙ্গ সমাজে, কতটুকু মানসিক ঘাত প্রতিঘাত আজি কালি চলিতেছে—তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ষীয়ান্ পিতা, কিসে পুত্র ঠাট বাট বজায় রাখিয়া পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি কলাপ নষ্ট না করিয়া সুপরিচিত, চির-প্রচলিত পথে চলিতে থাকিবে—নিয়ত সেই ভাবনায় বিব্রত; আর তাঁহার সেই যবীয়ান্ পুত্র, কিসে সমাজ ভাঙ্গিবে, গৃহস্থালি নষ্ট করিবে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিবে,—সেই ভাবনায় ভোর। ইহাতে আমাদের সমাজ মধ্যে নিয়তই কি ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে না? অশিক্ষিত ভাবিতেছে উদর-নীতি; শিক্ষিত ভাবিতেছেন উদার-নীতি। গৃহিণী ভাবিতেছে অতিথি অভ্যাগত,—ক্রিয়া, কলাপ—ছেলে পিলে—আব্রু আচ্ছাদন। বধূমাতা ভাবিতেছেন—বন্ধু

যন্ত্রণী—কৌচ কেদারা—ডাকের পত্র,প্রিয়জনের ছত্র—সোসাইটীর মহাশ্মশান, আর চিড়িয়াখানার জীবন্ত তীর্থ। দুইটি বিভিন্ন-মুখী স্রোতের ঘাত প্রতিঘাত বঙ্গ সমাজে আজি অনেক কাল লীলা খেলা করিতেছে—সমাজে, সংসারে, এমন কি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে—ঘাত প্রতিঘাত নিয়তই চলিয়াছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে এই ঘাত প্রতিঘাত ততই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বাহ্যে ঘাত প্রতিঘাত নাই বলিয়া অন্তরেও যে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে যে সমাজ অন্তর্বাহ্যে সমানে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল,—জড়, অসাড়—উদাস, উদাসীন,—সে সমাজে অবশ্য নাটক সৃষ্ট হইবে না; শুধু নাটক কেন—তাহাতে দর্শন বিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য—অবশ্য মনুষ্য ধর্ম্মের কিছুই থাকিবে না।

তেমন জড় সমাজ, বঙ্গ সমাজ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালি কাঁদিতে শিখিয়াছে! অন্তর আলোড়িত হইয়া টগবগ করিয়া না ফুটিলে, কিছু বাষ্প উঠে না। বাঙ্গালি বহুকাল বাষ্পবারি ফেলিতেছে—অনেকদিন হইতে তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার আকস্মিক আঘাতে বঙ্গসমাজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অভিভূত হইয়াছিল—মন্ত্রমুগ্ধবৎ পরিচালকের অঙ্গুলি ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল, অল্পে অল্পে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে। সেই বিষম আঘাতের অল্প অল্প প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। এমন আন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কি নাটকের কিছুই উপযোগিতা নাই? তোমরা অমন করিয়া মাথা নাড়িলে চলিবে কেন? আমি তোমাদের কথাত বিশ্বাস করিব না। আমি স্বয়ং একখানা জীবন্ত নাটক, আমার হৃদয়ে দুইটি প্রবল প্রতীপ স্রোতের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে—তোমরা আমাকে চিত্রিত করিলেই নাটক হইবে—তবে এ সময় নাটকের উপযোগী নয়, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? 'আমি জীবন্ত নাটক' এই কথা বলিয়া আমি আত্মগরিমা করিতেছি না—আমি অর্থ, আমরা—আমি, তুমি, তিনি—সমগ্র শিক্ষিত সমাজ। আমরা শিরায় শিরায় পূর্ব্বপুরুষদের নিতান্ত নিষ্কামতা বহন করত, শিক্ষাগুণে পশ্চিমপুরুষদের একান্ত সকামতা পাইয়াছি। পাইয়া হইয়াছি—নিয়ত ঘাতপ্রতিঘাতের গ্রন্থ—এক একখানি জীবন্ত নাটক। এরূপ আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতে আর কখন হয় নাই। এমন অপূর্ব্ব সংঘর্ষণের ফল যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না।—সে বিশ্বাস আমাদের হয় না। সংসারধর্ম্ম সাধনার জন্যই বল, আর কাব্য সাহিত্যের স্ফুরণ জন্যই বল,—আত্মচিত্তানুসন্ধান ও সেই চিত্তের চিত্রণই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য!

যে সে সময়ে নাটক হয় না বটে, কিন্তু এসময়ে, যে বঙ্গসমাজে প্রকৃত নাটক একেবারেই হইতে পারে না—এমন কথা ইতিহাসের দোহাই দিয়া, জোর করিয়া বলিয়া, আমরা নাটককারগণকে নিরুৎসাহ করিতে পারি না। প্রকৃত পন্থায় চেষ্টা করিলে, এসময়ে নাটক সৃষ্ট হইলেও হইতে পারে।

নাটকের উপযোগী গল্প।

প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে হইলে, অনেক বিষয় শিখিতে হইবে। নাটকের উপযোগী গল্প নির্ব্বাচন করাও শিখিতে হয়। না শিখিলে অতি সামান্য কর্ম্মও হয় না—এ সকল ত অতি গুরুতর কাজ।

যে সে গল্প লইয়া, অঙ্ক দৃশ্য বিচ্ছেদ করিয়া—কথোপকথনের ভঙ্গিতে পুথী লিখিলে, নাটক হয় না। গল্পের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের উপকরণ থাকাত চাই, গল্পটিতে পূর্ণত্বও থাকা চাই। রাহুর মত কেবল মুণ্ডটা, বা কেতুর মত মাথাকাটা ধড়টা, লইলে হইবে না। একটি গাছের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র পুষ্পফল থাকে—একটি নাটকোপযোগী গল্পেরও সেইরূপ পূর্ণ-বিকাশ থাকা চাই। পাণ্ডবনির্ব্বাসন, মহাভারত যুদ্ধ রূপ মহানাটকের একটী মহামূল, সেইটি মাত্র লইয়া কখন নাটক হইতে পারে না—তবে যাত্রার মত নাটকে পালাগাঁথুনী থাকিলে, প্রথম দিনের পালায় গাওয়া যাইতে পারে।

নাটকের গল্প নির্ব্বাচনার্থ আরও অনেক কথা জানা চাই। সকল কথাই যে আমরা জানি তাহা নহে। তবে মোটামুটি যাহা বুঝিতেছি, তাহা বলিতে ক্ষতি কি? কিন্তু এরূপ করিয়া বলিবার অগ্রে বোধ হয় দুই একটি নাটকোপযোগী গল্পের নমুনা দিলে ভাল হয়।

প্রথমে বিক্‌টর হুগো বিরচিত একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পটি শুনুন—হয় ত শুনিলেই আপনা আপনি বুঝা যাইবে, যে এই গল্পে কিরূপ নাটকত্ব আছে।

ফরাসি রাজ প্রথম ফ্রান্সিসের ত্রিবুলে নামে এক জন বিদূষক ছিল। ত্রিবুলে দেখিতে অতি কদাকার, একে কর্কশ, খেঁকুরে, তাহার উপর পিঠে একটা কুঁজ। ত্রিবুলেকে দেখিলেই সকলে হাসিত, ত্রিবুলেও হাসাইত, কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে জগৎসংসারের উপর চটা ছিল। রাজা রাজা বলিয়া ত্রিবুলে তাঁহার উপর চটা; বড় মানুষেরা বড় মানুষ বলিয়া, ত্রিবুলে তাহাদের উপর চটা; আর সংসারের লোকের কাহারও পিঠে কুঁজ নাই বলিয়া, ত্রিবুলে সকল

লোকের উপরই চটা। রাজার উপর ত্রিবুলের অসীম প্রভুত্ব; সে জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া রাজাকে ক্রমেই পাপের পথে লইয়া যাইতে লাগিল। রাজাকে ক্রমে পাষণ্ড, পশু, পিশাচ করিয়া তুলিল। ত্রিবুলে রাজাকে ভাল-মন্দ কিছুই জানিতে দেয় না, তাঁহাকে অত্যাচারে উত্তেজিত করে, পাপে প্রশ্রয় দেয়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে কোন কুলবধূকে কলঙ্কিনী করিতে হইবে, কাহার ভগিনীকে অভাগিনী করিতে হইবে, কাহার দুহিতাকে ধর্ম্মচ্যুতা করিতে হইবে, সে রাজাকে তাহারই শিক্ষা দেয়; রাজার স্বেচ্ছাচারের সুযোগ নিয়ত জুটাইয়া দেয়।

এক দিন মহা মহোৎসব হইতেছে; ত্রিবুলে রাজাকে পরামর্শ দিতেছে যে, এই সুযোগে তিনি মূসে দে কসের বনিতাকে লইয়া সচ্ছন্দে স্বেচ্ছাবিহারে স্থানান্তরে যাইতে পারেন; এমন সময় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ সেণ্ট ব্যালীর হঠাৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার কন্যার ধর্ম্মনাশের জন্য রাজাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ ত্রিবুলে, এই মর্ম্মাহত পিতাকে আপনার স্বভাবমত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, উর্দ্ধহস্তে অভিসম্পাত করিলেন—'আমার মত দশা যেন তোর হয়।'

ত্রিবুলের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সেই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। মানুষ যতই কেন পাপিষ্ঠ পিশাচ হউক না, যতই কেন কঠোর নিঠুর হউক না, তাহার হৃদয়ের এক কোণে একটু মনুষ্যত্ব পড়িয়া থাকিবেই। ভালবাসাকে মনুষ্যত্ব বলে। যে যত জগতের উপর চটা, তাহার ভালবাসাটুকু ততই খাটি। জগতের উপর ত্রিবুলে, যেমন চটা, আপন কন্যা ব্লান্সকে তেমনই ভাল বাসিয়া, ত্রিবুলে আপনার হৃদয়ের তুল দাড়ি ঠিক রাখিয়াছিল। ব্লান্সকে নগরান্তে, বনান্তরে, একটি নির্জন নিভৃত নিকেতনে রাখিয়া, ত্রিবুলে তাহাকে অতি সন্তর্পণে মানুষ করিয়াছিল। লোকের পাপচক্ষু সমক্ষে তাহাকে আসিতে দেয় নাই; স্বধর্ম্মে, সরলতায়, সৌন্দর্য্যে—ব্লান্সকে স্বচ্ছ সরোবরের শ্বেত পদ্মের মত করিয়াছে; সেই শ্বেত শতদল এখন প্রস্ফুটোন্মুখ হইয়াছে। যে সকল পাপের পঙ্ক লইয়া ত্রিবুলে সর্ব্বদা মাথামাখি করে—ত্রিবুলের বড় ভয় আছে, কিসে ব্লান্সকে সেই পাপ-পঙ্ক হইতে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাতের লীলাখেলা বড়ই ভয়ঙ্কর। ত্রিবুলে মূসেদে কসের বনিতাকে রাজার নিকট লইয়া যাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া, নিজে

চক্রে পড়িয়া, আপনার কন্যাকেই রাজভোগে অর্পণ করিল। তাহার পর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাজার উপর রাগ তুলিতে গিয়া স্বহস্তে আপন কন্যাকে বধ করিল। কোলে লইয়া, মুখ দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া বুঝিল যে, সেণ্টবালীর অভিসম্পাৎ হাতে হাতে ফলিয়াছে। ত্রিবুলে রাজাকে পাপে শিক্ষিত করিয়াছিল, কন্যাকে পবিত্রতায় দীক্ষিত করিয়াছিল; প্রকৃতির এমনই প্রতি-বিধান যে, সেই অধর্ম্ম-দীক্ষিত রাজা হইতেই সেই ধর্ম্ম-দীক্ষিতা কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট হইল। যে পাপিষ্ঠ এক দিন মর্ম্মাহত পিতার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপহাস করিয়াছিল, দেখ সেই আজি ততোধিক মর্ম্মাহত হইয়া, স্বহস্তে সংসারবন্ধনের এক মাত্র সূত্র ছিন্ন করিয়া, মৃত কন্যা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে; ত্রিবুলে ত কাঁদিতে পারিল না!

গল্পের নাটকত্ব বুঝিলে কি?

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৫।

আমরা বলিয়াছি, বাঙ্কো হত্যার সংকল্পে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি। দৃশ্যের শেষ কথা মাক্‌বেথ মুখে পাপসংকল্পের স্বগত উক্তি।

এ কথা ত হলো; বাঙ্কো তোমার কপালে;
যদি স্বর্গ থাকে—হবে, অদ্য রাত্রিকালে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—মাক্‌বেথ গৃহিণী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভৃত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন। পরে আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন।

আপনা আপনি ভাবিতে আমরা লেডি মাক্‌বেথকে আরও অনেক বার দেখিয়াছি। প্রথমে মাক্‌বেথ-লিখিত পত্র পাঠের পর তাঁহার ভাবনা। তখন দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে ফুটিতেছে। তাহার পর দূত আসিয়া যখন বলিল, ডঙ্কান্ অথিতি হইবেন, তখন দুঃসাহসে বুক বাঁধিবার জন্য তাঁহার পৈশাচী প্রকৃতির উচ্চ রবে আরাধনা।* তাহার পর ডঙ্কান্ হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পিশাচীর সুরাপান করিয়া, কাল পেচকের কাল রব শুনিতে শুনিতে অধর্ম্মের আহ্লাদের ভাবনা। এই দুই স্থলে মাক্‌বেথ গৃহিণীর পৈশাচিকী মূর্ত্তি।

---

* ৫২৪ পৃষ্ঠায় মাক্‌বেথগৃহিণীর কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার অনুবাদ হয় না।

এখনও সেই লেডি মাক্‌বেথ আপনা আপনি ভাবিতেছেন, কিন্তু এখন আর সে ভয়ঙ্করী, বীভৎসা মূর্ত্তি নহে।

রাম লক্ষ্মণ সীতা বল্কল পরিয়া বনে গেলেন; কোশলে হাহাকার ধ্বনি; দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু কৈ ভরত ত সিংহাসনে বসিল না?—কৈকেয়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে। ছিন্ন নাসা-কর্ণের প্রতিশোধে সীতাহরণ। কিন্তু সীতাহরণের পরিণামে ব্রহ্ম-রাক্ষস-বংশ ধ্বংশ হইল—সূর্পনখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে। কিন্তু মাক্‌বেথগৃহিণী সিদ্ধকামা হইয়া, স্বামীকে স্কটলাণ্ডের রাজরাজেশ্বর করিয়া, আপনি রাজরাজেশ্বরী হইয়া, অমন হেটমুণ্ডে, মলিন মুখে, দীর্ঘশ্বাস তুলিতেছে, অথচ ফেলিতে পারিতেছে না কেন?

অইত, অইত পাপের মজা! অইত পাপ-পুণ্য-বিধাতার কার্‌দানি। পাপের ভোগেও কষ্ট, বিয়োগেও কষ্ট। অভিলষণীয় বস্তু একেবারে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, বরং একরূপ নিবৃত্তি আছে—পাপের সম্ভোগে কিন্তু কখনই সন্তৃপ্তি নাই। তাহাতেই কৈকেয়ী ও সূর্পনখা নিরাশার শ্বাস ফেলিতেছে—মাক্‌বেথ গৃহিণীত তাহা পারিল না—শ্বাস টানিতেছে, নিশ্বাস রুদ্ধ করিতেছে, শরীর স্ফীত করিতেছে, হেটমুণ্ডে স্বামীর আসিবার পথের দিকে চাহিয়া আছে, আর দমে দমে বলিতেছে;—

'পেলেম না কিছু, গেলত সর্ব্বস্ব।' কেন, কেন, রাণী, স্কট্‌লাণ্ডের রাজরাজেশ্বরি! স্বামীর স্বামিনি! কেন কেন? তোমার সর্ব্বস্ব গেল কিসে? তুমি সংকল্প-সিদ্ধির জন্য মাতা হইয়া ক্রোড়স্থ স্তন্যপায়ী শিশুকে পাথরে আছাড় মারিতে পার,—এখন তোমার সংকল্প সুসিদ্ধ হইয়াছে—তুমি, সর্ব্বস্ব গেল বলিতেছ কেন? কোথায় সর্ব্বস্ব তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? মানুষের সর্ব্বস্ব দাস-দাসীতে নাই, প্রভুত্ব প্রতাপে নাই, মান-সম্ভ্রমে নাই, রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে নাই, প্রাসাদ-পর্য্যঙ্কে নাই—সর্ব্বস্ব থাকে,—মনের কোণের ভিতর, প্রাণের প্রাণের ভিতর। ভিতরের সেই নিজস্বই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। ঐ সিংহাসন, ঐ সিংহদ্বার, ঐ রাজ্য, ঐ সংসার, ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—বাহিরে—সর্ব্বস্ব নাই; কিছুই নাই। দুর্ম্মতি, দুষ্প্রবৃত্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশে আজি ভিতরের সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাহাতেই তোমাকে বলিতে হইতেছে—

'পেলেম না কিছু—গেল ত সর্ব্বস্ব।'

ভিতর ছাড়া বাহিরে কোথাত কিছু নাই। তা পাবে আর কি? সর্ব্বস্ব যে গিয়াছে, তাহাই ঠিক।

পুণ্যাত্মা পরোপকারের প্রয়াসী। উপকারের সংকল্পসিদ্ধি হওয়া সর্ব্বদা ঘটে না। কিন্তু তাহার চেষ্টাতেই সর্ব্বস্ব লাভ হয়। পাপের সংকল্প সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইলেও, সুখ নাই, তৃপ্তি নাই—কেবল মনে হয়, হলো কি? পেলেম কি?

লেডি মাক্‌বেথ ঐরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মাক্‌বেথ আসিলেন, লেডি মাক্‌বেথ অমনই সেই অনন্ত নিরাশ চাপা দিয়া মাক্‌বেথকে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিলেন।

লেডি মাক্‌বেথ দুরাকাঙ্ক্ষার বশে যতই কেন পাপিষ্ঠা হউন না, তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট প্রণয়-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারই উত্তেজনায় মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন সুতরাং লেডি মাক্‌বেথ স্বামীর জন্য বড়ই উদ্বিগ্না আছেন। পাছে ভাবিয়া ভাবিয়া মাক্‌বেথ পাগল হন, সে ভাবনাও আছে। আপনার সর্ব্বস্ব-ধ্বংশকর হৃদয়দাবানল ধীরে ধীরে চাপা দিয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'যাহার কোন উপায় নাই তাহার বিষয় ভাবিয়া আর কি হইবে।'

পাপের কি সান্ত্বনা আছে? মাক্‌বেথ কোন সান্ত্বনাই বুঝিলেন না। পরিশেষে বলিলেন, 'গৃহিণী আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, তুমি ত দেখিতেছ—বাঙ্কো ও ফ্লীয়ান্স এখনও জীবিত রহিয়াছে।' ক্রমে বলিতে লাগিলেন—'তুমি জানিও রাত্রিচর বাদুড়গুলা আপনাদের নিভৃত নিবাস হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, ঝিল্লির ঝিম্‌ঝিমুনিতে নৈশ সমীরণ পূরিত হইবার পূর্ব্বে, আজি একটি ভয়ঙ্কর কার্য্য হইবে।' গৃহিণী সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কার্য্য?' মাক্‌বেথ বলিলেন, 'এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই—কাজ সমাপ্ত হইলে তখন প্রশংসা করিও।' তাহার পর মাক্‌বেথ কালরাত্রির বোধন করিতে লাগিলেন—আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—দিবসের রমণীয় বস্তু সকল অবসন্ন হইতেছে—কালরাত্রির করাল সহচর সকল বিচরণ করিতেছে। সেই ধুয়া গানের কথা—মাক্‌বেথ মন্দকে সুন্দর দেখিতেছেন, তার মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তিন জন ঘাতুকে সপুত্রক বাঙ্কোকে আক্রমণ করিল—ফ্লীয়ান্স পলায়ন করিল; বাঙ্কো নিহত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে রাজভবনে রাজ ভোজ। সকলে উপবেশন করিলে ভোজ প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে একজন ঘাতুক দেখা দিল। মাক্‌বেথ আপন আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, সে বাঙ্কোর নিধন বার্ত্তা মাক্‌বেথকে

জ্ঞাপন করিল। মাক্‌বেথ মহা হৃষ্ট হইলেন, তাহার পর যখন সে আবার ফ্লীয়ান্সের পলায়ন বৃত্তান্ত বলিল, তখন মাক্‌বেথের হর্ষে বিষাদ হইল। ফিরিয়া আসিয়া আপন আসন পরিগ্রহ করিবেন, দেখেন সেই আসনে ঘাতুক-ঘাত-লাঞ্ছিত রক্তাক্ত বাঙ্কো মূর্ত্তি উপবিষ্ট। মাক্‌বেথ চকিত, স্তম্ভিতনেত্র হইয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—

'বল তোমরা কে এ কাজ করিলে ?

আমি করেছি বলো না—আমার দিকে তোমার রক্তাক্ত কেশ কম্পিত করিও না।'

মাক্‌বেথ যে ডঙ্কানকে হত্যা করিয়াছেন, এমন কথাটা কাণা ঘুষা অনেকেই করিতেছিল, অনেকেরই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। আজিকার এই কাণ্ডে সকলেই বুঝিল, যে মাক্‌বেথ ডঙ্কানকে হত্যা করিয়াছে—সেই জন্যই তাহার খেয়াল দেখিতেছে।

একেই বলে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। একবারকার পাপের খেয়ালে, তাহার পূর্ব্ব পাপের কথায় লোকে বিশ্বাস করিল।

বাঙ্কোর এই প্রেতমূর্ত্তি কেবল মাক্‌বেথ চক্ষেই দৃশ্যমান্। বিশেষ পুণ্যাত্মাগণ এবং অতি বড় পাপাত্মারা অলৌকিক ভাবে চক্ষুষ্মান হন। একের পক্ষে অলৌকিক দৃশ্য সকল, পুণ্যের পরিণাম এবং সুখের আবহ। অন্যের পক্ষে সেইরূপ ঐ সকল দৃশ্য পাপের পরিণাম এবং যাতনার বিভীষিকা। এই সকল অলৌকিক দৃশ্য তোমরা খেয়াল বলিতে চাও, কল্পনা বলিতে চাও বল, কিন্তু কিছু নয়, বলিও না; স্পষ্টত বিশেষ পুণ্যে বা পাপে যাহার উৎপত্তি এবং পুরস্কার বা দণ্ডদানের জন্য যে সকলের বিধান—সে গুলি কিছুই নয় কেমন করিয়া বলিব ? পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান আছে। বাঙ্কোর ঐ প্রেতমূর্ত্তি সেই দণ্ডবিধানের অঙ্গীভূত—উহা যে কিছুই নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

অল্পক্ষণ পরেই বাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মাক্‌বেথ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে বলিলেন, 'আমার একরূপ রোগ আছে, তাহাতে প্রলাপ বকিয়া থাকি, তাওটা কিছু নয়, তা যাই হোক, এখনও বাঙ্কো আসেন নাই, তিনি আসিলে বড়ই ভাল হয়।'—বলিতে বলিতে বাঙ্কোর মূর্ত্তি আবার মাক্‌বেথ চক্ষে পরিদৃশ্য-মান হইল। মাক্‌বেথ দণ্ডায়মান আছেন আপনার আসনের উপর প্রেতমূর্ত্তি বসিয়া আছে, দেখিতে পাইতেছেন; অন্যে দেখিতেছে শূন্য আসন। তখন সেই

আসনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া—অন্যে বুঝিতে পারিতেছে না কিন্তু বাস্তবিক প্রেতমূর্ত্তির প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

'দূর হ রে দৃষ্টি হতে ; যারে মাটির ভিতরে ;
অস্থিতে মজ্জাত নাই, তোর শোণিত শীতল,
চক্ষু জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তি নাই।
মানুষে যে কর্ম্ম পারে—সাহসে আমি তা পারি ;
আয় তুই, উষ্ক খুষ্ক রুষ ঋক্ষরূপ ধরি,
খড়্গাধারী চর্ম্মী কিম্বা, জিঘাংসিত ব্যাঘ্ররূপে,—
অই মূর্ত্তি ত্যজি আয় অন্য কোন মূর্ত্তি ধরি,
কাঁপিব না আমি ; কিম্বা আবার জীবন্ত হয়ে,
ভীষণ জঙ্গলে আয় সংগ্রামি উভয়ে দ্বন্দ্বে,
যদি কাঁপি কভু তাহে বলিস্ তখন তুই,
বালিকা আমাকে—দূর হ রে বিভীষিকা ছায়া
অলীক অনৃত দৃশ্য, যা রে দৃষ্টিপথ হ'তে!

বার বার দূর দূর বলাতে প্রেতমূর্ত্তি অপসারিত হইল। মাক্‌বেথ স্বীকার করিলেন,—তিনি সকল মূর্ত্তি দেখিতে পারেন, কেবল বাঙ্কোর মূর্ত্তি দেখিতে পারেন না, আবার স্বীকার করিলেন, জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পারেন কিন্তু প্রেত মূর্ত্তি তাঁহার নিকট বড়ই বিভীষিকাময়ী। মাক্‌বেথ স্বীকার করিয়াছেন, প্রেতমূর্ত্তি তাহাতেই অপসারিত হইল ; আর থাকিবার প্রয়োজন কি ? বিধাতার দণ্ডবিধান দেখিবে এইরূপই হইতেছে ; পায়ের বেড়ী আর দেখিতে পাই না, কিন্তু কৈ চলিতেও পারি না ; জগদ্দল পাথর ত আর নাই—কিন্তু কথা কহিতে পারি না। কেন ? প্রেতমূর্ত্তি অপসারিত হইলে, মাক্‌বেথ ঐরূপ কথাই বলিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, আমি আবার সেই তিনটা প্রেতিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, 'আমি শোণিতবাহিনী স্রোতস্বতীতে এত অগ্রসর হইয়াছি যে এখন ফিরিয়া যাইতেও যে কষ্ট, পারে যাইতেও সেই কষ্ট। আমি যখন ডুবিয়াছি, তখন দেখিবে, পাতাল কত দূর ; পাপে এখনও আমি অপরিপক্ক আছি, এইবার পরিপক্ক হইব। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞাতেই মাক্‌বেথের ভীষণ পতন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ স্থলেই তৃতীয় অঙ্কের শেষ বটে, তবে আর দুইটি উপদৃশ্য আছে।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } বৈশাখ, ১২৯৫। } ১০ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৭।

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্ব সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥ ১৮

পদচ্ছেদঃ।—বিরাম-প্রত্যয়-অভ্যাস-পূর্ব্বঃ সংস্কার-শেষঃ অন্যঃ।

পদার্থঃ।—বিরামো বৃত্তীনামভাব স্তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তস্য অভ্যাসঃ তদনুষ্ঠান পৌনঃ পুন্যং তদেব পূর্ব্বঃ যস্য স কশ্চন সংস্কারঃ শিষ্যতে। স্মিন্নিতি অথবা সংস্কারাণাং শেষোস্মিন্নি সংস্কার শেষঃ অন্যঃ পূর্ব্বোক্তসম্প্রজ্ঞাত বিলক্ষণঃ।

অনুবাদ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্নরূপ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। ইহা সকল প্রকার বৃত্তির উন্মূলক পরবৈরাগ্যের বারম্বার অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হয় এবং সংস্কার দ্বারা জন্মের বীজরূপ যে জ্ঞান এবং কর্ম্ম, সেই জ্ঞান এবং কর্ম্মের সম্পর্ক রহিত অথবা সংসারের বীজরূপ সংস্কার সকলের উন্মূলক।

সমালোচনা। অসম্প্রজ্ঞাত শব্দে যে অবস্থায় কিছু জানা যায় না অর্থাৎ যখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব কিছুই থাকে না, চিত্ত আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ধারণ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে; চিত্তের এই রূপ অবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সূত্রকার কৌশলক্রমে ঐ অসম্প্রজ্ঞাতের উপায় এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইসূত্রে তিনটি বিশেষণপদ আছে। (১) বিরাম প্রত্যায়াভ্যাস পূর্ব্ব, (২) সংস্কারশেষ, এবং (৩) অন্য; উহার মধ্যে 'অন্য' এই পদের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; 'অন্য' কি না পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 'বিরাম

প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্ব' এই বিশেষণ দ্বারা তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিরাম বলিতে সমুদয় বৃত্তির অভাব; প্রত্যয় বলিতে কারণ; সমুদয় বৃত্তির অভাবের কারণ একমাত্র পরবৈরাগ্য; ঐ পরবৈরাগ্যের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন যাহার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিরাম প্রত্যয়াভাস পূর্ব্ব। 'সংস্কারশেষ' ইহাদ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সংস্কার-শেষ এই পদের দুই প্রকার অর্থ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, জন্মমরণ প্রবাহরূপ সংসারের বীজ স্বরূপ যে সকল সংস্কার তাহার শেষ অর্থাৎ অবসান যে অবস্থায় হয়, তাহার নাম সংস্কারশেষ। কেহ কেহ সংস্কারশেষের অর্থ করিয়াছেন বুদ্ধি অহঙ্কারাদির অব্যক্তভাবে অবস্থান। তাঁহারা বলেন, ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় বটে, কিন্তু অহঙ্কারাদি তখনও প্রবল সত্ত্ব-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কারণ যোগ ভঙ্গের পর আবার তাহাদের কার্য্য লক্ষিত হয়। ভাষ্যকার এই সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সালম্বনোহ্যভ্যাসস্তৎসাধনায় ন কল্পতে—ইতি বিরামপ্রত্যয়ো নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে সচার্থশূন্যঃ—তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বন-মভাব প্রাপ্তমিব ভবতীত্যেষনির্ব্বীজ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ।" স্থূল হইতে আত্ম-স্বরূপ অবধি যে কোন ধ্যেয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে চিত্তের একাগ্রতা সম্পা-দন করা হয়, সেই সালম্বন একাগ্রতার অভ্যাস অসম্প্রজ্ঞাতের সাক্ষাৎ সাধক হইতে পারে না, কারণ কোনরূপ আলম্বন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উহা সম্প্রজ্ঞাত হইবে। এই জন্য আত্মসাক্ষাৎকারেও পরাঙ্মুখকারী সম্পূর্ণ বৃত্তি-শূন্য পরবৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রবৃত্ত হয় ইহা নির্ব্বস্তুক অর্থাৎ ইহা কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম ধ্যেয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় না; অতএব ইহা অর্থশূন্য; এই অবস্থায় চিত্ত যেন মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ নির্ব্বীজ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ভোজবৃত্তিকার সংস্কারশেষের এইরূপ তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন—"আমরা চিত্তের চার প্রকার পরিণাম দেখিতে পাই—(১) ব্যুত্থান—যোগভিন্নাবস্থা, (২) সমাধিপ্রারম্ভ, (৩) একা-গ্রতা এবং (৪) নিরোধ। যখন চিত্ত ক্ষিপ্ত চঞ্চল অথবা অতিশয় বিমূঢ় আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার ব্যুত্থান অবস্থা; যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্তের একটু স্থিরতা সাধিত হয়, তখন উহা সমাধির প্রারম্ভ (আদিম) অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার পর কোন এক ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিয়া চিত্তের স্থির হইয়া থাকার নাম একাগ্রতা এবং চিত্তের সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য অবস্থার নাম নিরোধ। চিত্তের

এই সকল পরিণামই সংস্কার। উহাদের মধ্যে ব্যুত্থান জন্য সংস্কার সমাধি প্রারম্ভ জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়; সমাধি প্রারম্ভ জন্য একাগ্রতা জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়; এইরূপ নিরোধ জন্য সংস্কার দ্বারা একাগ্রতা জন্য সংস্কারের নাশ হয় এবং পরে নিরোধ জন্য সংস্কার স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

যেমন সুবর্ণ মিশ্রিত সীসক আপনাকে এবং সুবর্ণের মলকে একেবারে দহন করে, সেইরূপ নিরোধ জন্য সংস্কার সংস্কার এবং আপনাকে অন্তর্হিত করে। এই নিমিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধি বলে। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন যে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সংপ্রজ্ঞাত সমাধি জন্য সংস্কারকেও অন্তর্হিত করিয়া রাখে। ইহা নির্ব্বীজ সমাধি, কেননা ইহাতে কোন ধ্যেয় বস্তু থাকে না এবং ইহাতে কর্ম্মের বীজের অভাব থাকে অর্থাৎ এ সময় এমন কোন প্রকার সংস্কার থাকে না যাহা হইতে পরে কোন নূতন শুভাশুভ কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন 'বীজ' শব্দে ক্লেশ কর্ম্মাশয়; উহারা বিদ্যমান না থাকায় উহাকে নির্ব্বীজ বলা যায়। ভাষ্যকার বলেন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার (১) উপায় প্রত্যয় এবং (২) ভব প্রত্যয়; ইহাদের মধ্যে উপায়-প্রত্যয় সমাধি যোগীদিগেরই হয়। প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তিই উপায় প্রত্যয় সমাধির অধিকারী। ভব প্রত্যয় সমাধির অধিকারী দেবগণ এবং প্রকৃতি লীন ব্যক্তিগণ। কিন্তু সূত্রকার প্রথমে উপায় প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন উপায় প্রত্যয়ের বিষয় অনেক বক্তব্য এবং ভব প্রত্যয়ের বিষয় অল্প বক্তব্য, এই জন্য সূচীকটাহ ন্যায়ে * ভব প্রত্যয়ের কথা আগে বলা হইয়াছে নতুবা প্রথমে উপায় প্রত্যয় বলিয়া পরে ভব প্রত্যয় বলা উচিত ছিল।

ভব প্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্॥ ১৯

পদচ্ছেদঃ। ভব প্রত্যয়ঃ বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্।

পদার্থঃ। ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবোঽস্মিন্নিতি ভবো বিদ্যা সংসারো বা প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য (নিরোধ সমাধিঃ) সঃ তাদৃশঃ নিরোধসমাধিঃ, বিদেহা দেবাঃ যেষাং চেতসি স্ব কারণে লীনে পরম পরিতোষো ভবতি ন পরমাত্ম

---

* যদি কোন কর্ম্মকারকে প্রথমে এক ব্যক্তি একখানি কড়া গড়িতে বলে, তাহার পর কেহ সূচ গড়িতে বলে, তাহলে কর্ম্মকার অগ্রে সূচ গড়িয়া পরে কড়ায় হাত দেয়।

দিদৃক্ষা বর্ত্ততে তে প্রকৃতি লয়াঃ বিদেহাশ্চ প্রকৃতিলয়াশ্চ তে তেষাং বিদেহ-প্রকৃতি লয়ানাম্।

অন্বয়ঃ। বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাং ভব প্রত্যয়ো নিরোধ সমাধির্ভবতী তি শেষঃ।

অনুবাদ। যাহারা বিদেহ অর্থাৎ ষাট্‌কৌষিক দেহ রহিত অতএব দেব ভাবাপন্ন এবং যাঁহারা প্রকৃতিতে লীন, তাঁহাদের অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি অবিদ্যা বা সংসারই কারণ।

সমালোচনা। ইহা সকলেই জানেন যে জ্ঞান, শিক্ষা এবং স্বভাব অনুসারে মনুষ্য সকল নানা প্রকার এবং এক এক মনুষ্যের রুচিও এক এক প্রকার সুতরাং যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তদিগের মধ্যে যে ফলের তারতম্য হইবে, তদ্বিষয় বিচিত্র কি? যদিও চিত্ত বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ জন্য স্থিরানন্দ ভোগ করাই সমুদয় যোগাভ্যাসকারীদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু শিক্ষা জ্ঞান, এবং রুচি অনুসারে তাদৃশ নিরোধের উপায় এক এক মনুষ্যের চক্ষে এক এক রূপ। আবার উপায় ভেদে মঙ্গলের তারতম্য হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্ম স্বরূপ দর্শন করিয়া একাগ্রতার অভ্যাস বলে চিত্তকে বৃত্তি শূন্য করার নামই নিরোধ। এই আত্মস্বরূপ লোকের শিক্ষাদি অনুসারে বিভিন্ন; কেহ বা স্থূল পঞ্চভৌতিক দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, কেহ বা ইন্দ্রিয়দিগকে আত্মা বলিয়া জানে, কেহ বা অবিদ্যা বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া জানে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত স্থূল ভূত হইতে পরমাত্মা অবধি ক্রমে ক্রমে আলম্বন করিতে হয়। উহাদের মধ্যে আত্মাই চরম আলম্বনীয়, কিন্তু যাহাদের ইন্দ্রিয়তে আত্ম-জ্ঞান আছে, তাহারা ইন্দ্রিয়কে আলম্বন করিয়া আত্মাকে আলম্বন করিয়াছি এইরূপ ভ্রমে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং ঐ খান হইতে নিরোধ লাভ করিতে থাকে। ঐ সকল যোগীগণ তাদৃশ নিরোধ অবস্থায় শরীর বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয়েতে বিলীন হইয়া ষাট্‌কৌষিক দেহ শূন্য হয়; এইরূপ দেহ শূন্য হয় বলিয়া তাহাদিগকে বিদেহ বলে। ঐরূপ দেহ শূন্য জীবগণই দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রূপ যাহারা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র—ইহাদের মধ্যে যে কোনটিকে আত্মা বলিয়া তাহাকেই চরম আলম্বন করিয়া একাগ্রতা-ভ্যাস দ্বারা নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাহারা ঐ নিরোধ অবস্থায় শরীর বিনষ্ট হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। এই নিমিত্ত উহাদিগকে প্রকৃতি লয় বলে।

ইহাদিগের নিরোধ সমাধির প্রতি অবিদ্যা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত আত্মা নয় তাহাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞানই—কারণ। কেহ কেহ বলেন ঐরূপ দেব ভাব প্রাপ্তি বা প্রকৃতিতে লীন হওয়াই তাহাদের নিরোধ সমাধির প্রতি কারণ, কেননা তাহাদের ঐরূপ অবস্থাই সমাধির অবস্থা।

ভাষ্যকার বলেন এরূপ নিরোধ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ নহে; কারণ বর্ষাকালের অপগম হইলে মণ্ডূক যেমন মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার নূতন মেঘ হইতে জলসেক প্রাপ্ত হইয়া আবার মণ্ডূকাকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহ বা প্রকৃতি লয় যোগীগণ কিছুকাল ঐ বিদেহ এবং প্রকৃতি লয় অবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার আবার সংসারে অবতীর্ণ হয়। বায়ু পুরাণে বলা হইয়াছে—

দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয় চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাশ্চ শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শত সহস্রংতৃষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ॥
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কাল সংখ্যা ন বিদ্যতে।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে আলম্বন করিয়া নিরোধ সমাধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ঐ সমাধি দশ মন্বন্তর অবধি থাকিয়া ভঙ্গ প্রাপ্ত হয়, ভূত চিন্তাকারীরা পূর্ণ এক শত মন্বন্তর নিরোধ অবস্থায় অবস্থান করে, এবং অহঙ্কার চিন্তকেরা সহস্র মন্বন্তর অবধি নিরোধ অবস্থায় অবস্থিত হয়, বুদ্ধির চিন্তাকারীরা দশ সহস্র বৎসর নিরোধ অবস্থায় অবস্থান করে, আর প্রকৃতি চিন্তকেরা শত সহস্র বৎসর; কিন্তু যে ব্যক্তি নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা বশ নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাহার সে সমাধি অনন্তকালেও ভঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। অতএব যে সকল যোগী প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে উৎসুক, তাহারা সেই নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নিরোধ প্রাপ্তির উপায় পরে বলা হইতেছে।

শ্রদ্ধাবীর্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০॥

পদচ্ছেদঃ—শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-প্রজ্ঞা-পূর্ব্বক ইতরেষাম্।

পদার্থ।—শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, বীর্য্যং উৎসাহঃ, স্মৃতিঃ ধ্যানং, সমাধিঃ একাগ্রতা, প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাতব্য বিবেকঃ; এতে শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্ব উপায়া যস্য স শ্রদ্ধাদি পূর্ব্বকঃ ইতরেষাম্ মুমুক্ষূণাং যোগিনাম্।

অন্বয়ঃ। ইতরেষাং সমাধিঃ শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বকোভবতীতি অন্বয়ঃ।

অনুবাদ। ইতর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিদেহ এবং প্রকৃতি লয় ভিন্ন মুমুক্ষু যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাত যোগ—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই কয় উপায় দ্বারা সাধিত হয়।

সমালোচনা। পূর্ব্বসূত্রে যে দুই প্রকার যোগের কথা বলা হইল, ঐ দুই যোগ মুক্তির উপায় নয়, কারণ তাহার মূলভিত্তি ভ্রমের উপর স্থাপিত সুতরাং ঐ ভ্রম আজ হউক, কাল হউক, বা শত সহস্র যুগ পরে হউক, এক সময় অবশ্যই নাশ প্রাপ্ত হইবে; ভিত্তিরূপ ভ্রম অপগত হইলে যোগও ভঙ্গ হইবে। যোগভঙ্গ হইলে ব্যুত্থান অবস্থা, আবার বৃত্তির প্রাচুর্ভাব, আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন। তবে এ স্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যাহারা ঐরূপ যোগ ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা অন্যান্য সংসারী অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া আসে এবং অল্প আয়াসেই আবার তাহারা প্রকৃত মোক্ষপথের পথিক হইতে পারে। ফল প্রকৃত মোক্ষলাভই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপায় এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে।

এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য প্রভৃতি শব্দ কয়েকটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা; বাচস্পতি মিশ্র, ইহার ব্যাখ্যাস্থলে বলেন, "অভিরুচিমতী ইচ্ছার" নামই শ্রদ্ধা; অভিরুচি বলিতে ঔজ্জ্বল্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সম্যক্ প্রাবল্য জন্য দীপ্তি, তাদৃশ দীপ্তিমতী ইচ্ছা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান অভিলাষের নামই শ্রদ্ধা।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ—প্রীতি। আমার যোগলাভ হউক, এই অভিলাষ। ভোজরাজ বলেন, যোগ বিষয়ে চিত্তের অত্যাসক্তির নামই শ্রদ্ধা; ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ ফেথ্ বলিলেই যথেষ্ট হয়। এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রাধ্যয়ন, পার্থিবতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ জন্য অনুমান এবং গুরুর উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শ্রদ্ধা কল্যাণকরী এবং শ্রদ্ধাকারীকে মাতার মত সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করে; একবার যোগের উপর শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় আসক্তি হইলে, যোগই আমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়স্কর অতএব যেমন করে হউক, যোগসাধন করিব এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সহস্র বাধাবিঘ্নও আর যোগীকে যোগসাধন হইতে বিচলিত করিতে পারে না। কারণ

শ্রদ্ধা হইতেই বীর্য্য উৎপন্ন হয়। বীর্য্য শব্দের অর্থ উৎসাহ অর্থাৎ অভীপ্সিত বিষয় লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন। কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে তাহার সাধনের নিমিত্ত মনের যে উৎকট বা দুর্দ্দম্য ঔৎসুক্য হয়, তাহার নামই বীর্য্য; বীর্য্য শব্দের প্রচলিত অর্থ—শক্তি; সুতরাং শ্রদ্ধা হইলে শ্রদ্ধেয় বস্তুর সাধন নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে শক্তি বিশেষের সঞ্চার হয়, এরূপ ব্যাখ্যাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। মনে উক্তরূপ বীর্য্য উৎপন্ন হইলে যোগীদিগের স্মৃতি উৎপন্ন হয়; বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই স্মৃতিশব্দের অর্থ ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছেন; ভোজরাজ প্রভৃতি বলেন, স্মৃতি শব্দের অর্থ—স্মরণ অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতের চিন্তা; আমরা বলি বাচস্পতি ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু-প্রদর্শিত অর্থই ভাল, কেন না কোন এক বিষয়ের সাধন জন্য আমাদের চিত্ত প্রোৎসাহিত হইলে আমাদের তদ্বিষয় চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক; স্মরণও এক প্রকার চিন্তা বটে, কিন্তু উহা পূর্ব্বানুভব-সাপেক্ষ, চিন্তায় পূর্ব্বানুভব অপেক্ষা করে না। স্মৃতির পর চিত্ত অনাকুল অর্থাৎ স্থির হইয়া সমাধিতে নিযুক্ত হয়; সমাধি শব্দের অর্থচিত্তের একাগ্রতা; অর্থাৎ অন্য সকল বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ধ্যেয়বস্তুতে সর্ব্ব-প্রকারে চিত্ত সমর্পণ করাকে সমাধি বলে; এই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক কি না, ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই বিবেকের বারম্বার অনুশীলন দ্বারা পরে উহাতেও বিরক্ত হইয়া যোগী নিরালম্ব ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়; এই নিরালম্ব ধ্যানের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

পাঠক বোধ হয় এই সূত্রের ব্যাখ্যায়ও জানিতে পারিলেন, যোগী হওয়া কিছু সহজ নয়; ইচ্ছা করিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগী হওয়া যায় না। যোগ ভেল্কি দেখাইবার জন্য নয়; মনুষ্যের চরম এবং সমুন্নত উদ্দেশ্য মুক্তিলাভই ইহার ফল। যে যোগ নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃত যোগ নয়, এক প্রকার জিম্‌নাষ্টিকের কস্‌লত মাত্র; তাহার সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদির কিছু আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু যাহা প্রকৃত যোগ, যাহা মোক্ষলাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদি ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, "তুমি যে যোগাভ্যাসের উপায় বলিলে ইহাও সকলের পক্ষে সমান; শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত সকলেরই সমান অতএব যোগসিদ্ধিও সকলের এক নিয়মে হওয়া উচিত, কিন্তু কার্য্যেতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না; আমরা দেখি কেহ যাবজ্জীবন যোগের অনুশীলন করিল, অথচ সিদ্ধিলাভ

হইল না, কাহারও অনেক বিলম্বে সিদ্ধি হইল, কাহারও বা অপেক্ষাকৃত অল্প বিলম্বে সিদ্ধি হইল, আর কাহারও অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইল। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি?" ইহার উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীদিগের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যথা—

তে খলু নব যোগিনো মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি। তদ্ যথা—মৃদুপায়ো, মধ্যোপায়ো, ধিমাত্রো পায় ইতি। তত্র মৃদুপায়োঽপি ত্রিবিধ—মৃদুসংবেগো মধ্যসংবেগস্তীব্র সংবেগ ইতি। তথা মধ্যোপায়, স্তথাধিমাত্রোপায় ইতি।

সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ বৈলক্ষণ্য হইবার কারণ এই যে প্রতি মনুষ্যের সংস্কার এবং অদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই অদৃষ্ট এবং সংস্কার প্রভাবে মনুষ্যের যাবৎ কার্য্যই ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এক বিদ্যালয়ে, এক সময়ে, এক গুরুর নিকট, এক শ্রেণীতে, একইরূপ এক শত বালক এক রীতি শিক্ষা পাইতেছে; কিন্তু ফল কি হইতেছে? কেহ বা গুরুর মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতে অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, কেহ বা নিজে উহা আর একবার দেখিয়াই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে আর কেহ বা গৃহে আসিয়া তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অপর এক জন গুরু কর্ত্তৃক ঐ পাঠই ঘণ্টাদ্বয় নিয়ত উদ্ঘাটিত করিয়াও তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অধীতকে অনধীতের সমান করিতেছে। ইহাত প্রাত্যহিক দৃশ্য। যে কারণে অধ্যয়নে এইরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয়, সেই কারণেই যে অধিকারী ভেদে শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য ঘটিবে, তদ্বিষয় কোন সন্দেহই নাই। সেই শ্রদ্ধাদির বৈষম্য হেতুই তোমার আশঙ্কিত সিদ্ধিরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য নিবন্ধন আমরা যোগীদিগকে প্রথমত; তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি (১) মৃদু উপায়, (২) মধ্য উপায়, (৩) অধিমাত্র উপায়। উপায় বলিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা, স্মৃতি প্রভৃতি; মৃদু শব্দের অর্থ ম্যাদ্‌মেদে (অল্প); ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার মৃদু [অল্প বা ম্যাদ্‌মেদে] সেইরূপ যোগীকে মৃদুপায় বলে; ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার মধ্যম রাশির তাহাকে মধ্যোপায় বলে, এবং ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার অধিমাত্র অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিমাত্রোপায় বলে। উপরি উক্ত তিন প্রকার যোগীর মধ্যে প্রত্যেকেই, মৃদু সংবেগ, মধ্য সংবেগ এবং তীব্র সংবেগ এই তিন প্রকার। সংবেগ শব্দের অর্থ বাচস্পতি মিশ্রের মতে বৈরাগ্য, তিনি বলেন অদৃষ্ট এবং সংস্কারবশে বৈরা-

গ্যেরও মৃদুত্ব, মধ্যত্ব এবং তীব্রত্ব হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন সংবেগ শব্দের অর্থ সম্যক বেগ অর্থাৎ উপায়ের অনুষ্ঠান বিষয়ে শীঘ্রতা। আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত অর্থ অপেক্ষা এই অর্থটি এখানে বিশেষ সঙ্গত। কারণ বৈরাগ্য শ্রদ্ধাদি উপায়ের কার্য্য; উপায়ের মৃদুত্বাদির সঙ্গেই বৈরাগ্যের মৃদুত্বাদি আপনা হইতেই হইবে, বিশেষত সংবেগ শব্দে বৈরাগ্য—কোন অভিধান সম্মত অর্থ নয়। উপায়ের অনুষ্ঠান বিষয়ে শীঘ্রতা কাহারও বা অল্প পরিমাণে কাহারও বা মধ্য পরিমাণে এবং কাহারও বা অধিক পরিমাণে হইলেও অদৃষ্ট এবং সংস্কার বশে কাহার উপায় মৃদু অর্থাৎ অল্প পরিমাণে হয়, কাহার মধ্য পরিমাণে এবং কাহারও বা অধিক পরিমাণে হয়। এই জন্য মোটের উপর যোগীদিগের নয়টি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ করে ধরিলে অনেক ভেদ হইতে পারে।

যাহাদের একেবারেই সিদ্ধি হয় না, অথবা যাহাদের বিলম্বে সিদ্ধি হয়, তাহাদের বিষয় বলা, না বলা সমান; কারণ তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হইবে না; উদ্দেশ্য সিদ্ধির শীঘ্রতার দিকেই সকলে উৎসুক। এই নিমিত্ত সূত্রে যে সকল যোগীর শীঘ্র ফললাভ হয়, তাহাদের বিষয়ই বলিতেছেন,—

অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংযোগানা মাসন্নঃ ॥ ২১ ।

পদচ্ছেদঃ—অধিমাত্র-উপায়ানাং তীব্র-সংযোগানাং, আসন্নঃ।

পদার্থঃ—অধিমাত্রঃ অতিশয়ঃ অধিকপরিমাণ ইতি যাবৎ, উপায়ঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ অধিমাত্র উপায়োযেষাং তে তেষাং, তীব্রঃ অতিশয়ঃ, সংবেগঃ বৈরাগ্যং উপায়ানুষ্ঠানে শীঘ্রতা বা, তীব্রঃ সংবেগো যেষাং তে তেষাং আসন্নঃ সন্নিহিত অনায়াসগম্য ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংবেগাং যোগিনাং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি রাসন্ন ইতিশেষঃ।

অনুবাদ। অধিমাত্রোপায় যোগীদিগের মধ্যে আবার যাহাদের সংবেগ-বৈরাগ্য বা উপায়ানুষ্ঠান তীব্র (অতিশয় প্রবল); তাহাদেরই শীঘ্র অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। এ সূত্রে আমরা অধিক কিছু বক্তব্য দেখিতেছি না, কারণ সূত্রের অনুবাদ হইতেই সূত্রের মর্ম্মার্থ পাঠকদিগের সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

সুন্দরী স্ত্রী।

সুন্দরী স্ত্রী জগতের সার পদার্থ। লাবণ্যময়ী ললনা যে কি অমূল্য রত্ন তাহা বোধ হয় সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। রমণীর সৌন্দর্য্য যে কি অপূর্ব্ব পদার্থে গঠিত, ললিত লাবণ্য যে কি সুকুমার কোমলতার পরিণামে গঠিত, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর অঙ্গবিন্যাসের মধুরতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন পরমাণু সমষ্টিতে নিষ্পন্ন, এবং বিধুমুখের মধুর হাসি বিধাতার কি অপরিসীম নির্ম্মাণ কৌশল, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ কেহই বলিতে পারেন না। সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই; এবং কিরূপ বিচারেই বা তাহার সন্তোষজনক ভ্রমশূন্য মীমাংসা লাভ হইবে, সে উপায়ও কেহই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কবি-কল্পনা-প্রসূত, জগতের অদ্বিতীয় প্রেম-প্রতিমা, সৌন্দর্য্যের রত্নখনি স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকা যে ব্রহ্মাণ্ডের রমণী-সৌন্দর্য্যের রত্ন সিংহাসনের রাজরাজেশ্বরী, তাহা কে স্থির করিয়া বলিবে? জনক দুহিতা আদর্শ-সতী বাল্মীকি-নির্দ্দিষ্টা নিরুপমা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সীতা দেবী, স্বয়ম্বর সভায় মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালিত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, যখন রামগলে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন, তখন তিনিই চিরদিনের জন্য যে সর্ব্বজন-সম্মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া বিঘোষিতা হইয়া রহিলেন, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিবে? মহাভারতের দ্রৌপদী, শেক্সপিয়ারের ক্লিওপেট্রা, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাবতী, বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা—ইঁহারা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ছিলেন, এবং সে সৌন্দর্য্য যে বিচারে সর্ব্ববাদিসম্মত, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিবে?

রমণী-সৌন্দর্য্যের নিরপেক্ষ বিচারক কি মানব-চক্ষু? মনুষ্য—কি পুরুষ কি স্ত্রী—সকলেরই চক্ষু একই পদার্থে গঠিত, ইহা দেহতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকথিত কয়টি ললনাকে কেহই চক্ষে দেখে নাই, কবির বর্ণনায় তাঁহাদের অতুল রূপরাশি এবং নিরুপম সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা লোকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে অনুমান করিতে পারে এই মাত্র। দৈবযোগে সেই কবি-বর্ণিত রূপলাবণ্যময়ী ললনাগণ যদি মূর্ত্তিমতী হইয়া জীবিত অবয়বে এই বঙ্গদেশে লোকের দ্বারে দ্বারে সম্মুখে

আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া কবির রূপবর্ণনা সত্য কি অলীক এই বিচারের প্রার্থিনী হয়েন, তাহা হইলে সে বিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে কি?

প্রত্যুত্তর, সন্দেহের স্থল। প্রথমত আমাদের রূপগর্ব্বিতা বঙ্গমহিলাগণ, আপন আপন অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্যের সহিত তুলনা করিয়া, কেহই সেই কবি প্রসূত স্বর্গীয় লাবণ্যবতীগণকে আপনা হইতে উচ্চাসন প্রদান করিতে প্রাণান্তেও স্বীকার করিবেন না। আমাদের টাক-মস্তক-ময়ী মস্তকের চক্রাকার তরুণচন্দ্র সম টাকের শোভার এতাদৃশ পক্ষপাতিনী যে, তিনি নিশ্চয়ই সহস্র মুখে দ্রৌপদীর সীমন্ত-শোভিত আগুল্ফ-লম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশির বিজাতীয় নিন্দা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। স্বরূপ-পক্ষপাতিনী বঙ্গ-কোটরাক্ষি, কুরঙ্গনয়না ক্লিওপেট্রার আকর্ণপূরিত পটলচেরা নীল গভীর উজ্জ্বলতম নয়নের তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতের নিন্দা নিশ্চয়ই করিবেন। আমাদের দন্তুরা সৌভাগ্যবতী, যিনি বিরলে দর্পণে আপনার হাস্যমুখের নিরতিশয় শোভা সন্দর্শনে চিরদিনই এতাদৃশ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাহার মূল্য এত বুঝিয়াছেন যে, সে অমৃতময় হাস্য দানে কদাচিত অন্যের পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া থাকেন, তিনি ভারত-বর্ণিত বর্দ্ধমান-রাজ দুহিতা বিদ্যার ঈষদ্বিকশিত সুরঞ্জিত অধরোষ্ঠ-মধ্যস্থিত কুন্দ-বিনিন্দিত দন্তপাতির নিন্দা নিশ্চয়ই করিবেন; এবং সেই মধুর হাস্য-উদ্ভাসিত ক্ষণিক রক্তাভবিশিষ্ট স্থল-কমল-সদৃশ নিটোল কপোলে নিশ্চয়ই সজোরে চপেটাঘাত করিবেন। এইরূপে কার্পাস বস্তা সম স্থূলাঙ্গী,—কন্দর্পের যষ্টি সদৃশ ছিপ্‌ছিপে ক্ষীণাঙ্গীর, গতি শক্তি-বিহীনা কিম্বা দন্তভরে পদ শব্দকারিণী—দ্রুতগামিনীর মৃদুমন্দ মন্থর গমনের, এবং উচ্চভাষিণী,—কোকিল কলকণ্ঠবিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতময় সুস্বরেরর নিন্দা প্রাণ ভরিয়া করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, রমণীর চক্ষু রমণী রূপের বিচারক নহে।

দ্বিতীয় বারে, পুরুষের চক্ষুকে সেই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেখা যাক্, সে পবিত্র চক্ষু রমণীসৌন্দর্য্যের যথাযথ বিচার করিতে পারে কি না। দেখা যাইতেছে যে, দেশভেদে রমণীসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুরুষের চক্ষের বিচার বিভিন্ন প্রকার। বঙ্গীয় যুবক, শারদীয় অখণ্ডমণ্ডল গোলাকৃত পূর্ণশশী সদৃশ রমণী মুখমণ্ডলের পক্ষপাতী, নারীতে নবীন নীরদ মালাবৎ আগুল্ফ-লম্বিত ঘন কেশরাশির অভিলাষী, সেই কেশ আবার বিচিত্র বেণী বন্ধনে উজ্জ্বল সুবর্ণ বিমণ্ডিত করিয়া নীলাম্ভোদ ক্রোড়ে বিজলীর ক্রীড়া দেখিতে

ভাল বাসেন, দুগ্ধে অলক্ত গুলিয়া রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ঢালিতে একান্ত লালায়িত এবং কজ্জল-পূরিত ঈষদ্-ভাসিত চঞ্চল নয়নের কন্দর্প-দর্পহারী বাণ সন্ধানে অভিভূত হন। কিন্তু বঙ্গীয় যুবকের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর এত সাধের সৌন্দর্য্য ইয়ুরোপীয় যুবকের নয়নে নিতান্ত অপ্রীতিকর। লম্বাকৃত মুখ, রাজহংস সদৃশ উচ্চগ্রীবা, তুষার ধবল বর্ণ, আপৃষ্ঠলম্বিত মাত্র তাম্রবর্ণ আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ, অণুমাত্র লজ্জাবিহীন স্থির কট্‌মটে নয়ন, বর্ণবিহীন অধরোষ্ঠ, শীর্ণ দেহ, দীর্ঘাকৃতি, চঞ্চলগামিনীকে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া থাকেন। চীন, আরাকান এবং মণিপুরীয়গণ রমণীর মুখমণ্ডলে তুলি দিয়া আঁকা কৃষ্ণ ভ্রূ যুগল দেখিলে মূর্চ্ছিত হয়েন, খাঁদা নাকের সৌন্দর্য্য তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, রমণীর মুখে তাঁহারা উন্নত কিছুই দেখিতে ভাল বাসেন না; কোন রমণীর নাক, চোক, ঠোঁট, কান, মুখে মিশাইয়া থাকিলেই ইহাঁরা তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া সেই স্ত্রীর পূজা করেন। এদিকে আফ্রিকার রমণীর রং যতই ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে ততই তিনি পুরুষের চক্ষে সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন; অধর ওষ্ঠ যতই স্থূল হইবে, ততই তিনি সুন্দরী বলিয়া পূজিত হইবেন; দেহ যতই কোমলতা শূন্য এবং বলিষ্ঠ হইবে, গাত্র চর্ম্ম যতই কর্কশ হইবে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা দেশময় ততই বিঘোষিত হইতে থাকিবে। এইরূপে কোন জাতি রমণীর কটিদেশ অনায়াসে ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করেন, কোন জাতি স্থূল শ্রেণীর একান্ত পক্ষপাতী। কেহ কামিনীতে তীব্রতেজ দেখিতে ভাল বাসেন, কেহ বা ধীর শান্ত মূর্ত্তির অনুরাগী। কোন জাতি বিজলি সদৃশ চঞ্চলার অভিলাষী, কেহ রমণীকে স্থিরা ধীরা দেখিতে ইচ্ছা করেন। অতএব পুরুষের জাতীয় চক্ষুকেও প্রকৃত প্রস্তাবে রমণী-সৌন্দর্য্যের ভ্রম প্রমাদ পরিশূন্য বিচারক বলিতে পারিলাম না।

পরীক্ষার সীমা সংকীর্ণ করিয়া হিন্দু বামাকুলের সুন্দরী নির্ব্বাচনের ভার বঙ্গীয় যুবকের চক্ষে সমর্পণ করিলাম। বল দেখি যুবক, সুন্দরী কে? সীতা সুন্দরী কি লক্ষ্মী সুন্দরী? সাবিত্রী কি দময়ন্তী? রাধিকা কি সত্যভামা? বিদ্যা না কুন্দনন্দিনী? ছোটবৌ সুন্দরী না দত্তদের দামিনী সুন্দরী? কে সুন্দরী? যুবক, সদ্য-প্রস্ফুটিত শিশির-সিক্ত বালঃসূর্য্য-রশ্মি-ধৌত মনটীকৃষ্ণ সুন্দর, কি স্থলকমল-লাঞ্ছিত দীর্ঘায়তন, প্রকৃত গোলাপী বর্ণের চরম উপমা স্বরূপ পল্‌নিরো সুন্দর? যুবক, মল্লিকা ও মালতীর, যোজনগন্ধা ও চামিলীর সৌরভের কি তারতম্য করিতে পার? যদি সে ক্ষমতা থাকে তবেই

তুমি বামাকুলে তুলনায় সুন্দরী নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে, নচেৎ পারিবে না। তবে বলদেখি কি সাহসে একমাত্র স্বচক্ষু সহায়ে এ অসীম রমণী-রূপ-সাগর নিয়ত নিরতিশয় মন্থন করিয়া সুন্দরী ললনা নির্ব্বাচন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছ? তুলনায় সুন্দরী নির্ব্বাচন প্রথা তোমার পক্ষে অতীব জটিল; সে কেবল রূপ সাগরে হাবুডুবু খাওয়া মাত্র।

অথবা তোমারই পবিত্র রুচি, যে সর্ব্বজন-সম্মত তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? রমণীর যে নির্দ্দিষ্ট রূপ মাধুরী তোমার তৃপ্তি সাধনে সক্ষম, হয় ত তাহাই আবার তোমার অভেদাত্মা পরম বন্ধুর অপ্রীতিকর। যে ললনা সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা প্রদর্শনে প্রতিনিয়ত তোমার নয়নানন্দ উৎপাদন করিতেছে, যাহার অতুল রূপরাশি সন্দর্শন-সম্ভোগে তোমার চির-তৃষাতুর নয়ন ক্ষণমাত্র বঞ্চিত হইলে তুমি অস্থির হইয়া উঠিতেছ, তোমারই বন্ধু হয় ত তাহার প্রতি বারেক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। যে সৌভাগ্যবতীকে তুমি নির্দ্দোষ সুন্দরী বলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে ঘোষণা করিতেছ, হয় ত তোমারই পরম বন্ধু তাহাকেই কুৎসিত এবং কদর্য্য বলিয়া নিন্দা করিতেছেন;—অথচ তোমার বন্ধুর সহিত অন্য কোন বিষয়েই তোমার মতভেদ নাই। অতএব এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশে দুই জন বঙ্গ যুবক একমতে এই সাগর সম বঙ্গললনা কুল হইতে একটী মাত্র সুন্দরী স্ত্রী বাছিয়া দিতে অক্ষম;—অথচ সকল যুবকের চক্ষু একই উপাদানে গঠিত।

যুবক! এক মাত্র তোমারই চক্ষুকে এ বিচার কার্য্যে বরণ করিতেও সাহস হয় না। কেন না তোমার চক্ষু তোমারই বিশ্বাসের পাত্র নহে। তোমারই চক্ষু তোমাকেই প্রতিনিয়ত প্রতারিত করিতেছে। আজ যাহাতে তোমার চক্ষু জগতের অদ্বিতীয় এক মাত্র পরমা সুন্দরী বলিয়া অকপট হৃদয়ে অসন্দিগ্ধচিত্তে লোক সমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছে, কাল আবার সেই তোমারই চক্ষু তাহাকে সে উচ্চাসন হইতে সজোরে ভূমিতে নিপতিত করিয়া তাহাতে অন্য এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহারই পূজা করিতেছে। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনবরত অনন্যমনে যে অঙ্গনার অতুল রূপরাশি প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করিয়া তন্ন তন্ন বিচারে সুদৃঢ়রূপে অটল এবং অভ্রান্তভাবে নির্দ্দোষ এবং নিখুঁত সুন্দরী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, হঠাৎ অন্য এক স্ত্রী মূর্ত্তি ক্ষণমাত্র বিজলির ন্যায় তোমার নয়ন পথে পতিত হইয়া তোমার সে সমস্ত দৃঢ় সংস্কারকে এককালে ভস্মীভূত

করিয়া দিতেছে। আবার দেখিতেছি সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে দর্পণের ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া প্রতিনিয়ত তোমার সেই একমাত্র বিচার-সম্বল চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া যেমন এইবার অভ্রান্ত বিচারে সৌন্দর্য্যের চরমসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইতেছে, অমনি এক তৃতীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র অবিশ্বাসী চির-প্রতারক চক্ষের সহায়তায় রমণী জগতে সুন্দরী নির্ব্বাচনের এতাদৃশ অব্যবস্থিত মীমাংসা কি প্রকারে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিব?

যুবক! এই রহস্যভেদে যত্নবান্ হও। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের চক্ষুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের বিচারক; কিন্তু প্রণয়-নিয়োযিত চক্ষু ভিন্ন অন্য চক্ষের সে কার্য্য সাধন করা দুরূহ। প্রণয়ীর চক্ষুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের সার মর্ম্মগ্রাহী। প্রণয়ীর নয়নেই প্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। যে যাহাকে ভাল বাসে, সেই তাহার সুন্দরী, সেই তাহার স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী, সেই তাহার সার রত্ন। জগতের যাবতীয় লোকের চক্ষে সে রমণী কদাকার এবং কদর্য্য প্রতিপন্ন হৌক, প্রণয়ীর চক্ষে সেই একমাত্র পরমাসুন্দরী, একমাত্র নয়নানন্দ প্রদায়িনী এবং পার্থিব সুখের সেই একমাত্র অমৃতময় আকর স্থল। প্রণয়ী যে চক্ষে আপন প্রিয়তমাকে সন্দর্শন করেন, জগতের যাবতীয় অন্য লোক সে পবিত্র চক্ষু-বিহীন। ভালবাসার চক্ষু স্বতন্ত্রপদার্থ। সে পবিত্র পদার্থ প্রণয়ীর সৌভাগ্য-সঞ্চিত; অন্যের দুর্লভ। প্রণয়ীর সে সুখ স্বর্গীয়, দেব-দুর্লভ এবং পবিত্র সঙ্গীতময়। ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই সেই সুখ বিধি-নির্দ্দিষ্ট।

বঙ্গীয় যুবক, অকপট চিত্তে বল দেখি, যাহাকে তুমি ভাল বাসিয়াছ, যাহাকে তুমি ভালবাসার পবিত্র চক্ষে অবলোকন করিয়াছ, সেই তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কি না? তোমার হৃদয়াকাশের সেই পূর্ণশশী কি না? ভাবিয়া দেখ দেখি, সেই মঙ্গলময় পবিত্র মূর্ত্তির বিমল জ্যোতির প্রভাবে তুমি সমস্ত জগত জোৎস্নাময় দেখিতেছ কি না? তাহাকে ভাল বাস বলিয়াই তুমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকে ভালবাস কি না? সেই বিধুমুখের সুমধুর হাস্য তোমার সমস্ত মঙ্গলের কারণ কি না? কে তোমাকে জগতের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়? অসাধ্য সাধনে কে তোমার হৃদয়ে বলের সঞ্চার করে? কার্ উৎসাহে তুমি বিমুগ্ধ হইয়া নৈরাশ্যের দুর্জ্জয় শেলকে পুনঃ পুনঃ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে সক্ষম হও? দুর্ভাগা বঙ্গদেশে, এই অধীনতার চির-নিবাস মাতৃভূমিতে, কুকুরের বৃত্তি দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া উদয়াস্ত গাধার

খাটুনি খাটিয়া, ইংরাজের পদাঘাত শিরোভূষণ করিয়া, মুষ্টিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণে তুমি কার্ জন্য জীবন ধারণ কর? যুবক, এখন একবার তোমার হৃদয়-মন্দিরের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত বহির্জগতের সমস্ত রূপরাশির তুলনা করিয়া বল দেখি, তোমারই প্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কি না? মানসাঙ্কে কবি-কল্পিত সুন্দরী ললনাগণকে মূর্ত্তিমতী করিয়া অনিমিষ লোচনে অনন্যমনে নিরীক্ষণ কর, জগতের জীবিত যাবতীয় যোষিদ্‌গণকে দিব্য চক্ষে প্রতিনিয়ত অবলোকন কর, করিয়া বল দেখি, তোমারই প্রণয়-প্রতিমা এ জগতে একমাত্র সুন্দরী কি না?

ভালবাসা পার্থিব পদার্থ নহে; স্বর্গের অমূল্য রত্ন। নিঃস্বার্থ ভাল-বাসা যাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, জগতে তিনিই সৌভাগ্যবান্। সর্ব্বত্যাগী শিবই একবার নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন। বঙ্গীয় যুব-কের অদৃষ্ট প্রসাদাৎ ভারতের অপূর্ব্ব কৌশলময় ধর্ম্মবিবাহে সেই ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর সংসারাশ্রমে ধর্ম্মের অভাবনীয় কারণ সূত্রে সেই অমৃতময় ভালবাসার বীজ বঙ্গীয় যুবকের বক্ষঃ-স্থলে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্যই বঙ্গীয় যুবক সহধর্ম্মিণীকে নিরতিশয় ভাল বাসেন। সেই জন্যই বাঙ্গালির নয়নে স্ত্রীই সুন্দরী। অতএব যুবক, কেহ সুধাইলে নির্ভয়ে বলিও—"আমার স্ত্রীই সুন্দরী।"

তৈমুর সংহিতা।

তৈমুরের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। পাঠানরাজ মহম্মদ তগলকের রাজত্বকালে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সে আক্রমণ-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, এই আক্রমণ সময়ে তৈমুর, দয়া, ধর্ম্ম বা ন্যায়পরতার পরি-চয় দেন নাই। তিনি পারস্য, তাতার, সাইবিরিয়া লুণ্ঠনপূর্ব্বক কাবুল দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করেন। শতদ্রুর তটে এই দুই দল সৈন্য একত্র হইয়া পথবর্ত্তী দেশসমূহ লুণ্ঠন করিতে

করিতে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হয়। দিল্লীশ্বর গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়। অধিবাসীগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। যে মোগলের শাসনমহিমায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, বহুপূর্ব্বে সেই মোগলগণই তৈমুরের অধীনে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটায়; কিন্তু তৈমুর নিজ রাজ্যের সুশাসন জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে উদাসীন থাকেন নাই। তৎ-প্রণীত সংহিতা সংগৃহীত ও ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই সংহিতায় তৈমুরের সদাশয়তা, শাসনশৃঙ্খলা ও দয়া দাক্ষিণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠে এক সময়ে যাঁহাকে মূর্ত্তিমান কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হয়, ঐ সংহিতাপাঠে তাঁহাকেই আবার শান্ত, দান্ত ও মধুরপ্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহার সংহিতা তদীয় করালসংহার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অনুপম সৌম্যপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা এই সংহিতায় তৈমূরের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাই। আমরা ক্রমশ তৈমুর সংহিতার পরিচয় দিব। শেষে এই সংহিতা অবলম্বন করিয়াই তৈমুরের চরিত্র সমালোচনা করা যাইবে।

তৈমুর সৈন্যদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় ব্যবস্থার বঙ্গানুবাদ এইরূপ:—

"আমি নিয়ম করিয়াছি যে, প্রত্যেক যোদ্ধার স্বত্বাধিকারের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। যে সৈনিকপুরুষ বয়োবৃদ্ধ হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বা বেতন হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা হইবে না। যে সকল সৈনিক যোগ্যতানুসারে সম্মান ও পারিতোষিক পাইয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। যদি কোন যোদ্ধা আপনার পারিতোষিক হইতে গোপনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহা অবিচার বলিয়া গণ্য হইবে।"

"যে সকল সামন্ত, মন্ত্রী, যোদ্ধা আপনাদের কার্য্যকারিতার দ্বারা আমার সাম্রাজ্য সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের পরাক্রমে বিপক্ষদল পরাজিত হইয়াছে,—রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, যাহারা যুদ্ধে আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বত্বাধিকারের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা যাইবে, এবং তাহাদের কার্য্যের সমুচিত মূল্য প্রদান করা যাইবে।

"বৃদ্ধ যোদ্ধাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। তাহারা যে

পরামর্শ দেন তাহা মনোযোগের সহিত শুনা যাইবে। যেহেতু তাহারা আপনাদের বহুদর্শিতাবলে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাহারা আমার সাম্রাজ্যের ভূষণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহাদের মৃত্যুর পর তদীয় সন্তানেরা তাহাদের কার্য্য ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

"যে সকল বিপক্ষসৈন্য সমরে বন্দী হয়, তাহাদিগকে বধ করা হইবে না। যদি তাহারা আমার অধীনে কার্য্য করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে, নচেৎ তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করা যাইবে। এইরূপে আমি এক সময়ে চারি হাজার তুরুককে বিমুক্ত করিয়াছি।

'আমি আদেশ দিয়াছি যে, যে সকল সৈন্য আপনাদের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়াছে, যাহারা আমার শত্রুপক্ষের পার্শ্বে থাকিয়া আপনাদের সাহস দেখাইয়াছে, তাহারা যদি ইচ্ছা করিয়া, অথবা প্রয়োজন বুঝিয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও আদর প্রদর্শিত হইবে। কারণ, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব প্রভুর কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিল, এবং সেই প্রভুর প্রতি যথোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল।

"আমি এইরূপে শের বহরাম নামক এক জন সৈনিকপুরুষকে পুরস্কৃত করিয়াছি। এই সৈনিকপুরুষ আমীর হোসেনের সহিত আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ সাহসে সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। যখন তিনি প্রয়োজন বশত পলাইয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন আমি যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি।

"মোঙ্গোলী-বুখা নামক এক জন বীরপুরুষ রাল্খের যুদ্ধে সৈন্যগণের সহিত আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি তাহার নিকটে আমার পক্ষ অবলম্বনের প্রস্তাব করি; কিন্তু তিনি তগল্‌ক তৈমূর খাঁর সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার আদেশে তদীয় সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। তিনি যথোচিত সাহস ও ধীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হন।

"কিন্তু উক্ত সৈনিকপ্রধান যখন অবশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার ক্ষমতার নিকট অবনতমস্তক হন, তখন আমি তাঁহাকে একটী উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করি, এবং আমার বিশেষ অনুগৃহীত কর্ম্মচারীদিগের শ্রেণীভুক্ত করি। আমি সকল

সময তাঁহাব সৎকার্য্য, সদাচাবেব প্রশংসা কবিযাছি। আমি তাঁহাব প্রতি একরূপ অনুগ্রহ দেখাইযাছি যে, যদি তাঁহাব হৃদযে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব থাকে, তাহা হইলে উহা ঐরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শনে সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ—

যামিনী।

১ম অধ্যায়।

যামিনীব পিতা কলিকাতায চাকবী কবিতেন। যামিনী একমাত্র কন্যা সুতবাং অতি আদবে লালিতা পালিতা হইত। তাহার মাতাব নাম দেব দাসী তিনি চলিত বকম লেখা পডা জানিতেন—সুতবাং যামিনীকে লেখা পডা শিখাইতে তাঁহাব বেশ যত্ন ছিল।

যামিনীব পিতা হিন্দু কি ব্রাহ্ম ছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তবে দেশেব যাবতীয সৎ কার্য্যে তাহাব বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। তিনি যদিও সমাজে যাইতেন না এবং দেশে তাঁহাব বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত না—তথাপি ব্রাহ্ম সমাজে দান কবিতেন, এবং অনাথা হিন্দু বিধবাকে তীর্থাদি দর্শন কবিবাব জন্য যথাসাধ্য সাহায্য কবিতেন।

স্ত্রী কন্যাকে জামা পাদুকা ব্যবহাব কবিতে দিতেন এবং বিশেষ বন্ধু লোকেব সহিত আলাপ আপ্যাযিত কবিতেও দিতেন। খবচ পত্র চাল চলন সকলই তাঁহাব আধুনিক উচু দবেব ভদ্রলোকেব ন্যায ছিল সুতবাং—যাহা উপার্জ্জন কবিতেন, প্রায সকলই ব্যয় হইত। যামিনী পাঁচ ছয় বৎসর বয়েস হইতেই স্কুলে যাইয়া রীতিমত লেখা পড়া শিখিত।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ নামে একটী দশ বৎসর বয়সেব পিতৃ মাতৃ হীন বালক তাঁহাদের বাসায থাকিয়া লেখা পড়া কবিত। দেব দাসী তাহাকে পুত্রেব ন্যায় ভাল বাসিতেন, যামিনীও তাহাকে বড় ভাল বাসিত।

২য় অধ্যায়।

যামিনী ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বড় হইল। এখন যামিনীর বয়েস ১৪ বৎসর। আর রামকৃষ্ণ ১৮ বৎসরের হইয়াছে। উভয়ের প্রতি উভয়েরই ভাল বাসা,—ভাল বাসার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে।

এখন দুই জন একত্র হইলে উভয়েই শঙ্কিত হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অথচ ভয় বা শঙ্কাজনক কোন কাজই তাহারা করিতেছে না।

যামিনী বড় চতুরা—এক দিন সে শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে দৈবাৎ অন্য কার্য্যে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে যামিনীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। যামিনী তাহাকে হাসিয়া বলিল "তুমি কি আমাকে দেখিয়া এখন ডরাও?" রাম বলিল-"চুপ কর"—কেহ শুনিবে।"

যামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে রামকৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি আজ সুধু সুধু এত ভয় করিতেছ কেন—আমায় বলিতে হইবে?"

রামকৃষ্ণ বলিল—"বোধ হয় আর একটু বড় হইলে তুমিও আমায় দেখিয়া ডরাইবে।"

যামিনী "বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—তা ডর ভয় কি—তবে হঠাৎ নির্জ্জনে তোমাকে দেখিলে আমার একটু একটু গা কাঁপে—ইচ্ছা হয়"——বলিয়া হাসিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ বলিল—"কি ইচ্ছা হয়, যামিনী!"

যামিনী বলিল—"তোমার ঐ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দি।"

রামকৃষ্ণ সাহস পাইয়া বলিল "আমারও ইচ্ছা হয়—তোমার ঐ সীঁথায় খানিক সীঁদুর পরাইয়া দিই।"

এই সময়ে কাহার পদ শব্দ হইল, উভয়ে ভয়ে ও নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৩য় অধ্যায়।

দেব-দাসী—সকল কথোপকথনই শুনিয়াছিলেন—আকারে প্রকারেও বুঝিয়া ছিলেন—যামিনী রামকৃষ্ণকে ভাল বাসে, আর এখন তাহার বিবাহেরও বয়েস হইয়াছে—তাই সকল কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিয়া অনুরোধ করিলেন-"রামের সঙ্গে যামিনীর বিবাহ দাও?"

তাহার স্বামী হাসিয়া বলিলেন “কি বিবেচনায় এ কথা বলিতেছ ?”

“কেন দোষ কি ?”

“অনেক দোষ ?”

“কি দোষ ?”

“আমরা ব্রাহ্মণ, রাম শূদ্র।”

“তা দোষ কি ? না হয় দেশে যাব না।”

“দেশে না গিয়া চলিতে পারে, সমাজ ছাড়িতে পারি না।”

“অন্য সমাজ ত আছে ?”

“যদি একটা সমাজ ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে হইল, তবে যেটা আছে সেই ত ভাল ?”

“তবে ত রামের সঙ্গে বিবাহ হইবে না ?”

“না হোক—সমাজে অনেক ভাল ছেলে আছে ?”

“রামকে যে যামিনী ভাল বাসে ?”

“ওটি ভাল বাসা নহে-পিপাসা ?”

“পিপাসা কিরূপ ?”

“বয়েস হইয়াছে—এ সেই বয়সের ভাল বাসা ; এখন তাড়াতাড়ি সুপাত্রে বিবাহ দিলেই আবার তাহাকেই ভাল বাসিবে।?

“তুমিইত বলিয়া ছিলে হিন্দুসমাজ ভাল নহে।”

“হুঁ, কোন কোন অংশে ভাল নহে, কিন্তু তুলনায়—অন্যান্য সমাজ থেকে ভাল।”

“আমি ত দেখিতেছি ইহাতে দোষই অনেক ; স্ত্রী স্বাধীনতা নাই। কথায় কথায় জাতি যায়। অসবর্ণে বিবাহ নাই। বিধবা বিবাহ নাই।”

“কিন্তু সেগুলি ভাল কি মন্দ তা তুমি জান না—স্ত্রী স্বাধীনতায় সমাজ উৎশৃঙ্খল হয়, কলিকাতায় ও ইউরোপাদির দৈনিক পুলিশ কোর্টের তত্ত্ব রাখিলে বুঝিতে পারিতে। জাতি সম্বন্ধে হিন্দুরা অনুদার, তবে উদ্দেশ্য ভাল পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই এ সকল বিষয়ে এতটা আঁটা আঁটি। অসবর্ণ বিবাহে জাতীয় প্রকৃতি আকৃতি, জাতীয় প্রতিভা, জাতীয় মহত্ত্ব ধ্বংস পায়। বিধবা বিবাহেও সেইরূপ পতি ভক্তি, স্নেহ ও পবিত্রতা ধ্বংস পায় এবং বিবাহ একটা ইন্দ্রিয় সেবনের ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। বারাঙ্গনায় আর বহুবার পরিণীতা রমণীতে কিছুই প্রভেদ থাকে না।—

দেব-দাসী হাসিয়া বলিলেন—"তর্কালঙ্কার মহাশয় আমি হারি মানিলাম, এখন যেখানেই হোক্ শীঘ্র বিবাহটা দেওয়া চাই ?"

তাহার স্বামী বলিলেন—"এবার পূজার সময় বাড়ী যাইয়াই বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

"রামকৃষ্ণ কি করিবে ?"

"একটী চাকরীর সুবিধা করিয়াছি, তাই করিবে।"

"কত পাইবে ?"

"৩০৲ টাকা।"

* * * * * *

কয় দিন পরে রামকৃষ্ণ চাকরীতে নিযুক্ত হইল—এবং স্থানান্তরে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিল।

৪র্থ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ আজি চারি বৎসর যাবৎ চাকরী করিতেছেন,—এ অনুরোধের চাকরী তাই টিকিয়া রহিয়াছেন। সদাগর আপিসের বড় বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ, সেই অনুগ্রহেই রামকৃষ্ণের সাহস এবং কর্ত্তব্য কাজে তাচ্ছিল্য।

রামকৃষ্ণ বাবু সর্ব্বদাই অন্য মনস্ক। আপিসের কাজ তাড়াতাড়ি একরূপ নিঃশেষ করিয়া-কাগজ ও পেনশীল লইয়া আপনার লেখা লেখেন---লোকে দেখিয়া বিস্মিত হয় আর মনে মনে ভাবে, হায় এমন চিন্তাশীল---এমন---পণ্ডিত এমন কবি, সে কেন কেরাণীগিরি করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে!

রামকৃষ্ণ অনেকের মুখে অনেক সময় এ কথা শুনিতে পান্—কেহ সরলান্তঃকরণে তাঁহার কবিতার প্রশংসা করে—কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে--কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন—যথার্থই তিনি একজন প্রধান শ্রেণীর কবি,—কেরাণীগিরি রূপ সামান্য ব্যবসা তাঁহার স্পর্শে সম্মানিত হইতেছে।

তাঁহার মনে মনে সাহস হইয়াছে, তাঁহার কবিতা বঙ্গভাষার রত্ন স্বরূপ হইবে, এক দিন তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কালিদাস বলিয়া গণ্য হইবেন—বাঙ্গালী আদর করিয়া তাঁহার কবিতা বহি কিনিয়া পড়িবে—তাঁহার মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি গঠন করিবে সুতরাং তিনি কেন সামান্য কেরাণীর কাজে তাঁহার অমূল্য সময় ক্ষেপণ করিবেন ?

বড় বাবু কাজে বিলক্ষণ তাচ্ছল্য দেখিয়া মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে তিরস্কার করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন—"মহাশয় বেতন ত ত্রিশ —কত খাটা যায়।" আর বড় বাবু যদি বলেন—"এ ভাবে কাজ চলিলে এ ত্রিশও যে রাখা দায় হইবে"—তখন তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন "২৪ ঘণ্টা খাটিয়া একটী কবিতা লিখিলে ১০৲ টাকাত তার দাম হইবে?"—বড় বাবু ঘৃণার ভাবে হাসিয়া চলিয়া যান।

রামকৃষ্ণ আপিসের কাজ "যেন তেন প্রকারেণ" নির্ব্বাহ করিয়া-একদিন কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ডাক হরকরা একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি কবিতার পদ পূরণ করিয়া চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠির বিবরণ এই—

প্রিয় রামকৃষ্ণ বাবু!

পিতার মৃত্যুর পর-মাকে আমার কাছে রাখিয়া ছিলাম। কিন্তু আমিও এখন বিধবা। মাও আমি উভয়েই বড় কষ্টে আছি, ইচ্ছা হয়, তোমাকে একবার দেখি—আর তুমিও একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, আমরা কি দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি। তিন মাস হইল, আমরা তোমার কোন পত্র পাই নাই সুতরাং শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী
শ্রীযামিনী দেবী।

"বড় বড় কবিরা এবং দার্শনিকেরা অতি মহৎ, তাঁহাদের প্রাণ অতি উচ্চ তাঁহারা অতি উদার—তাঁহারা পর দুঃখে অতি কাতর"—রামকৃষ্ণের এই কয়টী কথা শুনা ছিল, অথবা তিনিও সেই শ্রেণীর একজন উদার লোক হইবেন—কেন না ঐ চিঠিখানি পাইয়া তখনই দুই খানী চিঠি লিখিলেন ও মনি অর্ডর করিয়া ৫০৲ টাকা পাঠাইলেন।

১ম পত্র।

যামিনি!

হায়! তোমার পত্র পাইয়া প্রাণ অস্থির হইল—আর তোমাদের বিপদের কথা পড়িয়া এক প্রকার মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িয়াছিলাম—যাহা হউক সকলই বিধির বিধান—চিন্তা করিও না, আমি জীবিত থাকিতে কষ্ট পাইবে না। মা ও তুমি যত শীঘ্র পার এইখানে চলিয়া আসিবে। স্নেহাকাঙ্ক্ষী

রাম।

২য় পত্র।

"মাতঃ, পত্রে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না, আমার সময় অমূল্য, অল্প। *দেশে থাকিয়া কষ্ট পাইবেন না। আমি আপনার জন্য বাড়ী ভাড়া করিলাম, যামিনীকে লইয়া আসিবেন----খরচ ৫০৲ টাকা পাঠাইলাম। কবে রওনা হইবেন, অগ্রে জানাইবেন।

সেবক শ্রীরামকৃষ্ণ দাসস্য।

৫ম অধ্যায়।

দেব দাসী পত্র ও টাকা পাইয়া যামিনীকে বলিলেন—"তোমার পিতা আমাদের ভরণপোষণ জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তোমাকেও এমন ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন যে, এখন অন্নাভাবে ভিক্ষা কবিতে হইবে—এই কয় মাসে অনাহারে মৃতকল্প হইয়াছ, কলিকাতা যাই, রামকৃষ্ণ আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করিতে পারিবে না; বিশেষ সেথানে তোমার পিতার অনেক বন্ধু আছেন, আমরা বোধ হয় অনাহারে মরিব না।"

যামিনী বুদ্ধিমতী হইলেও, বিপদে এবং অন্নকষ্টে মাতার পরামর্শ ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "মা, তুমি যদি যাও, তবে আমি আর কার কাছে থাকিব—উচিত হউক, অনুচিত হউক, আমিও যাইব।"

দেব দাসী বলিলে—"যাওয়াই স্থির। দেথ আমরা দুঃথিনী, আমাদের এ সংসারে কেহ নাই—রাসকৃষ্ণেরও কেহ নাই, তাহাকে সন্তানের মত পালন করিয়াছি। আহা! যদি তোমার পিতা আমার কথা শুনিতেন, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, তবে আর এ দুঃখ হইবে কেন?"

মায়ের কথা শুনিয়া যামিনীর চক্ষে জলধারা বহিল—তিনি বলিলেন—"মা দুঃখে ও দারিদ্রেই লোকের জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, ধর্ম্মের জন্য এ জগতে কটা লোক জাতি ও সমাজ ও স্বদেশ ছাড়িতে পারে—বাবা যথন ছিলেন, তথন দুঃখ-দারিদ্র ছিল না, তাই তিনি তোমার কথা শুনেন নাই—তিনি ভালই করিয়াছিলেন, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ।"

দেব দাসী বলিলেন, "তা ঠিক্। আমিও দুঃখ আর সহিতে না পারিয়াই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি।"

যামিনীর মাতা যাওয়ার দিন স্থির করিয়া কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং যথা সময়ে কলিকাতা রওনা হইলেন।

যামিনী কিছুই প্রতিবাদ করিলেন না, নীরবে মায়ের সঙ্গে কলিকাতা চলিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাতঃকাল রেলওয়ে ষ্টেশনে এখনও গাড়ি আসে নাই। আত্মীয় স্বজনকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রমে দুটী একটী লোক ষ্টেশনঘরে কেবল আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুলিশম্যান এক আধ জন অসতর্কভাবে এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে ২২।২৩ বৎসরের একটী যুবা পুরুষ ভাল কাপড় জামা ও পাদুকা পরিয়া প্লাটফরমের এক কোণে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে পেন্‌শিল দিয়া কাগজে কি লিখিতেছে। এত অন্যমনস্ক যে, চাদরের এক পাশ স্কন্ধ হইতে লুটাইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছে। যুবা পুরুষের কেশকলাপ অসতর্কভাবে সুবিন্যাস্ত, নাসিকাগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত চস্‌মা।

এ দিকে ষ্টেশনে মহোৎসব উপস্থিত, লোকের কোলাহল, পুলিশম্যান ও কুলিগণের হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। রেল আপিসের কোন কোন বাবু টেরি কাটিয়া মৃদুহাস্যে ধীরে ধীরে পাদচরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া থামিল। আরোহিগণ অবতরণ করিয়া ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এখন ভিড় কমিয়াছে, বড় বেশী লোক নাই, কেবল দুইটী স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছেন, প্ল্যাটফরমের ইতস্তত কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের সেই চিন্তামগ্ন যুবা পুরুষ কিন্তু এখনও ধ্যানস্থ।

এই দুইটী স্ত্রীলোক অবশেষে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—"রাম রাম!" রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওঃ, গাড়ি আসিয়াছে, আপনারা আসিয়াছেন, বেস্ বেস্, আমার অপরাধ লইবেন না—আমার একটী সুন্দর ভাব মনে উদয় হওয়াতে লিখিতেছিলাম তাই এত অন্যমনস্ক; কবিদের এরূপ হইয়া থাকে, আমার দোষ কি বলুন? যাহোক চলুন?"

রামকৃষ্ণ গাড়ি করিয়া আগন্তুক স্ত্রীলোক দুটীকে লইয়া চলিলেন; বলা বাহুল্য ইঁহারাই দেবদাসী এবং যামিনী।

রামকৃষ্ণ একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন, স্ত্রীলোকদিগকেও তথায় লইয়া যাওয়া হইল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেবদাসী এবং যামিনী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কেবল রামকৃষ্ণের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে ভীত হইতে লাগিলেন।

এক মাস পরে এক দিন শুনিয়া হতাশ হইলেন, রামকৃষ্ণ কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। সেই দিন হইতে তিন দিনের মধ্যে আর তিনি বাসায়ও আসিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া যামিনী বলিলেন, "মা এখন উপায়?"— দেবদাসী কি উত্তর দিবেন? স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৭ম অধ্যায়।

রামকৃষ্ণের কাজে তাচ্ছল্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে অন্ধ-আত্ম বিশ্বাসে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব, তাহার অসাধারণ প্রতিভা—জগৎ সম্মান করিবে; তিনি সামান্য অর্থের দাস হইয়া আর আপিসের টুলে বসিয়া সময় নষ্ট করিবেন কেন?

ফরাসী উপন্যাসকার ব্যালজাক্ প্রথমোদ্যমে নাটক লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, নাটক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নাট্যশালার অধ্যক্ষেরাও তাহাই বলিল—ব্যালজাক্ বুঝিলেন, তিনি সে পথ ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে বসিলেন, এই বারে দেশময় "ব্যালজাক্" বলিয়া হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

রামকৃষ্ণ আশা করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াও এক দিন কবিরাজ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। তিনি এক দিন রত্নখচিত * বেত্র চমকাইয়া যামিনীকে বিস্মিত করিতে পারিবেন। তাই তাঁহার এত সাহস ও কাজে এত তাচ্ছল্য হইয়াছিল।

আপিসের বড় বাবু এক দিন দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাম তুমি কাজে মনোযোগী না হইলে তোমাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইব।" রামকৃষ্ণ

---

* ব্যালজকের ছড়িতে হীরা চুনি ছিল।

তাহাতে হাসিয়া কহিলেন, "ইহা অপেক্ষায় মনোযোগ করিবার আমার গুরুতর বিষয় আছে।" বড় বাবু কহিলেন, "তবে তোমার চাকরি ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।"

রামকৃষ্ণ আর ইতস্তত না করিয়া বলিলেন, "আপনার চাকরি আমি আজ হইতে ছাড়িয়া দিলাম।"

বড় বাবু বলিলেন, "কবিতা লিখিয়া ভাত হইবে ত?" রামকৃষ্ণ তাচ্ছল্য ও ঘৃণার ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "তা দেখা যাইবে।"

বড় বাবু আর একটু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন, "রাম তুমি যে সকল কবিতা লিখিয়া ডেস্কে রাখিয়া যাও, তাহা আমি পড়িয়া দেখিয়াছি—তুমি কখন কবি হইতে পারিবে না।"

রামকৃষ্ণ অভিমানে স্ফীত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, কবিত্ব বুঝিবার শক্তি কেরাণীদের থাকিলে, আপিস স্বর্গ হইত।"

বড় বাবু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। আর রামকৃষ্ণ অপর কেরাণীদের নিকট আস্ফালন ও আত্মগৌরব করিতে লাগিলেন।

বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ এস্তফাপত্র লিখিয়া দিয়া কার্য্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর তিন দিবসের মধ্যে তথায় কিম্বা বাড়ীতে ফিরিলেন না। তিনি প্রথমত হস্তলিপিগুলি লইয়া সহরের সংবাদপত্র ও সাহিত্যানন্দভাদি পূর্ণ মাসিক ও পাক্ষিক পত্র প্রভৃতির সম্পাদকদের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার রচনা গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইহাতেও রামকৃষ্ণ দুঃখিত হইবার লোক নহে—তিনি ঘৃণা করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন—"যত দিন সুযোগ্য লোক দ্বারা দেশের কাগজগুলি সম্পাদিত না হইতেছে—তত দিন উহা সাহেবদের কমোড্ ও বণিকের দোকান হইতে উচ্চ স্থান পাইবে না।"

এইবার সংবাদপত্রে তাঁহার ঘৃণা হইল—কেননা তাঁহার লেখা গৃহীত হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—ঐ সকল কাগজের কঠিন সমালোচন করিয়া সম্পাদকদিগকে জনসমাজে অপদস্থ করিবেন—কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—তাঁহার সমালোচন কোন কাগজেই মুদ্রিত হইল না। তখন তাঁহার দেশের সকল কাগজের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ হইল—ভাবিলেন, স্বয়ং নূতন কাগজ বাহির করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করিবেন।

এই নূতন কল্পনায় নূতন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া তিন দিবস পরে রামকৃষ্ণ আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী ও তাঁহার মাতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মচ্যুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে হাসিয়া বলিলেন—"এখন রামকৃষ্ণকেও দুই তিনটা ত্রিশ টাকা বেতনের চাকর রাখিতে হইবে।"

শুনিয়া দেবদাসী হর্ষযুক্ত ও যামিনী অধিকতর দুঃখিত হইলেন।

৮ম অধ্যায়।

যামিনী রামকৃষ্ণের গতিক বড় ভাল নহে মনে করিয়া বুঝাইলেন—চাকরী ছাড়া ভাল হয় নাই। খবরের কাগজে পয়সা হইবে না, আরো হাতের কড়ি খরচ হইবে,—কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে হাস্য করিয়া বলিলেন—"যামিনী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কষ্ট পাইবে না; আমাদ্বারা তোমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইবে।"

যামিনী বলিলেন—"সে সব কথা থাক্, তোমার হাতে ওগুলি কি?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"দশ হাজার টাকার নোট।" যামিনী, হাসিতে হাসিতে সেগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন—"এই তোমার নোট নাকি?" "তা বৈ কি—অমিত্রাক্ষর ছন্দে চমৎকার দুইখানা নাটক লিখিয়াছি—থিয়েটরে অভিনয় করিতে দিলে বিস্তর পয়সা পাইব—তোমাকে অভিনয় দেখাইতে লইয়া যাইব—দেখিবে?" বলিয়া রামকৃষ্ণ কাগজগুলিন চাহিলেন, যামিনী উহা তাঁহার হাতে দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলে দেবদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম কি আজ আবার আস্‌বে?"—"তা কিছুই বলে যায় নাই" বলিয়া যামিনী চুপ করিলেন।

দেবদাসী বলিলেন—"রাম বিবাহ করিলেই সংসারী হইবে—সব সুবিধা হইবে। যামিনী তুমি মত দাও।"

যামিনী—"বাবার মৃত্যুশোক এখনও ভুলিতে পারি নাই" এই বলিয়া নিজের ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, কাজে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠক, মনে করিয়াছেন—যামিনী রামকৃষ্ণের গলগ্রহ হইয়াছেন—ফলত তাহা নহে। তাঁহার উপার্জ্জন রামকৃষ্ণের উপার্জ্জন হইতে এখন অনেক বেশী। তিনি ভাল শিল্পকার্য্য জানেন,—তিনি সারা দিন রাত্ পরিশ্রম করিয়া এক মাসের মধ্যে, সূক্ষ্ম মলমলে লাল ও নীল সূত্রে নানারকম কাজ করিয়া চারিখানি সাড়ি প্রস্তুত করিয়া ৩২ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। এবারে আরো কাপড় সূতা—রেশম ও উল কিনিয়া নানা প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় জন্য যামিনীকে কোথাও যাইতে হয় না। যামিনীর গৃহ-পশ্চাতে একটী অবস্থাপন্ন ভদ্রপরিবার বাস করেন। সে বাড়ীতে অনেক-গুলি মেয়ে ও অনেকগুলি বউ—তাহাদের সঙ্গে যামিনীর অল্পদিন মধ্যে বিল-ক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছে—তাঁহারাই তাঁহার কাপড় কিনিয়াছে ও আরো প্রস্তুত জন্য ফরমাইস দিয়াছে। যামিনীর যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, বলিলে বাড়ীর লোক দিয়া, তাহাও তাহারাই কিনিয়া দেয়। ইহা ছাড়া তাহাদের পরি-চিতা, অন্য বাড়ীর মেয়েরাও ঐরূপ সাড়ীর ফরমাইস দিয়াছে ও ক্রমে আরও দিবে। সুতরাং তাঁহাকে এই জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়।

ইহা ছাড়া যামিনীর আরো কাজ আছে, যামিনী স্বয়ং উত্তম মেঠাই, নানা-বিধ পক্কান্ন ও ছানার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে—তাহাও পাড়ার মেয়েরা কিনিয়া খায়। তাঁহার পরিচিতা ভদ্রমহিলারা মেঠাই সন্দেশ প্রভৃতি আর বাজার হইতে আনান না। দেবদাসী এ সম্বন্ধে যামিনীর অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন।

কলিকাতার মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য ও বাবু; তাঁহারা ক্ষীরের দ্রব্য নারিকেল রচিত ফুল ফল চিড়া প্রভৃতি নানা সুদৃশ্য ও সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানেন না—সুতরাং তাহাও যামিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন। আয় দেখিয়া তাঁহার বিলক্ষণ ভরসা হইয়াছে, যে এভাবে চলিলে খরচ কুলাইয়া হাতেও কিছু টাকা সঞ্চিত হইতে পারে।

যামিনী রামকৃষ্ণকে খুব ভাল বাসেন, এখন আবার সেই ভালবাসার সঙ্গে একটু দয়াও মিশিয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের আস্ফালন—দম্ভ—ছোটমুখে বড় কথা—ছোটপদে লম্বা চাল—তাঁহার ভাল লাগে না। যামিনীর আর একটা কথা এখন মনে হয়, উভয়ের শিক্ষাই সমান—তবে রামকৃষ্ণের এত পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন—সহিবেনই বা কেন? আর সেই রামকৃষ্ণ

তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে, এ কথাটায়ও তাঁহার কষ্ট বোধ হয় ও ঘৃণা হয়। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা রামকৃষ্ণ ভাল হউক, বড় হউক। তথাপি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না—তবে এ ভালবাসার ধার নাই—আবর্ত্ত নাই—স্রোত নাই। এ ভালবাসা ছেলেবেলা হইতে অভ্যস্ত; যামিনী ভাল বাসেন বলিয়া যে রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বামী হইতে পারিবেন, একথা যামিনী মনেও কখন স্থল দেন নাই। এই জন্যই যামিনী যখন রামকৃষ্ণের সহিত কথা কহেন, তখন মনে করেন, হয় তিনি পুরুষ, নয়, রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক। এই জন্যই রামকৃষ্ণ এখনও নিজের মুখে তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিতে সাহস করেন নাই। গুণে মোহিত করিয়া যামিনীকে বিবাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

৯ম অধ্যায়।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে আর এক মাস চলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া হাতের টাকা ফুরাইয়াছেন, তথাপি সে পত্রের একজনও গ্রাহক হইল না—বা কোন পত্র তাঁহার সুখ্যাতি করিল না—কাগজ তিন সপ্তাহ পর অচল হইল।

নাটক সম্বন্ধেও ঐরূপ ফল ফলিত হইল। নাট্যশালার কোন অধ্যক্ষই তাহা অভিনয় জন্য গ্রহণ করিল না। ইহাতে রামকৃষ্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। রামকৃষ্ণের ন্যায়প্রতিভা সম্পন্ন লোক কলিকাতায় আরো অনেক আছে। সংবাদপত্র উপলক্ষে—এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের নিকট অনেকবার গমন করায়, রামকৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় আরো অনেক নিরাশ কবি বন্ধু পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেই কবিবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন—"ভ্রাতৃ-গণ, তোমাদিগের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি—তাই বলি, এস একত্র মিলিত হইয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের মূর্খ ও অহঙ্কারী সম্পাদক-গণের দর্প চূর্ণ করা যাউক। আমাদের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইলে অসাধ্যও সাধন করা যাইতে পারে। আমি শুনিয়াছি—জনসনীয়ানদলের একটি সাহিত্যসভা ছিল—সেই সভা পণ্ডিতকে মূর্খ ও মূর্খকে পণ্ডিত বলিলেও গ্রাহ্য হইত। সকল শ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকার সেই সভার সদস্যগণের নিকট হাতযোড় করিয়া থাকিতেন। এস ভ্রাতৃগণ আমরাও ঐরূপ এক সাহিত্য সমালোচনী সভা করি।"

এ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল, রামকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন—আর "মরাল" নামে একজন নূতন কবি—সকলের অপরিচিত হইলেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

আগামী পরশ্ব সভার প্রথম অধিবেশন হইবে—সুতরাং সকলেই উৎসাহ-সহকারে সভার কার্য্যে মনোযোগ দিল। কে কে নিমন্ত্রণপত্র লিখিবেন, কে কে একটি বড় হলের চেষ্টা দেখিবেন, কে কে আসবাব আদি ভাড়া করিয়া আনিবেন—কে কে আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিবেন—এবং কে কে বক্তৃতা প্রদান করিবেন, সকলই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং সকলেই গৃহের দিকে চলিলেন। রামকৃষ্ণও প্রায় দশ দিন পরে, আজ রজনী নয় ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী বাতি জ্বালিয়া শিল্পকার্য্য করিতেছিলেন, আর দেবদাসী বসিয়া তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণ হাস্যমুখে "মা কোথা" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেবদাসী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া খাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। যামিনী আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। দেবদাসী অন্তর্হিত হইলে রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"যামিনী, আমার উপর রাগ করিয়াছ—রাগ করিতে পার—আমি তোমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিতেছি না—কিন্তু ভাই জান না, আমি কেমন এক মহৎ কাজে ব্রতী হইয়াছি—কিছুদিন অপেক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে আমি তোমার অযোগ্য দাস নহে।"

যামিনী কিছু বলিলেন না, মাথা তুলিয়া একটু হাসিলেন—আবার কাজ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—"একি বিবাহের সাড়ী প্রস্তুত হইতেছে নাকি—বটে?"

যামিনী গম্ভীর বদনে বলিলেন—"রাম তুমি জান না—তুমি কে—আর আমি কে,—আমার শোক নির্ব্বাণ হইবার আরো গৌণ আছে; নির্ব্বাণ হইলে তখন, আমোদ করিও।"

রামকৃষ্ণ দেখিলেন, যামিনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধার বহিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "যামিনী, মাপ কর—প্রসন্ন হও, বিরক্ত করিব না। কিন্তু যামিনী একবার মনে করিয়া দেখ, আমি কার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া, সম্মান, যশ ও অর্থলাভের উন্নতশিখরে আরোহণ করিতেছি?"

যামিনী এবারে হাসিলেন—শিল্প পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়নে রামকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—এবং কিছু পরে বলিলেন—"বেশ্ বলিয়াছ, যে দিন যশ ও অর্থের উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে—সেইদিন তোমাকে উপপতি করিব—কেমন সন্তুষ্ট হইলে ?"।

"উপপতি—সে কি ?"

"তবে কি বলিব ?"

"পতি।"

"আমি যে বিবাহিতা।"

"তুমি বিধবা।"

"পরলোক, পাপ পুণ্য বিশ্বাস কর ?"

"করি"

"তবে স্বীকার কর আমি সধবা।"

কিরূপে ?

"আমার স্বামী পরলোকগত,—পরলোকে তিনি আমাকে পাইবেন—তাই আমি সধবা।"

"এ হিন্দুর কথা, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মের কথা নহে।"

"আমরা ত হিন্দু।"

"ব্রাহ্ম বা খৃষ্টানের মতে বিবাহ করিব।"

"পরলোকে যদি বিচার হয়, তুমি ও পূর্ব্বস্বামী উভয়েই যদি আমায় দাওয়া কর, তবে কে আমায় পাইবে ?"

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"তুমি পত্নী ঘরে রাখিয়া দূরদেশে গিয়াছ, আর একজন তাহাকে অধিকার করিল—তুমি আসিয়া বিবাদ করিলে, পরে উভয়েই নালিশ করিলে, পত্নী কে পাইবে ?"

"আমি পাইব।"

"তবে ত পরকালে তুমি হারিবে, আমার স্বামী জিতিবেন ?"

রামকৃষ্ণ নীরব হইলেন—অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আচ্ছা উপপতিই হইব।" যামিনী হাসিয়া কহিলেন,—"পরকালের বিচারের ভয়ে যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে না পারি ?"

"আমি আত্মহত্যা করিব।" এই বলিয়া রামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

যামিনী হা, হা, করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আত্মহত্যা বড় বীরত্বের কাজ, তুমি পারিবে না।"

এমন সময় দেবদাসী খাবার আনিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন।

১০ম অধ্যায়।

আজ রামকৃষ্ণের বড় সুখের দিন, আজ তাঁহার সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবে। বড় বড় লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবে, সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইবে। তাই নয়টার সময় আহার করিয়া চাপকান চোগা গায় দিয় মাথায় ঠাকুর-পাগড়ি পরিয়া, রামবাবু তাসের গ্রেট মোগলের ন্যায় চলিলেন।

কলুটোলার কোন ভগ্ন প্রাসাদ সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্যোগী মহাপুরুষদের চাঁদার টাকায় আসবাবাদি ভাড়া করা হইয়াছে। সুসজ্জিত সদস্য ও দর্শকপ্রধান স্কুলের ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত হইয়াছে, কেবল রামকৃষ্ণেব অপেক্ষায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। সভায় যে সকল মান্য-গণ্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আপীসের বড় বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য,—মূর্খ বড় বাবুটা দেখিয়া যাউক-- রামকৃষ্ণ কি দরের লোক। বলা বাহুল্য, বড় বাবুও অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তির ন্যায় অনুপস্থিত। স্কুলের মহামান্য ছাত্রবৃন্দ সভার কার্য্যে গৌণ দেখিয়া শৃগাল গর্দ্দভ প্রভৃতি সুসভ্য জন্তুর সুস্বরলহরি তুলিয়া সভাগৃহের গৌরব রক্ষা করিতেছে। এমন সময় রামকৃষ্ণ বাবুর "অমনি বস্" দুই পক্ষীরাজ টানিতে টানিতে আনিয়া, গেটে থামিল।

রামকৃষ্ণ হাস্যবদনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যেমন সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, অমনি তাঁহার পরিচিত এক জন চাপরাশি মাথা নত করিয়া বলিল, "বাবু সাহাব্ সেলাম"। প্রতি সেলাম দিবার পূর্ব্বেই একজন পুলিসের লোক ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

হায় হায়! একি হইল, দলপতি ধৃত হইলেন। সাহসী সভ্যগণ ও দর্শক-গণ মনে করিলেন, না জানি সভার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য মনে করিয়া পুলি-সের লোক দলপতিকে ধরিয়াছে সুতরাং তাঁহারা প্রাণপণে কেহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেহ নরদামা দিয়া, কেহ পশ্চাতের জীর্ণ দ্বার ভাঙ্গিয়া

পলায়ন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ও পুলিসের লোক বিস্মিত হইলেন। রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার নামে কি জন্য ওয়ারেণ্ট জারী হইয়াছে?" পুলিসের লোক উত্তর দিল, "তহবিল তছরুপ" রামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দোষী সুতরাং মনে করিলেন, এ বড় বাবুর কার্য্য।

* * * * * * *

রামকৃষ্ণের আপিসের হিসাব বহিতে এক হাজার টাকা এক ব্যক্তির নামে বেশী লেখা। অথচ হিসাব বহির মোট টাকার সহিত খাজাঞ্চির তহবিলের বেশ মিল আছে। এক ব্যক্তি ৫০০০৲ টাকা পাইবে, তন্মধ্যে ৪০০০৲ পাইয়াছে, সে আজ চারি মাস পরে অবশিষ্ট হাজার টাকা লইতে আসিয়াছে কিন্তু তাহার নামের ঘরে লেখা পাঁচ হাজার, কিন্তু সংলগ্ন রসিদে চারি হাজার লেখা। বাকি হাজার টাকা কি হইল?

রামকৃষ্ণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া জামিনীতে খালাস পাইল। ছয় দিন পরে বিচার হইবে। রামকৃষ্ণ খালাস পাইয়া আপিসে যাইয়া কান্দিতে কান্দিতে বড় বাবুকে কহিলেন "মহাশয়, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী—আমি এ টাকার কিছুই জানি না।"

বড় বাবু খাতা দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ? আমার বিশ্বাস তুমি যথার্থই নির্দ্দোষী, কিন্তু আমি কি করিব? সাহেব তোমাকে পুলিসে দিয়াছেন। হইতে পারে তুমি ভ্রমে ও অন্যমনস্ক হেতু একের টাকা অপরের নামে লিখিয়াছ। পূর্ব্ব খাজাঞ্চীর মৃত্যু না হইলে, এরূপ গোল সহজে ধরা পড়িত। তুমি তাহার অনুপস্থিতিতে কয়দিন কাজ করিয়াছিলে, তাহাতেই এরূপ হইয়াছে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি মনোযোগপূর্ব্বক খাতা দেখিয়া এ গোল বাহির করিতে পারিব।" বড় বাবু তাহাকে দেখিবার আদেশ দিলেন।

রামকৃষ্ণ রোজ আপিসে আসিয়া তন্নতন্ন করিয়া খাতা দেখেন কিন্তু টাকার ভুল কিছুতেই বাহির করিতে পারেন না। অবশেষে একবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। জেলে যাওয়া জন্য তিনি তত বিষণ্ণ নহেন, যামিনী এ কথা শুনিবে বলিয়াই তিনি অধিকতর বিষণ্ণ। এই জন্যই আর বাড়ী যান নাই।

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিচারের দিন আসিল; বিচার হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণের পয়সা নাই, সুতরাং ভাল উকীল দিতে পারিলেন না; তথাপি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া ও খাতাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিচারকের বিশ্বাস হইল—

যে ভ্রমে একের টাকা অপরের নামে লেখা হইয়া থাকিবে ; তাহা না হইলে ৫০০০৲ টাকা লেখা অথচ তৎসংলগ্ন রসিদে ৪০০০৲ টাকা কেন থাকিবে, যথার্থ মন্দ লোক অবশ্য রসিদের টাকার অঙ্ক জাল করিয়া তৎস্থানে ৫০০০৲ টাকা লিখিবারই চেষ্টা করিত।

বিচারকের বিশ্বাস হইলে কি হয়, তিনি আইনে বাধ্য ; তথাপি এদিক ওদিক করিয়া তিনি বিচার কার্য্যে গৌণ করিতে লাগিলেন।

* * * * * * *

কথা গোপন থাকে না ; দৈনিকপত্রের পুলিশ রিপোর্টে উহা প্রচার হয়। যে বাটীর মেয়েরা যামিনীকে বড় ভাল বাসে, সেই বাটীতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আসিয়া থাকে ; যামিনী তাহা চাহিয়া আনিয়া পড়েন। সুতরাং রামকৃষ্ণের এই সাঙ্ঘাতিক সংবাদ পাইয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে দয়া হইল ; তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মাকে সঙ্গে লইয়া আপিসে চলিলেন।

আপিসের নিকট উপস্থিত হইয়া বড় বাবুকে খবর পাঠাইলেন ; দুর্ভাগ্য বশত বড়বাবু নাই ; তাঁহার অসুখ হইয়াছে। যামিনী তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া সাহেবের নিকট খবর পাঠাইলেন ; সাহেব উপরে যাইতে বলিলেন। যামিনী উপরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন সাহেব ও বিবি বসিয়া আছেন অন্য লোক নাই। বিবি দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল ; তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন,—

"রামকৃষ্ণ বাবুকে মাপ করিতে হইবে ?"

সাহেব ও মেম্ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু যামিনীর নিষ্কলঙ্ক ও সাহস পূর্ণ সুন্দর বদন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। মেম্ বলিলেন "তুমি তার কে ?"

যামিনী নিজ দুঃখ বর্ণন করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সাহেব বিবি উভয়েরই করুণার সঞ্চার হইল। বিবি তাঁহার হাত ধরিয়া একখানি আসনে বসাইলেন। সাহেব কহিলেন "আমি কি করিব ? এখন মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছাড়িবেন না।"

যামিনী বলিলেন "তবে আমাকে দয়া করিয়া সেই খাতাখানি দেখিতে দেন ?" সাহেব হাসিয়া বলিলেন "খাতার হিসাব পত্র বুঝিতে পারিবে ?"

যামিনী সাহস করিয়া কহিলেন "পারিব।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই কয়খানা খাতা আসিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন "কি, এত খাতা দেখিতে পারিবে ?"

যামিনী বলিলেন "যদি সঙ্গে নিতে দেন, তবে সমস্ত রাত জাগিয়া দেখিতে পারি।" সাহেব কি জবাব দিবেন তাই ভাবিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে বিবি হাসিয়া বলিলেন "লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া দেখ; আমিও সঙ্গে সঙ্গে দেখিব।"

যামিনী স্বীকৃতা হইয়া খাতা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মা গাড়ী লইয়া বাড়ী গমন করিলেন।

১১শ অধ্যায়।

অরুণোদয় হইয়া গৃহে কোমল রশ্মি পড়িয়াছে, গৃহ কোণে পিঞ্জিরাবদ্ধ কেনারি পাখী শিশ দিতেছে। টেবিলে এখনও ল্যাম্প জ্বলিতেছে; যামিনী বাহ্য জগতের কিছুই জানেন না, যে ভাবে হিসাব দেখিতে ছিলেন সেইভাবেই দেখিতেছেন। জাগরণে তাহার নয়ন রক্তবর্ণ, স্ফীত হইয়াছে, ঢুলু ঢুলু করিতেছে; মুখ মলিন এবং শুষ্ক।

বিবি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ক্ষান্ত হও অসুখ হইবে"। যামিনী মুখ তুলিলেন সে মুখ শুষ্ক, চিন্তিত ও বিবর্ণ দেখিযা বিবির মনে দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন "আর কতটা বাকি?" যামিনী বলিলেন "একবার সমস্ত দেখিয়াছি—আবার ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি—দেখিতেছি জেল অনিবার্য্য।"

বিবি হাসিয়া বলিলেন, "অনাহার, জাগরণ, বাড়ী যাও—ভয় নাই—এক হাজার টাকা আমি দিয়া খালাস করিয়া দিব।" বিবির এত দয়া দেখিয়া যামিনী বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন—

বিবি সে মুখমণ্ডলে অভিমান ও দুঃখ পাঠ করিয়া শিহরিলেন।

যামিনী বলিলেন—"যদি যথার্থই এক ব্যক্তি চোর হয়, তবে অসৎপাত্রে আপনার টাকা যাইবে কেন?"

"টাকা তোমার জন্য—তার জন্য নহে।"

"আমি টাকার জন্য আসি নাই।"

"তবে কেন আসিয়াছ?"

"নির্দ্দোষী কি না,—তাহাই বুঝিতে।"

"এখনও কি তাহা বুঝিবার বাকি আছে ?"

"একটু আছে।"

"কি ?"

"তাঁর লিখিবার ডেস্কে কি আছে দেখিব ?"

বিবি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, চল তবে কেরাণীখানায় যাই ?"

উভয়ে কেরাণীখানায় চলিলেন, কিন্তু এখনও আপিস খোলে নাই। বিবি হুকুম দিয়া চাবির অভাবে রামকৃষ্ণের ডেস্ক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যামিনী সাবধানে উহার ভিতরের কাগজপত্র ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য কাগজখানিও দেখিতে ত্রুটি করিলেন না। এক টুকরা কাগজে লাল কালির অক্ষরে কবিতা লেখা, ঐ কাগজখানি দেখা হয় নাই—কাগজপত্র বাহির করিতে ডেস্কের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল—যামিনী যখন, সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া অবশেষে নিরাশ লোচনে বিবির মুখ পানে চাহিলেন—তখন বিবি সেই কাগজখানি অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া বলিলেন "ওখানি কি কাগজ ?"

যামিনী কাগজ তুলিয়া তাহার অপর পৃষ্ঠ দেখিলেন—মনে আশা হইল ; সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। বলিলেন "এ খানি হাজার টাকার রসিদ হয় ত এই ব্যক্তির টাকা তাহার নামে জমা না হইয়া অন্য ব্যক্তির নামে প্রথমত জমা করা হইয়া থাকিবে।"

বিবি তখনই রসিদখানি লইয়া উপরে চলিলেন। খাতা খুলিয়া নাম বাহির করিলেন। যথার্থই সে নামে টাকা জমা নাই, রসিদও তাহার পাশে সংলগ্ন নাই। অল্পক্ষণ মধ্যে ইহা সাহেবের কর্ণে গেল সাহেব দেখিলেন—রসিদদাতা কলিকাতার লোক—তখনই টেলিগ্রাফ করিলেন। টেলিগ্রাফের উত্তর আসিল "হাজার টাকা পাইয়াছি।"

সাহেব উচ্চস্বরে বলিলেন "রামকৃষ্ণ নির্দ্দোষী" শুনিয়া যামিনী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিবি তার চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হইলেন বলিলেন—"যামিনী তোমার পরিশ্রম সার্থক ; তোমার প্রাণ উচ্চ—বল, আমরা তোমার কি করিতে পারি ?"

যামিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "রামকৃষ্ণের অসাবধানতার দোষ ক্ষমা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। তাহাকে একটী চাকরী দিবেন, তবেই সন্তুষ্ট হইব।"

সাহেব ও বিবি উভয়েই তাহার পানে বিস্ময়ের লোচনে চাহিয়া বলিলেন —"তাহা হইবে।"

১২শ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ মুক্তি পাইয়াছেন—মুক্তির বিবরণও শুনিয়াছেন। শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন—এইবার তিনি প্রথম বুঝিতে পারিলেন, তার চেয়ে যামিনী কত উচ্চ। তাঁহার মস্তক শীতল হইল, হৃদয় ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইল—মনে মনে বলিলেন "দেবি,—আমি তোমার দাসের যোগ্য—আমি স্বামীর যোগ্য নহি"।

* * * * * * * * * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে—আফিস পূর্ণ লোক—তন্মধ্যে উচ্চাসনে বড় বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় সাহেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন— "আমি রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আসিলে তাহাকে পূর্ব্ব কাজ সাবধানে করিতে বলিবে।"

বড় বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে এক প্রকার আপনি কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন "তাকে বুঝাইয়া বলিবে সে যেন কাজ ছাড়ে না, ভবিষ্যতে তাহার ভাল হইবে।"

সাহেব স্বস্থানে গমন করিলে কিছু পরে রামকৃষ্ণ বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন "আমাকে সাহেব কেন ডাকিয়াছেন?"

"পূর্ব্ব কাজ করিতে।"

"আর কাজ করিব না।"

"তবে কি করিবে?"

"তা কি জানেন না?"

"জানি, কিন্তু তুমি তাহা পারিবে না।"

"কেন মহাশয়?"

"কবি-জনোচিত প্রতিভা বা ক্ষমতা তোমার নাই?"

"আপনি কিসে বুঝিলেন?"

"তুমি পাগল।"

"আপনি তবে বিখ্যাত কবি "মরাল" কেও পাগল বলিবেন।"

"কোন্ "মরাল" তোমাদের মনোনীত সভাপতি ?"

"হাঁ।"

"তাহাকে দেখিয়াছ।"

"না।"

"তাঁহাকে জান ?"

"না।"

"তবে কিরূপে তাঁহাকে পাইবে ?"

"খুঁজিয়া লইব।"

"মরাল কিরূপ কবি ?"

"চমৎকার।"

"মরাল যদি কেরাণীগিরি করে, তবে তুমি তাহা করিতে অপমান বোধ করিবে না ত ?"

"এত বড় কবি, কেরাণি হইতে পারে না ?

"যদি তাই হয় ?"

"আমি তাহার অধস্থ কেরাণীরও পদসেবা করিব।"

"ঠিক্ ত ?"

"ঠিক্ মহাশয়।"

"আমিই মরাল স্বাক্ষর করিয়া কবিতা লিখিয়া থাকি।" রামকৃষ্ণ শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজের ব্যবহারে, লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইল মাথা হেট করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য।"

বড় বাবু বলিলেন, "কিছুই আশ্চর্য্য নহে—এদেশের লেখকদের লেখায় পয়সা হয় না। দেখ হেম বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি কি করিতেছেন ? তবে যাঁহাদিগের লিপিক্ষমতা এতাধিক যে ইচ্ছা না থাকিলে একবার তোমাকে তাঁহাদের বহি পড়িতেই হইবে, না পড়িলে উপায় নাই, না পড়িলে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহারাই কেবল লেখনী লইয়া অহঙ্কার ও লেখনীর উপর সংসার নির্ভর করিতে পারেন। উহা তোমার বা আমার কর্ম্ম নহে। এখন হইতে সাবধানে কর্ম্ম কর, এ পথে অর্থ ও উন্নতি সহজে হইবে।"

রামকৃষ্ণের মন ফিরিল, রামকৃষ্ণ আর এক রামকৃষ্ণ হইয়া কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। অবশেষ বড় বাবু পদান্তরে উন্নীত হইলে, রামকৃষ্ণ মোটা বেতনে বড় বাবু হইলেন।

উপসংহার।

রামকৃষ্ণের খুব জাঁকাল অবস্থা দেখিয়া দেবদাসী একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর কেন—বিহাহটা এখন হ'য়ে যাক।" রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বদন প্রসন্ন হইল—ভাবিলেন, "যামিনী আমার না হউক অন্তত এখন আমার অবস্থার দাসী হইতে সম্মতা হইবে—"

যামিনী সেই সময় বদন গম্ভীর করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা একটু অপেক্ষা কর, রামকৃষ্ণ তুমিও একটু অপেক্ষা কর।" রামকৃষ্ণের বদন আরও উজ্জ্বল আরও প্রফুল্ল হইল।

সহসা যামিনীর শয়নকক্ষ হইতে এক সন্ন্যাসিনী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "মা দেখ!—রামকৃষ্ণ দেখ!—আমার বিবাহের পরিচ্ছদ কেমন হইয়াছে।" দেবদাসী নির্ব্বাক—রামকৃষ্ণ বিস্মিত।

* * * * * * * * * *

দেবদাসী বলিলেন, "এ বেশ কেন?" যামিনী বলিলেন, যামিনী দেবী চিরদিনই দেবী থাকিবে, দাসী হইবে না।

দেবদাসী বলিলেন, "তবে কি করিবে?" যামিনী বলিলেন, "চল বৃন্দাবনে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, আর ব্রজের ধূলি গায়ে মাখিব।"

কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলা কবির একটী অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি মাধুর্য্য অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। কারণ, কপালকুণ্ডলা ভাবময়ী, অথবা তাহা হইলেও একরূপ বুঝান যাইত—কপালকুণ্ডলা ছায়াময়ী। সত্য বটে, কবি ইহাকে ভাষাময়ী করিয়াই আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন ভাষাই কপালকুণ্ডলার পূর্ণাবয়ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। কলাবিৎ যেমন সঙ্গীতকালে স্বীয় স্বরের অপূর্ণতা বা স্বর-বিচ্ছেদ কোন এক অবিরাম-ধ্বনিত যন্ত্র সাহায্যে পূরণ করিয়া থাকেন, আমাদিগের কবিবরও সেইরূপ তাঁহার এ মনোহর সঙ্গীতটি ভাষায় গঠিত করিয়াও ইহার অপূর্ণতা ও বিচ্ছেদ

পাঠকবর্গের মানসযন্ত্র ধ্বনিত করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ যন্ত্র যাহার ধ্বনিত হইবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার এ যন্ত্র সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিশিতে অসমর্থ, কপালকুণ্ডলা তাহার নিকট সম্যক্ অপূর্ণ। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, তাহার জন্য হইতে পারে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই তাহার জন্য নহে। কপালকুণ্ডলা চিত্র নহে—চিত্রের ছায়া। প্রতিচিত্র গ্রহণকারীরা যেরূপ চিত্রিতব্য পদার্থের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তাহাই যথাবিধ বর্ণে প্রতিভাসিত করিয়া, ঠিক সেই পদার্থের অনুকৃতি রচনা করে, পাঠকবর্গকেও সেইরূপ এই ছায়া লইয়া মনোমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। ছায়াটি একটী যন্ত্র সাহায্যে উঠিয়াছে; সে বাহাদুরী যন্ত্রের; কিন্তু মূর্ত্তি-গঠনে বাহাদুরী পাঠকবর্গের। তাই চিত্রনিপুণ পাঠকবর্গের নিকটে পূর্ণ মূর্ত্তি অপেক্ষা—এই ছায়ারই আদর অধিক।

পাঠক, কখনও কোন চিত্রগৃহে বর্ণ গুচ্ছের (রঙ্গের আবরার) ছবি দেখিয়াছ? এখানে এক ধাবড়া রঙ, ওখানে এক ধাবড়া রঙ, বহু যত্ন বিন্যস্ত অথচ অযত্ন বিন্যস্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রঙের আবরার ছবি কখন দেখিয়াছ? কপালকুণ্ডলা সেইরূপ চিত্র। ইহাতে কোনও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই—অথচ চিত্রটী বড়ই মনোহর। যে চিত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে, তাহা হঠাৎ কেহ না বুঝিলে, বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ চিত্র না বুঝিলে, বুঝান দুরূহ। ইহার বিশ্লেষণ হয় না—অথবা বিশ্লষণে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তবে বুঝান যায়,—উহার সেই এক একটি বর্ণ গুচ্ছের (রঙের আবরার) সৌন্দর্য্য। তাহাই আমরা চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু সেই সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

ঐ দেখ সেই রকম পাণ্ডু বর্ণে ঐ কি লিখিত হইয়াছে;—দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজ বক্ষে করিয়া অনলশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, মানব নাই; তথায় পশু চরে না, পাখী ডাকে না, সমীরণও যেন বহে না। এহেন ভীষণ মরুভূমির মধ্যদেশে ঐ দেখ একটী পথিক ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে। পথিক পথহারা—তাহার বদনমণ্ডলে বিষম আশঙ্কার চিহ্ন, গমনে বিষম ভ্রান্তির চিহ্ন। নয়নযুগল ভীতিব্যঞ্জক, সমুদ্রে পতিতের ন্যায় নিরাশায় হাবুডুবু করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায় জঠর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথিক বিষম বিপদগ্রস্ত। আত্মহারা হইয়া পথিক কি ভাবিতেছেন—সহসা এ কি। পথি-

কের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধপ্ করিয়া এ কি জ্বলিয়া উঠিল। এ যে প্রদীপ্ত অনলশিখা—আগুণের মধ্যে আগুণ! পথিক জীবনে নিরাশ হইলেন—হা ভগবান বলিয়া সেই ভীষণ মরুভূমে, সেই ভীষণ অনলরাশি মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চতুর্দ্দিকে আবার এ কি এ উত্থিত হইল। সেই ভীষণ মরুভূমি ভেদ করিয়া আবার এ কি বেষ্টন করিল। সলিলের উৎস। শুভ্র, নির্ম্মল, সুশীতল, বারিপুঞ্জ! আহা মরি মরি, কি সুন্দর চিত্র রে।—সেই ভীষণ মরুভূমিতে, সেই ভীষণ অনলরাশি মধ্যে আহা মরি মরি এ কি এ সুন্দর দয়ার উৎস রে! ঝর্, ঝর্, ঝর, ঝর্ রবে কি ঐ মধুর ধ্বনি রে! স্বজন-পরিত্যক্ত বিজন প্রদেশে কাপালিক কর্ত্তৃক বধার্থ আনীত শ্মশানক্ষেত্রে নিরীহ নবকুমারের পার্শ্বে, ঐ কি মধুর দয়ার উৎস রে! সেই মহাকালের ক্রীড়াভূমি ভীষণ মরুক্ষেত্রে শরশয্যাশায়িত ভীষ্মমুখে অর্জ্জুন-শরপ্রোদ্ভিন্ন ধরিত্রীভেদী সলিলধারাও এত অমৃতময়ী নহে।

ঐ দেখ আর এক স্থানে ধাবড়া রঙ্গে ঐ কি লিখিত হইয়াছে;—মাতৃক্রোড়ে একটী যুবতী বালিকা। মায়ের আর সন্তান নাই, মায়ের পুত্রও ঐ, কন্যাও ঐ, তাই কন্যাটি যুবতী হইলেও বালিকার ন্যায় এখনও লালিত। এখনও সে বনে বনে ছুটা ছুটি করিয়া বেড়ায়, এখনও সে মায়ের কাছে বালিকার ন্যায় আবদার করে। গাত্রে আভরণ নাই, দরিদ্রা মাতা কোথায় পাইবে? অথবা সে পাগলা মেয়েকে আভরণ পরান যাইতই না। কেশরাশি সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নয়নে বালহৃদয় প্রতিভাসিত, তেমতি সরল, তেমতি স্নেহ-পূর্ণ। আবার যুবতীর ন্যায় তাহাতে গাম্ভীর্য্যও প্রকটিত রহিয়াছে। বালিকার মাধুর্য্য ও যুবতার গাম্ভীর্য্য মধুর ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকাটি মাতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে হঠাৎ কে আসিয়া তাহাকে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিয়া লইয়া গেল। বালিকা কাঁদিল না, অথবা কাঁদিল কিন্তু আর্ত্তনাদ করিল না। সে কিছুই বুঝিল না—অথবা বুঝিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই করিল না। ঐ দেখ, ঐ সেই মাতৃক্রোড়চ্যুতা যুবতী বালিকা আজি বিবাহিতা হই-য়াছে। আজ সংসাররূপিণী বিমাতা তাহাকে কত আদর করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ আভরণে ভরা, কেশপাশ সুনিবদ্ধ। মাতা নাই বলিয়া, মাতৃক্রোড়চ্যুত বলিয়া, সকলে তাহাকে কত আদর করিতেছে। স্বামী অপরিমিত স্নেহ করি-তেছে, ননদিনী প্রাণের অধিক যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার

মন উঠিতেছে না। সেখানে সে যে মায়ের কোলে ছিল, এখানে যে এ বিমাতা! মাতৃহারা শিশু যখন মা মা বলিয়া রোদন করে, তখন তোমরা তাহার নিকটে যতই কেন মনোহর দ্রব্য ধর না, সে তদ্দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, বরং অন্য সময়ে যাহা সে আদর করিয়া বুকে করিত, সে সময়ে সে তাহা রাগ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। সুবতা আজ ঠিক তাহাই করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার চক্ষু দুইটি ফুলিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যেন রাহুগ্রস্ত বিমলিন চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখ দেখি, চিত্রকরের কি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য! সে মুখখানি কেমন ফুটিয়াছে—সে মনোভাবটি কেমন খুলিয়াছে। প্রকৃতি দুহিতা ষোড়শী বালিকা কপালকুণ্ডলাকে সংসার ক্রোড়ে আজ কেমন দেখিতেছ? আর কখন কোন বন্য বিহঙ্গিনীকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে সাধ হইবে? কোন বন্য ব্রততীকে বন হইতে তুলিয়া টবে বসাইতে সাধ হইবে?

এই দেখ আর এক ধাবড়া রঙে এই কি লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সমাজের সংগ্রামের পরিণাম। কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, শ্রবণে, যে সকল অন্তিম দৃশ্যের কথা পড়িয়াছ, যে সকল শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়াছ, যে সকল শোক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছ, সব একত্রিত করিয়া ভাবিয়া একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ দেখি—ঐ শ্মশানভূমির প্রান্তভাগে উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথীর তটদেশের ঐ যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর দেখি—ঐ প্রকৃতি আর ঐ সমাজের দিকে তাকাও দেখি—এরূপ আর কখন কি দেখিয়াছ? এরূপ হৃদয়ভেদী গাম্ভীর্য্যময় মধুরদৃশ্য আর কখন কি দেখিয়াছ? ঐ দেখ ঐ সামাজিক প্রেমিক নবকুমার—ঐ দেখ ঐ স্বভাব প্রেমিকা কপালকুণ্ডলা। উভয়েরই চরমোচ্ছ্বাস দেখ—উভয়েরই আদর্শভাগ দেখ। আরও দেখিতে চাও। তাহা হইলে তোমাদিগের নিকটে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। কপালকুণ্ডলা যে আমাদিগের প্রিয়তমা দুহিতা—তাহাকে শ্মশানস্থ দেখাইলাম—তাহার ভস্মাবশেষ দেখাইতে পারিব না।

কিন্তু এ সকল ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য—সমষ্টির সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। এ ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায়—কিন্তু সমষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে, নবকুমারের মত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে উচ্ছসিত মনোভাব লইয়া দেখিতে হইবে। সংসারীর কাছে অমন প্রকৃতি-তনয়া ছায়াময়ী ভিন্ন ত উজ্জ্বল হইতে পারে

না—ছায়াময়ী ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে—কল্পনার স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কপালকুণ্ডলা অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। ভাব বর্ণনা করা যায়, কিন্তু ভাবের ছায়া বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা বর্ণনা করা যায় কিন্তু কল্পনার স্বপ্ন বর্ণনা করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা আদর্শ রমণী নহে, কিন্তু তবু চিত্ত বিমোহিনী। ইহার কতক কারণ, এক প্রকার বলা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বিজন মরুভূমে বিমল সলিলধারা, কপালকুণ্ডলা বিমাতৃক্রোড়ে আদরপালিতা মাতৃহারা শিশু, কপালকুণ্ডলা প্রিয়তমা তনয়ার বিমলিন মুখচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে অতীতের স্মৃতি—রোগীর তন্দ্রা, নিদাঘের মলয় মারুত। এই স্বার্থময় কপটতা-তাড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি —সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে। কপালকুণ্ডলা যে সম্পূর্ণ সংসার ছাড়া—তাই সংসারী আমরা, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট বড অপূর্ব্ব, বড় মধুর। অমন ছবি ত আর কোথায়ও নাই। এমন সংসার ছাড়া জীব আর কোথাও ত দেখিতে পাই না। কপালকুণ্ডলাকে যে আমরা এক সময়েও সংসারী বলিয়া আপনার বোধ করিতে পারিলাম না। আর এ প্রকার,—যত ছবি দেখিয়াছি, সকল গুলিই এক সময়ে না এক সময়ে আমরা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিয়াছি। রমণীর চিত্তে স্বামী প্রেমই জীবন স্বরূপ। এই জীবনটা আমরা প্রায় সকল ছবিতেই এই সংসারের বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। অন্য সময়ে সংসার ছাড়া ভাবিতে পারিলেও, এ সময়ে যেন তাহারা সম্পূর্ণ আমাদিগের বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ সাংসারিক বোধ হইযাছে। তাই, মিরন্দা, শকুন্তলা হইতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্বত্ব অধিক। কপালকুণ্ডলার এই জীবনটি একবার দেখ দেখি—এখানেও দেখিবে আমাদিগের সংসারের কিছু নাই। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনুরাগ বা মনোভাব কপালকুণ্ডলার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু এত অপূর্ব্ব ও এত মধুর, যে শুদ্ধ এই টুকু যেন কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের হইতে এক পৃথক জীব করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি মানবের মৌলিক প্রকৃতি—ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বটে, কিন্তু তবু সামাজিক মানবের প্রকৃতি হইতে তাহা কত অন্তর! কবিবর আমাদিগকে এই প্রকৃতিটি দূরে রাখিয়া একবার দেখাইয়াছেন—আবার কাছে আনিয়া, তুলনায় আর একবার দেখাইয়াছেন। এই মৌলিক প্রকৃতির সহিত আমাদিগের সামা

জিক প্রকৃতি তুলনা করিলে, আমাদিগের হৃদয় বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হয়। সমাজ আমাদিগকে এখন্ এত দূরে আনিয়াছে? কোথায় কপালকুণ্ডলা—আর কোথায় আমরা—এই বিস্ময়টিও কপালকুণ্ডলার আর একটি সৌন্দর্য্য। সকল জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এত মনোহারিণী। এত একরকম বলা গেল, কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। সে বিনা সূতার হার, আকাশের প্রতিমা ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন বর্ণনা করার পূর্ব্বে—ভোলাদাদা আমার কে? কি রকমের মানুষ ছিলেন? তাহা আপনাদিগের নিকট না বলিলে চলিবে কেন? অতএব শুন্নুন।

ভোলাদাদা পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং সকল পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীর ন্যায় তিনিও স্বদেশবৎসল ছিলেন কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য অনেকের অপেক্ষা কিছু বেশী মাত্রায় প্রবল ছিল। তিনি জানিতেন যে ঢাকার মতন সহর নাই, গনী মিঞা সাহেবের ন্যায় বড় মানুষ নাই, বিক্রমপুরের লোকের ন্যায় বিদ্বান নাই, পদ্মানদীর ন্যায় বড় নদী নাই এবং তাঁহার নিজের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নাই। যে দিবস সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গ্‌লার হইয়াছেন, সেই দিবস ভোলাদাদা দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিলেন এবং অর্দ্ধ পয়সার বাতাসা কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামের বালকদিগকে ডাকিয়া হরিলুঠ দিলেন এবং বলিলেন, যে "এখন কল্‌কাতার বেটারা যা'য়া গলায় দরী দিয়া মরুক।" এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, আনন্দমোহন বাবু পূর্ব্ববঙ্গে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ভোলাদাদার নিজের বিদ্যা সাধ্য ঢাকা কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে শেষ হয়, তথাপি তাঁহার

অহঙ্কার এবং সাহসের সীমা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে এমন চাকরী নাই, যাহার জন্য তিনি দরখাস্ত করেন নাই।

ভোলাদাদা তাঁহার পিতৃ অস্থি গঙ্গায় দেওয়ার জন্য একবার কলিকাতায় গিয়া কয়েক দিবস কালীঘাটের বাঙ্গালপাড়ায় থাকিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, লাট সাহেবের কুঠী, যাদুঘর এবং পশুশালা প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং দুই একবার সেয়ারের গাড়ীতে কলিকাতায় দুই এক জন লোকের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন; ইহাতেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কলিকাতার সব দেখিয়াছেন, সব জানেন এবং সকল বড় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন। সেই কথা প্রমাণার্থ তিনি সর্ব্বদা কলিকাতাবাসীর ন্যায় 'গেলুম খেলুম' শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন যে উক্ত নগরের সভ্যসমাজে প্রতিনিয়ত থাকাতে তাঁহার কথা ফিরিয়া গিয়াছে। কথায় কথায় কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেন যে, ঐ সকল মহোদয়েরা তাঁহাকে পাইয়া বড় সম্মান ও সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপারিসে তিনি ছোট লাটের দ্বারা এক ডেপুটী মাজিষ্টরী লইতে পারিতেন কিন্তু লবণাম্বু স্থানের জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়াতে, তিনি কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে ও ঐ চাকরী হস্তগত করিতে পারিলেন না।

ভোলাদাদার রূপের ব্যাখ্যা কত করিব? শরীর যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ হৃষ্টপুষ্ট না হইত এবং অঙ্গে ভদ্রলোকের পরণ পরিচ্ছদ না থাকিত, তাহা হইলে কাওয়া বাগদীরাও তাঁহাকে সজাতির ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিত না; কিন্তু ভোলাদাদার মনে উল্টা ধারণা ছিল, তিনি আপনাকে আপনি বড় শ্রী-যুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন এবং কিসে রূপের আধিক্য হইবে, তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পরে কোশাকুশী পুষ্পপাত্র প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম লইয়া তাঁহার পৈতৃক দীঘীর ঘাটের আধখানা জুড়িয়া বসিতেন কিন্তু পূজাতে যত সময় ক্ষয় না হইত, তাহার অধিক সময়, তিনি একখানা চারি পয়সার টিনের পুরাতন আয়না সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে ঘাড় গুঁজিয়া আপনার মুখ দেখিতে ও ফোঁটা কাটিতে এবং একখানা কাষ্ঠের চিরণীর দ্বারা কেশবিন্যাশ করিতে ক্ষয় করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও কুরূপ করিয়াছেন বলিয়া ভোলাদাদা সকল সুন্দর ও

গৌরবর্ণ ব্যক্তিকে হিংসা ও দ্বেষ করিতেন। এই জন্য তিনি গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে, "গোরা ব্যাটা আবার কিসের দেবতা" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রং কাল ছিল বলিয়া তাঁহাকে তিনি পূর্ণাবতার বলিয়া মানিতেন এবং বলিতেন যে, "অবতার ত কৃষ্ণাবতার এবং দেবী ত মা কালী, আর সকল ঝুট।"

পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ নিয়মানুসারে ভোলাদাদাও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন এবং মুদ্রা তাঁহার এমনই প্রিয় এবং যত্নের দ্রব্য ছিল, যে তাঁহাকে কেহ কখনও গোটা টাকা ভাঙ্গাইতে দেখে নাই এবং তাহা বাঁচাইবার জন্য এমন কর্ম্ম ছিল না যাহা তিনি না করিতে পারিতেন। তাঁহার হিসাবের একটী দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ অরুচিকর ঘটনার গন্ধ আছে, রুচিধ্বজী পাঠক তজ্জন্য আমাকে কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। ভোলা-দাদার পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও একটী পুত্র। পুত্রটী বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভোলাদাদা ব্যয়ের ভয়ে তাহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই। পুত্রের গুণাগুণও পিতার ন্যায়, অতএব যৌবনের দোষ দমন করিতে তাহার ক্ষমতা হয় নাই। ২২।২৩ বৎসরের সময় সে একটী স্ত্রীলোককে টাকা অভাবে তাহার পিতার গৃহের দ্রব্য সকল চুরি করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভোলাদাদা দেখিলেন যে, আজ বাক্সটা, কাল পিত-লের কলসীটা, পরশু তাঁহার স্ত্রীর এক জোড়া নূতন বস্ত্র অন্তর্ধ্যান হইতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে আরও ঐরূপ হইবে। পুত্রকে ধমকাইয়া নিবারণ করি-বার সাধ্য নাই—বিশেষ লোকে শুনিলে পুত্রকে কেহ দোষী করিবে না, পিতা-কেই দোষী সাব্যস্ত করিবে, কারণ তিনি পুত্রের এখন ও বিবাহ দিলেন না এবং সকলে ভোলাদাদাকে পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিবে; বিবাহ দিতে হইলে অন্যূন ৭।৮ শত টাকা ব্যয় হইবে কিন্তু ভোলাদাদা প্রাণ থাকিতে এত টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন না। এমন সঙ্কটে তিনি উভয়কুল বজায় রাখার জন্য এক মতলব আঁটিয়া এক দিবস পুত্রের অসাক্ষাতে সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, "বাছা পচা, (ভোলাদাদার পুত্রের আদরের নাম) ছোঁড়া দেখিতেছি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং তুমিও শুনিলাম তাহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাক, লুকাচুরি করিয়া তোমরা আর এইরূপে কত দিন কষ্ট পাইবে? আইস তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া থাকিবে চল, স্বামী স্ত্রীর ন্যায় থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না।"

স্ত্রীলোকটা সামান্য চাকরাণী শ্রেণীর স্ত্রীলোক। সে ভোলাদাদার কথা শুনিয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিছানাপত্র লইয়া ভোলাদাদার সঙ্গে ভোলাদাদার গৃহে যাইয়া সংস্থাপিত হইল। ভোলাদাদার একটী বেতনভোগী চাকরাণী ছিল—কিন্তু এই স্ত্রীলোকটা আসিবামাত্র ভোলাদাদা চাকরাণীকে জবাব দিয়া স্ত্রীলোকটাকে বলিলেন যে, "বাছা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে ত আপনার কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইতে—এই বাড়ীও এইক্ষণে তোমার বাড়ী হইল, অতএব গৃহস্থালী সকল কর্ম্ম কাজ তোমারই নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" এইরূপে ভোলাদাদা তাঁহার চাকরাণীর বেতনগুলি বাঁচাইলেন, এবং পুত্রকে গৃহের দ্রব্য সকল অপচয় করার রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। পুত্রের কিম্বা অপর লোকের চক্ষে এই কার্য্যটী যেভাবেই পরিগৃহীত হউক, কিন্তু ভোলাদাদার চক্ষে ইহা একজন বেতনভোগী চাকরাণীর পরিবর্ত্তে আর এক জন অবৈতনিক চাকরাণী আনিয়া নিযুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন ত আপনারা বুঝিলেন যে, আমার ভোলাদাদা কেমন সুবুদ্ধি লোক, তবে আর আমি ব্রাহ্মণভোজনের বিলম্ব করিব না। শুনুন।

পূর্ব্ববঙ্গের এক জেলার সদর স্থানে ভোলাদাদা এক চাকরী উপলক্ষ করিয়া সপরিবার; বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই উপরি উক্ত ঘটনা হয়। ভোলা দাদা কেবল তাঁহার বেতনের উপরে নির্ভর করিতেন এমন নহে, তাঁহার স্ত্রীর নামে তিনি অনেক টাকার মহাজনীও করিতেন এবং তাহাতে বেতন অপেক্ষা তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় ছিল। ইতিমধ্যে এক দিবস সংবাদ আসিল যে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে। কি করেন এক দিকে স্ত্রীর অনুরোধ আর এক দিকে লোক নিন্দা এড়াইতে না পারিয়া অনেক ধ্বস্তা; ধ্বস্তীর পরে ভোলা দাদা একটী ষোড়শ করিতে ও দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্ব দিবসে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে "ভাই আমি ত এই সকল কার্য্য কখনও করি নাই, অতএব এখানে আসিয়া কাল ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াইতে হইবে।" তাহাতে আমি কহিলাম যে "তবে কি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য একটা ফর্দ্দ ধরিতে হইবে?" তিনি উত্তর করিলেন যে কেবল "শাস্ত্র রক্ষার জন্য দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে, তাহার আবার ফর্দ্দের প্রয়োজন কি, আয়োজন যাহা করিতে হইবে তাহা আমি নিজেই করিব; ভোজনের সময় কেবল তুমি

আসিয়া পরিবেশন করিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে।” আচ্ছা বলিয়া আমি সম্মত হইলাম এবং পরদিবস যথাকালে ভোলা দাদার গৃহে গমন করিলাম—দেখিলাম যে ঘরের এক কোণে একখানা ডালাতে আন্দাজ এক সের মোটা লাল চিঁড়া ও ছোট এক মালসা দধি, এক সের ক্ষীর, এক সের কদর্য্য গুড় ও এক সের অপকৃষ্ট চিনি, কয়েক খানা কলা পাতা ও কয়েক খানা কুশাসন সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ আয়োজনের স্বল্পতা দেখিয়া ইহার দ্বারা ১২ জন ব্রাহ্মণের ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন বলিয়া, আমি প্রকাশ করাতে, ভোলা দাদা বলিলেন যে “না হয় আরও জিনিস বাড়ীর মধ্যে আছে আবশ্যক হইলে আনাইয়া কার্য্য সমাধা করা যাইবে।” ইহা শুনিয়া আমি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম ; ক্ষণ কাল বাদে দেখিলাম যে একটী লাঠিতে ভর দিয়া একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলা দাদা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং মুখুর্য্যা মহাশয় বলিয়া আহ্বান করিলেন। মুখুর্য্যা মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনেক কষ্টে আসনের উপর বসিলেন ; দেখিলাম যে তাঁহার হস্ত পদ মাংস শূন্য, উদরটি স্ফীত এবং সেই উদরের বাম ভাগের উপরে তিন চারিটী ক্ষত স্থানে তৈলাক্ত, তলায় পটি বসান আছে, মুখের রং পাণ্ডুবর্ণ এবং শরীরে বিন্দুমাত্র রক্তের চিহ্ন নাই। জানিলাম যে ব্রাহ্মণটি প্লীহা অগ্রমাস ও যকৃৎ রোগে আক্রান্ত এবং তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে যে তিনি আর দীর্ঘ কাল এইরূপ নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তাঁহার পরে দুই ব্যক্তি ‘ক্ষক ক্ষক’ করিয়া কাশিতে কাশিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ; ইহারা উভয়েই অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ ; পঞ্জরের অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা এক একটি করিয়া গুণিতে পারা যায় ; প্রত্যেকের গলায় কয়েকটি মাতুলী এবং বুকে পুরাতন ঘৃত লেপিত ছিল, ইহাদের এক জনের যক্ষ্মা ও আর এক জনের হাঁপানী কাশী। এই দুই ব্রাহ্মণ বসিতে না বসিতে চতুর্থ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার উদরী রোগে পেট ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে এবং তাহার উপরে সবুজ বর্ণের শিরগুলি ভূগোলের মানচিত্রের নদীর ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে পঞ্চম ব্রাহ্মণটী কর্ণের উপরে পৈতা উঠাইয়া “ভোলা বাবু ঘটি কৈ? জলপাত্র কৈ?” বলিয়া দ্রুতবেগে ঘরের মধ্য হইতে একা গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন, বুঝিলাম যে ইনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি আসিলেন তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দ্বয়ে ভেড়ার রোমের এক একটী অঙ্গুরী এবং বাম কর্ণে সূত্র দ্বারা এক কড়া কানা কড়ী ঝুলিতেছে। সপ্তম ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল, দুই গণ্ডেতে দুইটী গুল বসান আছে এবং দন্তগুলি মিসী দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন যে রস-বাতে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। অষ্টম ব্যক্তির আধ কপালে শিরঃপীড়া। নবম ব্যক্তির অম্ল শূল রোগ; আহার করিলেই বমন হইয়া সকল উঠিয়া যায়, কখন কিছুমাত্র ক্ষুধা হয় না। দশম ব্যক্তির বিসূচিকা রোগে জীর্ণ করিবার শক্তি এককালেই লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হইলেই পীড়ার আধিক্য হয়; এই যে দুই প্রহর বেলা হইয়াছে তথাপি তিনি যেন সদ্য আহার করিয়াছেন এইরূপ ঢেকুর তুলিতেছেন। একাদশ ব্যক্তির যদিও যথার্থ এবং দ্রষ্টব্য কোন পীড়া ছিল না, তথাপি তিনি মনে মনে আপনাকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত পীড়িত বিবেচনা করিতেন এবং নিয়মিত আহার্য্য লঘু দ্রব্য ভিন্ন নূতন কোন দ্রব্য খাইতে হইলেই তাঁহার যৎপরোনাস্তি আশঙ্কা হইত। দ্বাদশ ব্রাহ্মণটী যুবা এবং বলিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, এবং সেই পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত বাছিয়া গুছিয়া এবং সাবধান হইয়া আহার করেন। এই দ্বাদশটী মূর্ত্তি সমবেত হইলে পরে ভোলাদাদা আমাকে তাঁহাদের শুনাইয়া বলিলেন যে, "দেখ ভায়া, ইহাঁরা সকলে বড় সম্ভ্রান্ত এবং মহামান্য ব্রাহ্মণ, অশূদ্র-পরিগ্রাহক, কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না, কেবল আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি ঠাকুরদের খুব করিয়া খাওয়াইবা যেন কোন বিষয়ে ত্রুটি হয় না।" কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই খুব করিয়া খাইবার লোক নাই, অধিকাংশের একখানা বাতাসা খাইয়া হজম করা দুষ্কর, তবে বলিতে পারি না, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ না পারেন এমন কর্ম্ম নাই; সহস্র পীড়িত হইলেও ব্রাহ্মণ ফলারে মজবুত। সে যাহা হউক, পরন্তু আমি পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পাতায় চিঁড়া দিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি পাতার উপরে দুই হস্ত বিস্তীর্ণ করিয়া চিঁড়া দিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ যতই নিষেধ করেন, ভোলাদাদা ততই "দেও দেও" বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিল যে, "ভোলা বাবু রক্ষা কর, আমাকে চিড়া দিও না, চিড়া খাইলে অদ্যই ওলাউঠা হইয়া মরিব, আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে যাই না, কেবল

তোমার কয়েকটা টাকা ধারি বলিয়া সেই খাতিরে তোমার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি, নচেৎ আমার এখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় নহে, রক্ষা কর চিড়া দিও না।” তথাপি ভোলাদাদার “দেও দেও” শব্দ থামে না। এইরূপে আরও কয়েক জনে চিঁড়া লইলেন না, যাহারা লইলেন, তাহারা কেহ একমুষ্টি কেহ অর্দ্ধমুষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। তামাসা দেখিলাম যে, যাঁহারা নিষেধ করেন, তাঁহাদের বেলাই ভোলাদাদা বারম্বার “দেও দেও” বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহারা লইলেন, তাঁহাদের সময় তিনি একটী কথাও বলিলেন না। পরন্তু দধি দেওয়ার সময়ও ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। এক বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই দধি দেওয়ার সময় হস্তদ্বারা পাতা ঢাকিয়া রহিল—বিশেষ যাহাদের কাশী ও রসবাত, তাঁহারা আমি তাঁহাদের নিকট দধি লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র “না না আমাদের দৈ দিও না, দৈ আমাদের বিষ, দৈ খাইলে মরিয়া যাইব” বলিয়া নিষেধ করিলেন। ক্ষীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কেহ দুই ফোঁটা কেহ এক ফোঁটা মাত্র লইলেন। বস্তুত অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এক কালেই কিছু খাইলেন না, কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এক চিমটী গুড় কিম্বা চিনি মুখে দিয়া এক ঢোক জল পান করিলেন। এবম্প্রকারে ভোলা দাদার শ্বশুরের শ্রাদ্ধে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্য্য সমাধা হইল। পরে জানিলাম যে উহাঁরা সকলেই ভোলা দাদার খাতক এবং সেইজন্য তাঁহারা ভোলা দাদাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের কেহই নিমন্ত্রণ খাইবার ব্যক্তি নহেন। দেখিলাম যে আহারের যে সকল দ্রব্য দেখিয়া আমি অতি স্বল্প বিবেচনা করিয়াছিলাম, ফলে তাহা প্রচুর অপেক্ষাও অধিক হইল কারণ সকল দ্রব্যই কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণেরা চলিয়া যাওয়ার পরে ভোলা দাদা হাস্য বদনে আমাকে বলিলেন “দেখলে ভায়া কেমন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম, শাস্ত্রও রক্ষা হইল এবং পয়সাও অধিক খরচ হইল না; এইরূপ না করিলে গৃহস্থলি চলে না।” আমি ভোলা দাদার পদধূলী লইয়া প্রস্থান করিলাম।

শ্রীমতী রাধিকা নিকুঞ্জে।

তপন-তনয়া তটে, মঞ্জু-কুঞ্জ-কাননে
মৃদুল-মলয়ানিলে, কুসুম-কামিনী দু'লে
মধুকর-করে ধরি, হাসি,' ও কি বলিছে!—
—রাধিকারমণে মোর তবে বুঝি দেখেছে!
মাধব মাধব-কথা, অথবা এনেছে তথা
কি বলে উহারা যাই চুপে চুপে শুনিগে,—
—রাধিকা-হৃদয়-নিধি পাই যদি দেখিগে!
ওহে শ্যাম শশধর রাধিকার প্রীতি-কর,
সুখের কৌমুদীরাশি তোমা সনে গিয়াছে,—
—ঘোর-তর অন্ধ-কারে ব্রজ ধাম ডুবেছে!
না শুনি মুরলী ধ্বনি, না উজানে সে তটিনী,
শিখিনী দুখিনী এবে নৃত্য করা ভুলেছে!—
—তমাল-কদম্ব-তল শোভাহীন হয়েছে!
আহা মরি একি একি, পত্রের মাঝারে থাকি'
"কুহু—কুহু" রবে ওই কে সহসা ডাকিল।—
—নিকুঞ্জ-বিহারী মোর নিকুঞ্জে কি আসিল?
হৃদয়-উজ্জ্বল-মণি, এসেছ এসেছ তুমি!
মুরলী সুরবে নাথ দাসী তোমা চিনেছে!—
—শ্রবণ-রঞ্জন ধ্বনি জ্ঞান-হারা করেছে!
যাই যাই ত্বরা করি, হেরিগে প্রাণের হরি,
সুচারু-বদন-পদ্ম কত শোভা ধরেছে!—
—না হেরি'এ অভাগীরে বুঝি ম্লান হয়েছে!
সখী-গণ কোথা এবে, আয় লো আয় লো সবে,
হৃদয়-পিঞ্জর পাখী চুপে চুপে ধরিবে!—
—জানিলে রাখালগণ কাড়ি' লয়ে পলাবে!
এই যে এই যে পাখী, পত্রের মাঝারে থাকি,
"কুহু কুহু" রবে এই জগতে মাতায় লো!—
বেণুর সুরব হেন, মম মনে ভায় লো!

কপটতা করি' কালা, ছলিতে ব্রজের বালা,
বুঝেছি বুঝেছি নাথ, বিহঙ্গিণী হয়েছে!—
—"কৃষ্ণ-কালী-রূপ" ধরি' মোরে রক্ষা করেছে!
দাঁড়ায়ে তমাল তলে, ডাকি "নাথ—নাথ" ব'লে
অশ্রুবারি দরদরি কপোলে ভাষায় হে,
—শরত সুধাংশু মুখে চুম্বিতে যাহায় হে!
নবজলধর-রূপ, ব্রজ-বধূ-কাম-কূপ
আহা মরি সহচরি ত্বরাকরি আয় লো!
—এবার ধরিলে শ্যামে কেবা লয়ে যায় লো!
মোর তরে ঝুরি ঝুরি, আঁখি দুটী আ'হা মরি,
তরুণ-অরুণ-ভাতি দেখ দেখ হয়েছে!—
সখি সখি কৃষ্ণ-পাখী, এ নহে লো কৃষ্ণ-পাখী,
"কুকু—কুকু—কুকু" বলি ওই দেখ উড়িল!—
—কোকিলা সরলা বালা হৃদে বাজ হানিল!
উড়িল মাধব-ঘোষা, অধীরা মাধব-যোষা,
"হায় নাথ কোথা তুমি" বলি ভূমে পড়িল!
—গলিত-কবরী মরি ধুলি মাথা হইল!

মাক্‌বেথ ও হ্যাম্‌লেট।

৬

পঞ্চমদৃশ্যে প্রান্তরভূমিতে ডাকিনীরা বিচরণ করিতেছে। এবার তাহাদের সঙ্গে তাহাদের পরিচালিকা হিকেট আছে। দুরাকাঙ্ক্ষার পরিচালিকা আর কি? পৈশাচিকী মায়া। মায়া বলিয়া দিল 'এবার মাক্‌বেথকে এমনই করিয়া ভেল্‌কি দেখাইতে হইবে, যেন—

কুহকের কুহেলিতে হয়ে সে আচ্ছন্ন,
একেবারে হয় তাতে পুরা মতিচ্ছন্ন।
অদৃষ্ট ঠেলিবে পায়ে, না ডরিবে মরণে,
দয়াধর্ম্ম ভয়শূন্য আশার ছলনে।

আত্মবলে করিবে সে অটল বিশ্বাস,
আত্মম্ভর (ই) মানুষের করে সর্ব্বনাশ।'

বাস্তবিক আত্মনির্ভরে আপনাকে নিরাপদ মনে করাই মানুষের বিষম ভ্রম, ঐ বিশ্বাসই মানুষের প্রধান শত্রু, উহাতেই সর্ব্বনাশ হয়। স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বানুবর্ত্তিতা, সহজ জ্ঞান, বিবেক—* বলিয়া যতগুলি ভাব জাহাজে আমদানি হইয়াছে—এ সকলই আত্মম্ভরিতার নামমাত্র। ঐ গুলাই আমাদের প্রধান শত্রু। বালককালে পিতামাতা—উপাধ্যায়, আচার্য্য,—উপদেষ্টা ও দৃষ্টান্তদাতার উপর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নির্ভর করিতে হয়। গৃহস্থ হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ব্যবহারশাস্ত্রে (আইনে) নির্ভর করিতে হয়। যে গৃহস্থাশ্রমের ঊর্দ্ধে যাইতে পারে—সে জগদীশ্বরে নির্ভর করে। আত্মনির্ভরের স্থল নাই—যে মায়ামোহে ভ্রান্ত, সেই আপনাতে নির্ভর করিয়া নিরাপদ মনে করে। কিন্তু যে মহাপাপী, সে ত নীতি মানে না, ধর্ম্ম মানে না—মাকবেথ নিজেই বলিয়াছেন, † সে প্রাণ ভরিয়া একবার বলিতে পারে না, যে ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর! সুতরাং তাহার ত আর নির্ভর করিবার কিছু নাই—কাজেই সে আত্মনির্ভর করে সুতরাং সর্ব্বনাশের পথে সহজেই যায়, মাকবেথ যাইতে বসিয়াছে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে দুই জন ওমরা ডঙ্কান্ ও বাঙ্কোর হত্যার কথা ভাবিতেছেন—দুর্ব্বৃত্ত মাকবেথের হস্তে দেশের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন; মাক্‌ডফ্ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছে, তিনি যেন ডঙ্কানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাল্‌কোমকে লইয়া সত্বর দেশে ফিরিয়া আসিয়া, অভাগা মাক্‌বেথের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার করেন তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতেই তৃতীয় অঙ্কের শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এক গিরিগুহার অভ্যন্তরে বৃহৎ কটাহ টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। সেই তিনটা ডাকিনী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুহামুখে বাহিরে বজ্র গর্জ্জন করিতেছে।

---

* বিলাতী আমদানি ছাড়া দেশী বিবেকও আছে; তাহার অর্থ—এমন শক্তি যাহার দ্বারা একটি হইতে অন্যটিকে পৃথক করা যায়—শক্তির নাম বিবেক—কাজের নাম বিবেচনা। মন্দ কাজ করিতে গেলে, ভিতরে যে খিট্‌খিট্‌নি হয় তাহা আত্মগ্লানি; ভাল কাজে যে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা আত্মতুষ্টি। উভয়ই আত্মার ভাব মাত্র।

† ৪২০ পৃষ্ঠা দেখ।

ডাকিনীরা জ্বলন্ত কটাহে নানা প্রকার টোট্‌কা টাট্‌কা ফেলিতেছে—ও সেই কড়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া গান করিতেছে। এবার সে সাবেক ধুয়া বদলাইয়াছে। এখন আর বলে না—

সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর।

ওত পাপীর প্রথম অবস্থার মনের ভাব ; এখন কি বলিতেছে শুন,—

ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে,—
আগুণ জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে।

এই কথাই ঠিক। এখন হইতে দেখিবে মাকবেথে পাপের ছটফটানি ধরিয়াছে ; মাক্‌বেথ যতই ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন, শাসন করিতেছেন, সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহার মনের আগুণ ততই জ্বলিয়া উঠিতেছে—হৃদয় কটাহ ততই টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। মহাপাপের ঐ আর এক সাজা! সৎপথে থাকিলেও নানারূপ শোক-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা আছে—কিন্তু পাঁচ কাজে তাহার অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু মহাপাপী—

যতই—ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে।
ততই—আগুণ জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে॥

হিকেট আসিয়া দেখিল, ডাকিনীরা বড়ই যোগাড়যন্ত্র করিয়াছে—হিকেট বড় খুসী হইল। গান জুড়িয়া দিল—এমন সময় মাক্‌বেথ আসিল। সে বার ডাকিনীরা সুযোগ বুঝিয়া মাক্‌বেথকে দেখা দিয়াছিল, এবার মাক্‌বেথ স্বয়ং অভিসার করিয়াছে।

মাকবেথ বলিলেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে হইবে। ডাকিনীরা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মুখে উত্তর শুনিবে, না আমাদের পরিচালক উপদেবতাগণের স্থানে শুনিবে?' মাকবেথ বলিলেন, 'তাহাদের নিকটেই শুনিব।' তখন ডাকিনীরা সকলে মিলিয়া প্রেতযোনিদের আহ্বান করিতে লাগিল।

বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই এক সশস্ত্র মূর্ত্তি দেখা দিল। মাক্‌বেথ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, ডাকিনীরা বলিল, "প্রেতমূর্ত্তি তোমার মনের কথা বুঝিয়া নিজেই বলিবে, তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না"

প্রেতমূর্ত্তি বলিল—"মাক্‌বেথ সাবধান! মাক্‌ডফকে অবধান করিও।" মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

আবার বজ্রগর্জন হইল। রক্তাক্ত এক বালক হইল। বলিল, "মাক্‌বেথ মাভৈঃ নারী জঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না" বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

আবার বজ্রের হুঙ্কার। মুকুটমস্তক এক বালক, হস্তে একটি বৃক্ষ ধরিয়া আছে; এই মূর্ত্তিতে তৃতীয় প্রেত আবির্ভূত হইল; বলিল, "মাক্‌বেথ কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিও না যতক্ষণ বর্ণান বন ডন্‌সিনেন পর্ব্বতে না আসিবে, ততক্ষণ তোমার পরাজয় নাই।" মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, মাক্‌বেথ মহা আনন্দিত হইলেন! বলিলেন, "তোমরা পার যদি আর একটি বিষয়ে আমরা কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর। বল বাঙ্কোর বংশ এই রাজ্যে রাজা হইবে কি না?" ডাকিনীরা দৃশ্যপটে দেখাইতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে আট জন রাজা দেখা গেল, শেষের হস্তে একখানি দর্পণ আছে—সেই দর্পণে আর কত রাজার মূর্ত্তি রহিয়াছে—পশ্চাতে রক্তাক্ত বাঙ্কো মাক্‌বেথের পানে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন। ঈর্ষায় মাক্‌বেথের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ডাকিনীরা তাহার উপর নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল; মাক্‌বেথ ঈর্ষায় ক্ষোভে বিহ্বল—একটু পরে চাহিয়া দেখেন ডাকিনীরা অন্তর্হিত হইয়াছে। 'গুহার বাহিরে কে আছে?' বলিয়া মাক্‌বেথ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজসহচর লেনক্স আসিলেন বলিলেন "ডাকিনীদের দেখিয়াছ?" লেনক্স বলিলেন "না।" "তোমার ঐ দিক দিয়া তাহারা আসে নাই?" লেনক্স আবার বলিলেন "না।" তখন মাক্‌বেথ দন্ত কড়মড়ি করিয়া বলিলেন, "তবে দেখিতেছি, তাহারা বায়ুপথে যাতায়াত করে—তাহাদের গম্য পথের বায়ু উচ্ছিন্ন যাউক ও তাহাদের কথায় যে বিশ্বাস করে সেও উচ্ছিন্ন যাউক।"

মাক্‌বেথ! এখন যাই ডাকিনীদের প্রদর্শিত পরিণামে বিশ্বাস করিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, তাই তুমি শাপাতাপা করিতেছ—কিন্তু ঐ ডাকিনীরা যখন তোমাকে ভাবি নবপতি বলিয়া সম্বোধন করে, তখন বড় আনন্দে বিশ্বাস করিয়াছিলে! 'যে ডাকিনীদের কথায় বিশ্বাস করে, সে উচ্ছিন্ন যাউক, এ কথা তুমি আর কাহাকে বলিতেছ? তুমিত তোমার নিজের কথারই বলবন্ত প্রমাণ!

মাক্‌বেথ লেনক্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বক্ষুর ধ্বনি শুনিতে ছিলাম—কে আসিযাছে?" "দুই তিন জন দূত আসিয়াছে—তাহাদের সংবাদ এই যে মাকডফ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছে।" তখন মাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন

'দেখ মাকৃডফকে হত্যা করিব মনে করিয়াছিলাম, বিলম্ব করাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইল না এখন হইতে হৃদয়ে যখন যাহা স্থির করিব কার্য্যে তখনই তাহা করিব। মাক্‌ডফ্ পলাইয়াছে, আচ্ছা! তাহার স্ত্রী-পুত্র ত আছে, সকলকে প্রাণে নষ্ট করিব। মিথ্যা নির্ব্বোধের মত কতকগুলা সাহঙ্কার সংকল্প করিয়া ফল কি? সদ্যোজাত সংকল্প সদ্য সদ্যই কার্য্যে সুসিদ্ধ করা আবশ্যক।' এই বলিয়া আগন্তুক দূতেদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ—লেনক্সের সহিত প্রস্থান করিলেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। পাঠক এই সময়ে একবার মাক্‌বেথ নাটকেব মুল কথা স্মরণ করিবেন—শুভাশুভস্য শীঘ্রং।

দ্বিতীয় দৃশ্য মাক্‌ডফ ভবনে। গৃহিণীকে না বলিয়াই মাক্‌ডফ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন। গৃহিণী আপনার শিশু সন্তানের সহিত সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ছেলেটি বড় চালাক চতুর, মায়ের সঙ্গে কেমন কথার কাটাকাটি করিতেছে—মাক্‌বেথের প্রেরিত ঘাতুকগণ প্রবেশ করিল—মাতৃ-সমক্ষে সেই অপোগণ্ড শিশুকে হত্যা করিল, লেডি মাক্‌ডফ পালাইয়া গেলেন, ঘাতুকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মাক্‌বেথ যে বলিয়াছিলেন, মাকৃডফের পুরী সগোষ্ঠী নষ্ট করিবেন, তাহাই হইতে লাগিল। নরহত্যা মায়াচরী সহস্র করাল মুর্ত্তিতে স্কটলণ্ডের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য ইংলণ্ডে রাজভবনে। মালকাম্ মাকডফের সহিত পরীক্ষা করি-তেছেন। দেখিলেন সেই হৃদয় দেশভক্তি পরিপূর্ণ, দয়া-মায়ায় আপ্লুত। উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, লর্ড রস আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মাক্‌বেথের আদেশে মাকৃডফের স্ত্রী-পুত্র কন্যা দাসদাসী সকলই হত হইয়াছে। 'হা ভগবান্' বলিয়া মালকোম শিহরিয়া উঠিলেন। মর্ম্মাহত মাক্‌ডফ মুখ নত করিয়া চক্ষু আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্তানগুলি সব গিয়াছে?" ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রীও গিয়াছেন?" রস্ বলিলেন—আমি ত বলিয়াছি—কিছুই নাই," তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মাক্‌বেথের সন্তান নাই। হায় হায়, একবারে কচিকাচা ছেলেগুলি—তাদের প্রসূতি শুদ্ধ সব গেল!' তখন মাক্‌ডফ্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি একবার সম্মুখযুদ্ধে মাক্‌বেথের হৃদয়ে আপনার অস্ত্র পরীক্ষা করিবেন। এক অভিমন্যুবধে ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া-ছেন, এখন সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে মাকৃডফের প্রতিজ্ঞা দেখিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

পঞ্চম অঙ্ক রাজপ্রাসাদে। রাজমহিষী লেডি মাক্‌বেথ অসুস্থা হইয়াছেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে 'নিশিতে পায়,' তিনি গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় বিচরণ করেন, কথা কহেন—কত কি করেন। এইরূপ রোগের সময় রোগিণীকে দেখিবার নিমিত্ত একজন চিকিৎসক প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন; প্রথম দৃশ্যে রাজ্ঞীর একজন পরিচারিকার সহিত তাঁহার ঐ বিষয়েই কথোপকথন হইতেছে। এমন সময়ে জ্বলন্ত বাতি হাতে লইয়া লেডি মাক্‌বেথ শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছেন। লেডি মাক্‌বেথ সংজ্ঞাশূন্য, অথচ চক্ষু চাহিয়া আছেন; কিন্তু আপনার খেয়ালে যাহা কিছু দেখিতেছেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছেন না। চিকিৎসক দেখিতে লাগিলেন, লেডি মাক্‌বেথ বাতি রাখিয়া হাত ধুইবার মত ভাবে হাত কচ্‌লাইতেছেন। পরিচারিকা বলিল, যখনই নিশিতে পায়, তখনই ঐরূপ করিয়া থাকেন। তাহার পর উভয়ে শুনিতে লাগিলেন, লেডি মাক্‌বেথ আপনা আপনি বলিতেছেন;—

এই যে আর একটা দাগ রহিয়াছে!
দূর ছাই! পোড়া দাগ ধুলেও যায় না।

(যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া)

এক—দুই—এইত কাজের সময়;
নরকের কি আঁধার! ছি ছি—প্রভু
তুমি যোদ্ধা—তুমি বীর!—তুমি ভীত হবে?
কে জানিল, না জানিল, তাহাতে ক্ষতি কি?
আমাদের রাজশক্তির প্রতিযোধ ত নাই।
—কে জানিত বৃদ্ধ দেহে অত রক্ত ছিল?

চিকিৎসক পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন।

লেডী মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন;—

মাক্‌ডফের গৃহিণী—কোথায় এখন তিনি?
না—এই হাত দুটা হবে না পরিষ্কার!
আর কেন প্রভু? ওসব কথা আর কেন?
ওরূপে চমকি তুমি সব্ নষ্ট করিবে!

(হস্তের ঘ্রাণ লইয়া)

রক্তের দুর্গন্ধ হস্তে এখনো রয়েছে,
আরবের গন্ধদ্রব্যে, হবে না সুগন্ধ!
ওহ!

চিকিৎসক। কি বিষম শ্বাস! ক্ষত বক্ষে কি যন্ত্রণা!

পরিচারিকা। বাহ্যিক মর্য্যাদা সঙ্গে চাহিনা কখন
অন্তরের ঐ ভার করিতে ধারণ!

লেডী মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন,—

ভীত কেন? হাত ধোও, পর রাত্রিবাস—
বার বার বলিতেছি বাঙ্কো কবরেতে,
কবর হইতে কেহ আসিতে পারে না।
শোও গিয়া—শোও গিয়া—দ্বারে শব্দ হয়—
এসো, হাত ধরো—যা হবার তা হয়েছে
ফিরে পাওয়া যাবে না—শোও গিয়া—শোও গিয়া।
মাক্‌বেথ গৃহিণীও গিয়া শয়ন করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন;—

"দৈব বল আবশ্যক—ঔষধে হবে না।" এই স্থলেই প্রথম দৃশ্যের শেষ হইল। বস্তুবিক পাপের পরিণাম রূপ মহাব্যাধির জড় ঔষধ নাই।

ইহার পর তৃতীয় দৃশ্যে মাক্‌বেথ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—

জান না কি বৈদ্যরাজ শুশ্রূষা করিতে
পীড়িত মনের? উপাড়িতে স্মৃতি ক্ষেত্র
হতে বদ্ধমূল শোক তরু? মুছিবারে
মস্তিষ্কে অঙ্কিত যত কলঙ্ক কালিমা?
গুভার হৃদয়ের ভার খসাইয়া,
পার না কি বিস্মৃতির স্নিগ্ধ তৈল দানে
জুড়াইতে জীবনের জ্বলন যন্ত্রণা?

চিকিৎসক উত্তর দিলেন;—

আমাদের হাত নাই—অই সব স্থলে,
আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।

পূর্ব্বের কথার সহিত এই কথাটি গ্রহণ করিতে হইবে;—

"দৈববল আবশ্যক—ঔষধে হবে না;"
"আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।"

মহাপাপের পরিণামে যে সকল মহাব্যাধির উৎপত্তি হয়—এক মাত্র দৈববলের আশ্রয় লইয়া রোগীই কেবল সেই রোগের চিকিৎসা করিতে পারে।

এরূপ রোগী যদি আপনার রোগ বুঝিতে পারে—যদি বুঝিতে পারে, যে পাপের পরিণামে তাহার মানসিক পীড়া হইয়াছে, যদি তাহাতে ক্রমে তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়—ক্রমে ঘোরতর আত্মগ্লানিতে আক্রান্ত হয়—ক্রমে অগাধ নিরাশে নিমজ্জিত হয়,—যদি সেই অনন্ত নিরাশার মধ্য হইতে একবার অনন্ত মঙ্গলকে স্মরণ করিয়া বলিতে পারে—

মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা!
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।

তবেই রোগী সেই দৈববলে বলীয়ান্‌ হইয়া, আপনার চিকিৎসা আপনি করিতে পারে। সকল দেশেই একই রূপ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় দৃশ্য, ডন্‌সিনেন্‌ নিকটস্থ পল্লীপ্রদেশ। লেনক্স প্রভৃতি চারিজন প্রধান সর্দ্দার বহুতর সেনা-সমেত মাক্‌বেথ হস্ত হইতে দেশোদ্ধারার্থ আগত-প্রায় মাল্‌কোমের সহিত যোগ দান করিতে যাইতেছেন। অনুসঙ্গ ক্রমে মাক্‌বেথের মনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। মাক্‌বেথ দুঃসাহসে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে; ক্ষিপ্ত সিংহবৎ গর্জন করিতেছে, রাজ্যে আধিপত্য নাই; সেনা মধ্যে সুশৃঙ্খলা নাই। মাক্‌বেথ গুপ্ত বিদ্রোহী—লক্ষ লক্ষ প্রকাশ্য বিদ্রোহী তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যে, ডন্‌সিনেনস্থ রাজভবনের মধ্যে মাক্‌বেথ চিকিৎসক এবং অনুচর বর্গ। হিরণ্য কশিপু আপন মৃত্যু-সাধন দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মার বর পাইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় ছিল, মাক্‌বেথ কিন্তু ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্গণনায় বিশ্বাস করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। বার বার সেই কথা দুইটার জল্পনা করিতেছে—বলিতেছে বর্ণাম্‌ বন ডন্‌সিনেনে না আসিলে, আমার আর ভয় কি? আর মালকোম্‌কেই বা ভয় কি? সেত নারীগর্ভজাত"। একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, দশ হাজার ইংরেজ ফৌজ আসিতেছে মাক্‌বেথ দূতকে দূর করিয়া দিল। আপনার বিষম পরিণাম একবার চিন্তা করিল ভাবিল এ বয়সে কোথায় মান সম্ভ্রম—স্নেহ ভালবাসা—বন্ধু বান্ধব থাকিবে—না চারি দিকেই শত্রু—শত্রু—বিসম্বাদ এবং অভিসম্পাৎ। মাক্‌বেথ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না—ভৃত্যকে ডাকিয়া সমর-সাজ আনিতে বলিল। চিকিৎসককে একবার গৃহিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল—যখন চিকিৎসক বলিল—'আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।' তখন চিকিৎসককে ভর্ৎসনা করিল, বলিল—'কুক্কুরে ঔষধ তব কর প্রক্ষেপণ।' তাহার পর মাক্‌বেথ একবার চর্ম্ম বর্ম্ম ধারণ করে, আবার খুলিয়া ফেলে, আবার পরাইতে বলে; অন্তর্দাহে মাক্‌বেথ অস্থির, ডাকিনীরা শেষ ধূয়ায় তাহা বলিয়া দিয়াছে।

ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে—
আগুন জ্বলিবে—কড়া ফুটিবে।

মাক্‌বেথের হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে, বাহিরে তাহার টগবগানি দেখা যাইতেছে; মাক্‌বেথের অস্থির অবস্থা প্রদর্শনে তৃতীয় দৃশ্যের শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে, বর্ণাম কাননের নিকট দিয়া সসৈন্য মালকোম্‌ যুদ্ধ সজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন; মালকোম্‌ আদেশ দিলেন প্রত্যেক সৈনিক বর্ণাম বন হইতে এক একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া হস্তে লইয়া অগ্রসর হোক। তাহাতে শত্রু পক্ষে সৈন্য সংখ্যা বুঝিতে পারিবে না এবং রৌদ্র নিবারিত হইবে। সৈন্যরা তাহাই করিতে লাগিল।

মাক্‌বেথ! যে মূর্ত্তি তোমাকে ভবিষ্যদ্‌ ভাষায় বলিয়া যায়, 'বর্ণাম্‌ জঙ্গল ডন্‌সিনেনে না আসিলে, তোমার পরাজয় হইবে না'—তাহার হস্তে একটি বৃক্ষ শাখা ছিল মনে পড়ে কি? তাহার হস্তে বৃক্ষ শাখা কেন? তাহা বুঝিবার

চেষ্টা করিয়াছিলে কি? তখন বুঝ নাই, এখন বুঝ। ঐ দেখ বর্ণাম্ জঙ্গল জঙ্গম হইয়াছে—তোমার কাল উপস্থিত!—কিন্তু মাক্‌বেথ কোথা? ইহার পরের দৃশ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইব।

পঞ্চম দৃশ্যে, সেই ডনসিনেন রাজভবন প্রকোষ্ঠে সসৈন্য মাক্‌বেথ অবস্থান করিতেছেন; দুর্গের বহির্ভাগে সমর সজ্জার পতাকা সকল উড্ডীন করিতে আদেশ দিতেছেন; বলিতেছেন 'বিদ্রোহীরা শত্রুপক্ষে যোগদান না করিলে, দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে তাড়িত করিতাম।' এমন সময়ে প্রকোষ্ঠান্তরে পুরবাসিনীরা ক্রন্দনের রোল তুলিল। মাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন—'এক সময়ে একটি পেচকের ধ্বনি শুনিলে ভয়ে আমার অঙ্গ শীতল, কেশ কণ্টকিত হইত, কিন্তু ক্রমে অহরহ সন্ত্রাসে যাপন করিয়া এখন এমনই অভ্যস্ত হইয়াছি—এখন মহা বিভীষিকাতেও আর আমার চমক হয় না'; প্রতীহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের জন্য ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে?" প্রতীহারী উত্তর করিল—"প্রভো, মহারাণীর মৃত্যু হইল।" মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন;—

মৃত্যু তার—কিছু পরে,—হলে' ভাল হতো;
যথা কালে—অই কথা—শুনিতাম সুখে।—
অদ্য কল্য—অদ্য কল্য—অদ্য কল্য করি—
শনৈঃ শনৈঃ মহাকাল—প্রলয় যাবৎ
ধীরে কালসর্প বৎ—হয় অগ্রসর;
দিন যায়,—দিন যায়—দেখাইয়া পথ
মূর্ত্তিময় মৃত্যুহ্রদে—নির্ব্বোধ পথিকে।
নিভে যা রে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা,
এ জীবন চলচ্ছায়া—মায়া মাত্র সার।
মানুষ যাত্রার সঙ্—রঙ্গ ভঙ্গ করি,
নেচে কুঁদে—গান গেয়ে—কালীচুণ মেখে—
যায় সাজ ঘরে—কেহ না লয় খবর।
মানব জীবন শুদ্ধ—বাতুল প্রলাপ
ঘোর ঘটা শব্দ কিন্তু—ভিতরেতে ফক্কা।

দূত আসিয়া সংবাদ দিল বর্ণাম্ জঙ্গল অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তখন মাক্‌বেথ একটু একটু করিয়া বুঝিতে লাগিল—কাল আগত।

পাপে ধর্ম্মে—সমভাবে—নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধন। সংসারে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপথে প্রধান সহায়—তাহার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী। পাপিষ্ঠের পাপ পথের সহায়ও সেই সহপাপিনী স্ত্রী। মাক্‌বেথ গৃহিণী কেবল যে মাক্‌বেথের সহায় ছিলেন এমন নহে—তিনি যেমন আরম্ভে প্রবৃত্তিরূপা—তাঁহার সমস্ত জীবনে সেইরূপ শক্তি স্বরূপাও ছিলেন। কিসে স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিবেন, কিসে তাঁহার অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবেন, কিসে তাঁহাকে

দুষ্কর্ম্মের দারুণ স্মৃতি হইতে ভুলাইয়া রাখিবেন,—অহরহ কেবল সেই চিন্তা, সেই চেষ্টাই করিতেন। পাপের অন্তর্দাহের তুষানলে তাঁহার নিজ হৃদয় ক্ষাক হইতেছিল, এক দিনের তরে স্বামীকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই—পাছে তাহাতে স্বামীর শান্তি ভঙ্গ হয়। স্বামীর সান্ত্বনার্থ সমস্ত দিন মনের আগুণ চাপিয়া রাখিতেন—রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায়—সেই আগুণ জ্বলিয়া উঠিত; তিনি বিষম নিশিরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন—তবু সেই রোগের খেয়ালে, মাক্‌বেথকে সান্ত্বনা করিতেছেন—শোও গিয়া—শোও গিয়া—বারবার বলিয়া যখন খেয়াল দেখিতেন, যে স্বামী সুস্থ হইয়া শয়ন করিলেন, তখন নিজে শয়ন করিতেন।

এই মাক্‌বেথ গৃহিণী যখন স্বামীকে মহাপাপে লওয়াইতেছিল, তখন আমরা ঘৃণা মিশ্রিত ভয়ে প্রবৃত্তি-রূপাদের পদে নমস্কার করিয়াছিলাম—কিন্তু মাক্‌বেথ গৃহিণী যে, মহা রোগে আক্রান্ত হইয়াও স্বামী শুশ্রূষায় বিব্রত—ইহা ভাবিলে কি—সাক্ষাৎ সেবারূপিণীদের ভক্তিভরে আবার নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না?—হয় বৈ কি!

তাহাতেই বলিতেছিলাম পাপে ধর্ম্মে, নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধন—বড় বিচিত্র বন্ধন। মাক্‌বেথ মহাপাপী—তাঁহার গৃহিণী পাপিষ্ঠা—তবু গৃহিণী মাক্‌বেথের সাক্ষাৎ সেবা রূপিণী—হৃদয়স্থ শক্তিরূপা ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাক্‌বেথ বলিতেছিলেন—'মৃত্যু তাঁর—কিছু পরে—হলে ভাল হতো। শক্তির এখন আমার বিশেষ আবশ্যক—এমন সময়ে আমি শক্তি হারা হইলাম!' শক্তি হারা হইয়াছে বলিয়াই মাক্‌বেথ এত কাল পরে মহাকালের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার বুঝিতে পারিয়াছে। বঝিয়াছে—মানুষের জীবন শলিতার আলো—একটুতেই নিভিয়া যায়—বুঝিয়াছে মনুষ্য জীবন ছায়াময়—বুঝিয়াছে মানুষ যাত্রার সঙ্—বুঝিয়াছে—মানুষের জীবন কেবল পাগলের প্রলাপ।

লেডি মাক্‌বেথের মৃত্যু সংবাদে যখন মাক্‌বেথ এক দিকে শক্তি হারা হইয়া—আপনার ভার আপনি আর বহন করিতে পারিতেছে না, যখন—অন্য দিকে সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে শিথিল গ্রন্থি হইয়া এলাইয়া পড়িতেছে—তখনই তিতিক্ষায় বলিতেছে 'নিভে যা রে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা।' সেই তিতিক্ষার ঘোর মোহাবস্থায় দূত আসিয়া সংবাদ দিল—'বর্ণাম জঙ্গল অগ্রসর হইতেছে।' কাজেই সেই-শক্তি শূন্য, গ্রন্থি-শূন্য, তিতিক্ষা-পূর্ণ মাক্‌বেথ বুঝিতে পারিল—যে মহাকাল আগত প্রায়। তখন আপনার প্রকৃতিগত সাহসের শেষাংশ সঞ্চয় করিয়া সমর সজ্জায় প্রস্তুত হইল—বলিল;—

বহ বায়ু, ধর মূর্ত্তি—মহালয়-কারী
মৃত্যু মুখে মাক্‌বেথ—যায় সজ্জা করি।

এই সংকল্পে পঞ্চম দৃশ্যের শেষ। আর তিনটি দৃশ্য আছে।

নাটক।

নাটকের উপযোগী গল্প।

২। পূর্ণচন্দ্র।

শালিবান রাজা পঞ্জাব প্রদেশস্থ শিয়ালকোটের রাজা। ইচ্ছা তাঁহার মহিষী। অনেক যাগযজ্ঞেও দম্পতির সন্তান হয় নাই। সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথ সদয় হইয়া রাজরাণীকে দেখা দিলেন,—বলিলেন শিবরাত্রির উপবাস করিলে সন্তান হইবে। রাজরাণী ক্রমে তিনবর্ষ সেইরূপ করেন,—সন্তান হয় না; তাঁহাদের বিশ্বাস টলিল; পরবর্ষে ত্রয়োদশীতে তাঁহারা সংযম করিলেন না। গোরক্ষনাথ আবার দর্শন দিলেন—বলিলেন, "তোমরা অবিশ্বাসী—তোমাদের সন্তান হইবে কেন?" দম্পতি অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। যোগীবর রাজাকে বলিলেন, "সন্তান পাইবে—তবে তুমি ষোড়শ বৎসর তাহার মুখ দেখিও না—ঐ কালের মধ্যে দেখিলে, অমঙ্গল হইবে।" মহিষীকে বলিলেন "তুমি সন্তানের লালন পালন করিতে পাইবে, দেখো—যেন সন্তান সর্ব্বমঙ্গলালয়ের সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাসবান্ হয়; হইলে, তাহার মঙ্গল হইবে—তোমারও মঙ্গল হইবে।"

সময়ে সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান জন্মিল; রাজ্ঞী পৃথক্ ভবনে তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। রাজাতে রাজ্ঞীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র।

শালিবান একজন চর্ম্মকার দুহিতার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার নাম লূণা। ইহার পূর্ব্বে লূণার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গোরক্ষকনাথের একজন শিষ্য সেবাদাস তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। যৌতুকস্বরূপ লূণার পিতা জম্বুকে সেবাদাস মহাবিষ প্রদান করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর আরও কত ঔষধ পত্র আছে মনে করিয়া লূণা সেবাদাসের তল্পি চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। সেবাদাস তাহার পৃষ্ঠে তপ্ত লৌহে 'চোর' চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই অন্যপূর্ব্বা, চোর-চিহ্ণ-চিহ্নিতা চর্ম্মকারকন্যা লূণা শিয়ালকোটের দ্বিতীয়া মহিষী। কিন্তু রাজা এখনও এ বিবাহের কথা লোকলজ্জায় প্রকাশ করেন নাই।

পঞ্চনদস্থ আর একটি রাজ্যে রাজা নাই। রাজকুমারী সুন্দরা বড় রূপবতী—বড় গুণবতী ও বড় সাহসশালিনী, স্বয়ং সেনানায়িকা হইয়া যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্য স্বাধীন করিয়াছেন। তিনি মনোমত যোগ্য পতি পান নাই বলিয়া বিবাহ করেন নাই। সুন্দরা মন্ত্রী হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করেন।

কাল পূর্ণ হইলে রাজকুমার পিতৃসকাশে আগমন করিলেন। সেই দিনই লূণা পিতৃ পরামর্শে বিষ প্রদানের উদ্দেশে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজা অগত্যা প্রধানা মহিষীর নিকট লূণাকে বিবাহের কথা—লূণার অভি-

লাসের কথা বলিলেন। রাজ্ঞী ইচ্ছ্রা বলিলেন "তা মহারাজ এ কথা লুকাইবার কি প্রয়োজন ছিল—রাজাদের এমন ত শত মহিষী থাকে।" রাজা বলিলেন "তা সে যে চর্ম্মকার দুহিতা।" রাজ্ঞী বলিলেন "তা হলই বা; যেমন আমি আপনার চরণ স্পর্শে রাজরাণী হইয়াছি, সেও তেমনি হইবে।" রাজা বলিলেন "কুমারকে দেখিতে চায়, তার কি?" মহিষী বলিলেন "আমি যেমন, সেও ত তেমনি,—পূর্ণচন্দ্রের মা—দেখিতে চাবেই ত; কুমারকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিউন।" রাজা হিন্দু নারীর উদারতায় মুগ্ধ হইলেন। কুমার বিমাতার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

দুষ্টা লূণা যুবরাজের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার সঙ্গ কাঙ্ক্ষিণী হইল। যুবরাজ সংসার প্রবেশের প্রথম দিনে—সংসারের এই দারুণ দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হইয়া চলিয়া আসিলেন। প্রত্যাখ্যাতা বিমাতা প্রতিহিংসার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল।

লূণা যথারীতি বৃদ্ধ রাজাকে বুঝাইল যে, যুবরাজ তাঁহার উপর লালসান্বিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা,—রাজা তাহাই বুঝিলেন। লূণার ইচ্ছামত কুমারকে মরুভূমি মধ্যস্থ কূপে ফেলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মহিষী ইচ্ছ্রার আবার বিশ্বাস টলিল। তিনি রাজার ও লূণার কত সাধ্য সাধনা করিলেন—তাঁহারা শুনিলেন না। কুমারের কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্ব মাঙ্গল্যে অটল বিশ্বাস। তিনি মঙ্গলময়কে ডাকিতে ডাকিতে কূপে ঝম্প প্রদান করিলেন। ইচ্ছ্রা পাগলিনী প্রায় হইলেন—লূণা তাঁহাকে বাতুলালয়ে রাখিবার আদেশ দিলেন। ইচ্ছ্রা পূর্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ প্রায় হইল।

পূর্ণবিশ্বাসী পূর্ণচন্দ্রকে গোরক্ষনাথ উদ্ধার করিলেন। তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, রাজ্য দিতে চাহিলেন—পূর্ণচন্দ্রের প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে; তিনি গোরক্ষনাথের সেবার কামনা প্রকাশ করিলেন। গোরক্ষনাথ অনুমতি দিলেন—কিন্তু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোরক্ষনাথ সুন্দরার অতিথিশালা হইতে পূর্ণচন্দ্রকে ভিক্ষা আনিতে পাঠাইলেন। যোগীকে দেখিয়া সুন্দরা তাঁহাতে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। গোরক্ষনাথের সমীপে পূর্ণচন্দ্র ভিক্ষা মাগিল। গোরক্ষনাথ—পূর্ণচন্দ্রকে সুন্দরার ভবনে, সুন্দরা যতকাল বলে, বাস করিতে আদেশ করিলেন।

সুন্দরার ভবনে পূর্ণচন্দ্র নিত্য পূজাদি করেন—সুন্দরা পরিচর্য্যা করেন। একদিন আপনার আত্মসমর্পণ বৃত্তান্ত পূর্ণচন্দ্রে নিবেদন করিল। কাতরবাক্যে বলিল, "আপনি একবার পত্নী সম্বোধনে ডাকুন—এইমাত্র। আমি আপনার যোগভ্রংশ করিব না।" পূর্ণচন্দ্র বলিলেন "সুন্দরা! যোগিদের সংসার আশ্রম নিষিদ্ধ। তুমি কেন ঐহিক পতি-পত্নীভাবের জন্য লালায়িত হইতেছ? শঙ্কর গোরক্ষনাথের সেবায় নিষ্ঠাবতী হও—তোমায় আমায় পরকালে সমসেবায় এক আত্ম হইব।" সুন্দরা বুঝিল,—বলিল, "আর আমি আপনার প্রভু-সেবার হন্তারিকা হইব না, আপনি প্রভুর সকাশে গমন করুন।"

সুন্দরা বুক বাঁধিল, ইহকালে স্বামীসেবা অদৃষ্টে নাই বুঝিয়া, কাতরা

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা করিতে সংকল্প করিল। তোমরা ইচ্ছা মহিষীতে হিন্দু পত্নী দেখিয়াছিলে, সুন্দরায় হিন্দু বধূ দেখ। সুন্দরা মনে মনে মাত্র বিবাহ করিয়া আপনার রাজ্য ঐশ্বর্য্য—আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া এখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা করিতে যাইতেছে!

সুন্দরা রণসজ্জা করিয়া শিয়ালকোটে শালিবানকে আক্রমণ করিল,—পরাস্ত করিল,—সন্ধি করিল, প্রধানা মহিষীকে মাতুলালয় হইতে মুক্ত করিল। যে ভবনে তিনি সন্তান পালন করিয়াছিলেন, সেই ভবনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল, আপনি ছদ্মবেশে দিবারাত্রি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

এদিকে লূণা শালিবানকে বিষ খাওয়াইয়াছে।—সেই বিষ। রাজা রোগে শীর্ণ হইতেছেন। কোন সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করিবেন স্থির করিলেন। পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া—অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোরক্ষ-নাথের সমীপে আগমন করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ মহারাজকে ঔষধ দিতে পূর্ণচন্দ্রকে আদেশ করিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র রোগজীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে ঔষধ দিলেন। সেবাদাস সঙ্গে ছিলেন—লূণার পূর্ব্বচরিত্র ধরা পড়িল—আপনার মুখে পাপীয়সী কুমারের উপর মিথ্যাপবাদ দেওয়ার কথা স্বীকার করিল। রাজা তখন আপনার পুত্রহত্যার কথা স্মরণ করিয়া, সেই পুত্রশোকে মহা কাতর হইলেন। পূর্ণচন্দ্র আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া রাজাকে সময়ে সান্ত্বনা দিলেন। মাতার ছিন্নমতি নষ্টদৃষ্টি ঘুচিল—তিনি আবার তাঁহার পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পাপীয়সী লূণা পিতার সহিত জ্বালামুখীতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রেরিত হইল।

দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মূর্ত্তিতে কৈলাসশিখরে, বৃষভ বাহনে, বামে মহাশক্তি লইয়া আবির্ভূত হইলেন, বলিলেন—"রাজা, রাণী তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না। পূর্ণচন্দ্র জড় সিংহাসনে বসিবেন না, তিনি দেশে দেশে 'বিশ্বাসে মঙ্গল'—এই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন—কৈলাসে সুন্দরার সহিত মিলিত হইবেন। এই স্থলে গোরক্ষনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিও।"

তখন চারিদিকে শব্দ হইতে লাগিল—"জয় পার্ব্বতীনাথ কি জয়—জয় গোরক্ষনাথ কি জয়।"

আবার জিজ্ঞাসা করি,—কিরূপ গল্পে নাটক হয়—তাহা বুঝিলে কি? না বুঝিয়া থাক—আরও দুই চারিটি গল্প বলিব।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫। } ১১শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৮।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ॥ ২২॥

পদচ্ছেদঃ। মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ-ততঃ অপি বিশেষঃ।

পদার্থঃ। স্পষ্টম্।

অন্বয়ঃ। তীব্রস্য মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ ততঃ আসন্নাদপি বিশেষঃ সমাধি-লাভ ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। পূর্ব্বসূত্রোক্তবিশিষ্টান্তর্গতস্য তীব্রত্বস্য মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বেন মৃদুতীব্রোমধ্যতীব্রোঽধিমাত্রতীব্র ইতি ত্রৈবিধ্যাত্তত আসন্নাদপি বিশেষঃ তর-তমরূপ ইতি তথাহি মৃদুতীব্রসংবেগস্য আসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংযোগস্য আসন্নতরঃ তস্মাৎ অধিমাত্র তীব্রসংযোগস্যাধিমাত্রোপায়স্যাপ্যাসন্নতম সমাধি লাভ ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্ব সূত্রে যে সংবেগের তীব্র এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সেই তীব্রত্ব ও আবার মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্র এই প্রকার হওয়ায় তীব্র সংবেগশালী যোগীদিগের সমাধি লাভে বিশেষ অর্থাৎ শীঘ্রতার তারতম্য লক্ষিত হয়।

সমালোচন। তীব্র সংবেগ শব্দের অর্থ ভাষ্যকার, চরম সীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য বলিয়াছেন কিন্তু সেই চরমসীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য সকলের একরূপ হয় না, কাহারও বা মৃদু অর্থাৎ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, কাহারও বা মধ্যগতিতে উৎপন্ন হয় আর কাহারও অতি শীঘ্র উৎপন্ন হয়; কাযেই তীব্র সংবেগশালী যোগীদের

সমাধি লাভের শীঘ্রতার তারতম্য স্বীকার্য্য, যাহার তীব্র সংবেগ মৃদু তাহার শীঘ্র সমাধি লাভ হয়, যাহার মধ্য তাহার তদপেক্ষা শীঘ্র সমাধি সিদ্ধি হয় আর যাহার অধিমাত্র তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। ভাষ্যকার বলেন কেবল সমাধি নয়, তাহার ফল মোক্ষও উহার সহিত একই ক্রম অনু- সারে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

পদচ্ছেদঃ। ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ-বা।

পদার্থঃ। ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ পুরুষবিশেষঃ প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং, বিষয়সুখাদিকং ফলং অনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি তৎ প্রণিধানং ইতি নিষ্কর্ষঃ তস্মাৎবা অথবা।

অন্বয়ঃ। অথবা ঈশ্বরে প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাৎ অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধি লাভোভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাদাবর্জ্জিতঃ ঈশ্বর স্তমনুগৃহ্নাত্যভিধ্যান মাত্রেণ তদভিধ্যানমাত্রেণাপি যোগিনঃ আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ মোক্ষশ্চ ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। ঈশ্বরে বিশেষ ভক্তি করিলেও অতি শীঘ্র সমাধিলাভ হইতে পারে।

সমালোচন। পূর্ব্বে সমাধি সিদ্ধির এক প্রকার উপায়, তাহার ভেদ, ও তারতম্য ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া এই সূত্র দ্বারা অন্য প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেননা জগতের লোক মাত্রেই কেবল ভিন্ন রুচি নয়, তাহা- দের শক্তিও বিভিন্ন। একজনের যাহা ভাল লাগে অন্যের তাহা ভাল লাগে না এবং একজনের যাহা সাধ্যায়ত্ত অপরের পক্ষে তাহা হয় ত অতিশয় দুষ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নিমিত্ত পরম দয়াবান্ মহর্ষিগণ এক একটী বিষয়ে সিদ্ধি লাভের প্রতি প্রায়ই বিভিন্ন উপায় কল্পনা করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে যাহা ভাল বুঝিবে, যে যাহা স্বীয় সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। এই নিমিত্ত আজ মহর্ষি পাতঞ্জল সমাধিলাভের প্রতি দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করি- লেন। পূর্ব্ব কথিত উপায় পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় উপায়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় উপায়টি ভাল করে বুঝিতে হইলে, ঈশ্বর এবং প্রণিধান এই দুইটি কথা বুঝা চাই। তাহার মধ্যে সূত্রকার পর সূত্রে নিজেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল 'প্রণিধান' শব্দটি বুঝিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ বিশেষ ভক্তি, অথবা চরমসীমা প্রাপ্ত ভক্তি। যে ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মের ফল অনুসন্ধান না করিয়া, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ভোগাদি তুচ্ছ করিয়া নিজের কার্য্য অপকার্য্য সমুদয় অথবা এক কথায় আত্মাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সেই ভক্তির নাম প্রণিধান। সেইরূপ ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বর ঐ ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিয়া ঐকান্তিক ভাব প্রদান করেন, তাহাতে সমাধি ও তাহার ফল মুক্তি অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এ উপায়ের মৃদু, মধ্য অধিমাত্রতা নাই; ইহাতে তীব্র সংবেগ ও তাহার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রত্ব ধর্ম্মভেদে ফল সিদ্ধির শীঘ্রতার তারতম্য নাই। ইহাতে কেবল "যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যদ্দদাসি, জুহোষি যৎ—তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং" ইহাই আবশ্যক। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম ফলের অনুসন্ধান না রাখিয়া অথবা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিরকালের মত মত বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরে আপনার সমুদয় কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিলেই এ পথের পথিক হওয়া যায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিলাভের যে দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিলেন তাহার মধ্যে প্রথমটিকে জ্ঞানমার্গ এবং দ্বিতীয়টিকে ভক্তিমার্গ বলা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা আত্মজ্ঞান কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ জগৎকে বিস্মৃত হইয়া মনকে স্থির করিতে শিখিতে হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া মনের বৃত্তি সকল বিলোপ করিতে হয়। প্রথম পথে ফল সিদ্ধির তারতম্যে বিলম্বতা ও শীঘ্রতা আছে। দ্বিতীয় পথে সে সব কিছুই নাই; এ পথের পথিকেরা সকলেই সমানভাবে সিদ্ধি লাভ করে। তবে ইহাদের মধ্যে কোন পথ সুগম তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের অসাধ্য। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেমন দুরূহ, যথার্থ ভক্ত হওয়াও যে তাহা অপেক্ষা সহজ নয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বরং আমরা বলি আত্মার স্বরূপ জানা যেরূপ দুষ্কর, আত্ম বিস্মৃত হওয়া তাহা অপেক্ষা অধিক।

ঈশ্বর কে? তাঁহার কিরূপ স্বরূপ? প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়বিধ মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে উহা কোন তত্ত্বের অন্তর্গত? এই সকল আশঙ্কার নিবারণের নিমিত্ত সূত্রকার ঈশ্বরের পরিচায়কসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

পদচ্ছেদঃ। ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ, ঈশ্বরঃ।

পদার্থঃ। ক্লিশ্নন্তি খল্বমী সাংসারিকং পুরুষং বিবিধদুঃখপ্রহারেণেতি ক্লেশাঃ অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ বিহিত, প্রতিষিদ্ধ, ব্যামিশ্ররূপাণি বৈদিক লৌকিকানি ত্রিবিধানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম ইতিকেচিৎ। বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত ইতি আশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। তৈঃ অপরামৃষ্টঃ ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃষ্টঃ, পুরুষবিশেষ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ বিশিষ্যতে ইতি পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ঈশন শীলঃ ইচ্ছা-মাত্রেণ সকলজগদুদ্ধরণ ক্ষম ইত্যর্থঃ।

অন্বয়ঃ। ক্লেশ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বরস্তু ন তত্ত্বান্তরং পুরুষ—তত্ত্ব এব তস্যান্তর্ভাবঃ। তত্র বিশেষস্তু অন্যে পুরুষাঃ ক্লেশাদিভিঃ পরামৃষ্যন্তে ঈশ্বরস্তু তৈঃ কদাপি ন পরা-মৃষ্যত ইতি। নন্থ ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্মাঃ, কস্য চিদপি পুরুষস্য বস্তুগত্যা ক্লেশাদি স্পর্শো নাস্ত্যেব তৎ ঈশ্বরে কিং বৈশিষ্ট্যমিতি চেৎ সত্যং ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্মা অপি সর্ব্বত্রে সাংসারিকে পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে যথা যোধেষু বর্ত্তমানো জয়ঃ পরাজয়ো বা স্বামিনি। ঈশ্বরস্যতু ত্রিষ্বপি কালেষু তথাবিধঃ ক্লেশাদি পরা-পরামর্শো নাস্তীত্যতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ!

অনুবাদ। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় এই সকলের সম্পর্ক রহিত কোন বিলক্ষণ চৈতন্য বা আত্মাকে ঈশ্বর বলে।

সমালোচন। ঈশ্বর কি? ইহার উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর একটী বিলক্ষণ পুরুষ বা চৈতন্যশক্তি। যে জড় ও চৈতন্য লইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বর তাহা ছাড়া নয়। ঈশ্বরও তাহারই অন্তর্গত চৈতন্যস্বরূপ, ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু সংসারে সম্বদ্ধ যে সকল চৈতন্য, ঈশ্বর তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাবের। সাংসারিক চৈতন্য বা পুরুষগণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা সংস্পৃষ্ট, ঈশ্বর চৈতন্য সেরূপ নয়; এই ভেদ। এক্ষণে ক্লেশাদি কাহাকে বলে তাহাই প্রথমে বুঝান আবশ্যক। ভাষ্যকার বলেন যাহা সাংসা-রিক পুরুষদিগকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ দুঃখিত করে তাহার নাম ক্লেশ, উহা আর কি? অবিদ্যা আদি পাঁচটি। পরে উহাদের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইবে। বিহিত ও নিষিদ্ধ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের জনক ক্রিয়া সকলের নাম কর্ম্ম। বিপাক বলিতে কর্ম্মের ফল—জাতি ও আয়ুব ভোগ। আশয় বলিতে বাসনা কর্ম্ম জন্য চিত্তস্থিত

সংস্কার সকল। সাংসারিক জীব সকল এই ক্লেশাদি কর্তৃক আক্রান্ত। তাহার কর্ম্মের গতি শাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম সকল দুই প্রকার প্রথম প্রারব্ধ, দ্বিতীয় উপাদান ; প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিতে মনুষ্যের প্রথম ক্রিয়া, অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রতি ইচ্ছা প্রভৃতি কোন কারণ লক্ষিত হয় না যেমন, উৎপত্তি প্রভৃতি, যে সকল কর্ম্ম ঐ প্রারব্ধ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগকে উপাদান কর্ম্ম বলে। এই দুই প্রকার কর্ম্ম হইতেই মনের বাসনা বা সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়। ঐ বাসনা হইতে আবার সুখ-দুঃখাদির ভোগ হয়। সেই ভোগ হইতে পুনর্ব্বার বাসনার উদয় হয়। বাসনা হইতে আবার কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এইরূপ কর্ম্মের গতিকে কর্ম্মচক্র বা কর্ম্মবন্ধন বলে। সাংসারিক চৈতন্যমাত্রেই এই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্য সেরূপ নয়, ইহাঁর কর্ম্মবন্ধন নাই।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তোমাদের মতে চৈতন্যমাত্রেরই বন্ধন নাই, তবে ঈশ্বরের সহিত অন্যের বৈশিষ্ট্য কি হইল ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, চৈতন্যের সহিত ক্লেশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু সাংসারিক চৈতন্য সকলের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধির সহিত তাহাদের একটা স্ব-স্বামীভাব সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধবলে বুদ্ধিকে তাহারা আপনার বলিয়া বিবেচনা করে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশাদি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ অবস্থান করে। সাংসারিক চৈতন্য বা পুরুষগণ বুদ্ধিতে আত্মীয় বোধ থাকায় বুদ্ধিস্থ যাবৎ বস্তুতেও আত্মীয় বোধ করে। যেমন নিজের অধীনস্থ সৈন্যকৃত জয় বা পরাজয়ে রাজাগণের আত্মীয় বুদ্ধি হয়। যে চৈতন্যের সহিত যেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই, সেই চৈতন্যই ঈশ্বর।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল মুক্ত পুরুষ বা প্রকৃতিলীন প্রভৃতি যোগীগণের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্বন্ধ না থাকায় তাহাদিগের উপর ঈশ্বরের লক্ষণ যায় না কেন ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "স তু সদৈবমুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি।" মুক্ত পুরুষ বা যোগীদিগের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্ব্বে ক্লেশাদির সম্পর্ক ছিল এবং যোগীদিগের যোগভ্রংশের পরেও ক্লেশাদির সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যের কোন কালেই ক্লেশাদির সম্পর্ক হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই মুক্ত অর্থাৎ ক্লেশাদির সম্পর্ক রহিত এবং তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত, তিনি কোন কালেই কিছুরই অধীন নয়।

ঈশ্বর কেবল চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাতে সুখ-দুঃখ ভোগাদি সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য নাই, এ কথা—

"তত্র যঃ পরমাত্মাহি অনিত্যং নির্গুণঃ স্মৃতঃ
কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ মোক্ষ বন্ধৈঃ সযুজ্যতে।" (১)

ইত্যাদি অসংখ্য ঋষিবচন দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ভগবান্ নারদও বলিয়াছেন—

"পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্তোঽহংকারহ্য যুতোঽপরঃ।" (২)

যোগাচার্য্যদিগের মতে ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত ক্লেশাদি বন্ধন শূন্য হইলেও তিনি নিত্যজ্ঞানী, এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাবিশিষ্ট। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ঈশ্বর নিরুপাধি অতএব তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "বাধকং বিনা দৃষ্টানুসার ত্যাগানৌচিত্যাৎ" নিরুপাধির যে জ্ঞাতৃভাব হইতে পারে না এরূপ কোন বাধক কারণ নাই বরং শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর জ্ঞানবান তাহা বারম্বার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব বিনা বাধকে চিরপ্রসিদ্ধ বচন সমূহের প্রতি উপেক্ষা করা যায় কিরূপে?

এই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রভাবেই সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিলোড়িত হইয়া গুণের বৈষম্য হওয়ায় নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টির উদয় হয়। তদ্বিষয়ে

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিশ্যাত্মে চ্ছয়াহরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥" (৩)

ঈশ্বর অবিদ্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও একেবারে নিরুপাধিক নহেন, তাঁহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ নিয়ত বিদ্যমান থাকায় ঐ প্রকৃষ্ট সত্ত্বই তাঁহার উপাধি। ভাষ্যকার বলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সাদৃশ্য বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যও আর কাহাতে বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর একটি মাত্র দুইটি নয়। দুইজন ঈশ্বর হইলে দুইজনের ইচ্ছা সমানভাবে অপ্রতিহত; এমন স্থলে একজন ইচ্ছা করিলেন জগতের সৃষ্টি কার্য্যের আরম্ভ হোক, অমনি সৃষ্টির

---

(১) যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্যনির্গুণ, জীবাত্মা বা পুরুষই বদ্ধ এবং মোক্ষযুক্ত।

(২) পরমাত্মা নির্গুণ এবং জীবাত্মা অভিমানী অর্থাৎ সগুণ।

(৩) সত্ত্ব রজঃ এবং এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুসারে সৃষ্টির আদিতে ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া বৈষম্য উৎপাদন করেন।

আরম্ভ হইল, তাহার পরই আর একজন বলিলেন, না সৃষ্টি হইয়া কায নাই, অমনিই সৃষ্টি বন্ধ হইতে লাগিল। এক্ষণে বিবেচনা করে দেখ দুই জন ঈশ্বর হইলে জগতের প্রত্যেক কার্য্যে কিরূপ বিসংষ্টুল হইত। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া, বোধ হয় অন্যায় নয়। আমাদের গ্রামে কাশীনাথ এবং শম্ভুনাথ নামে দুই জন সহোদর বাস করিত। দুই জন পীঠেপীঠী উভয়ের বয়সের অধিক ন্যূনাধিক্য ছিল না, কাযেই কাহার উপর কাহার বড় একটা প্রভুতা ছিল না, সংসারে দুই জনই সমান প্রবল। কিন্তু দুই জনই বদ্ধ পাগল। ইহাদের মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াকর্ম্ম—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করানও ছিল। কিন্তু সংসারে উভয়ের সমান পাগলামি থাকায় মধ্যে মধ্যে ঐ সকল কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইত। কোন দিন প্রাতঃকালে একজন গ্রামস্থ সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে একটা কর্ম্মের উপলক্ষ্য করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আর একজন বাহির হইয়া প্রতি বাড়ী বাড়ী বলিয়া আসিলেন 'আমার ভ্রাতা উন্মত্ত, উহার কথা আপনারা শুনিবেন না, অদ্য আমাদের গৃহে কোন কর্ম্মই নাই।' সে দিবস বাস্তবিক হয় ত একটা কার্য্য ছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনেরও প্রচুর আয়োজনও ছিল কিন্তু নিমন্ত্রণ রদ করায় কোন ভদ্রলোকেই যাইতে সাহসী হইলেন না, সমুদয় আয়োজন বিনষ্ট হইল, রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য পচিয়া গেল। আবার কোন দিন হয় ত বাড়ীতে কিছুই আয়োজন নাই, গ্রামস্থ লোক মধ্যাহ্নকালে অনাহারে আসিয়া উপস্থিত। দালানে দেব প্রতিমা প্রস্তুত, জ্যেষ্ঠ—পুরোহিত স্থির করিয়া আসিলেন। কনিষ্ঠ তাহার পরই পুরোহিতের বাটীতে গিয়া বলিল "মহাশয় দাদা পাগল জানেনত, কোথায় বা পূজা কোথায় বা কি সকলই মিথ্যা"। কাযেই পুরোহিত আর যাইতে সাহস করিলেন; মাটীর ঠাকুর অমনি অমনিই মাটী হইলেন। জগতে যদি সমান ক্ষমতাশালী এবং অপ্রতিহত শক্তি দুইটি ঈশ্বর হইতেন, তাহলে জগতের কার্য্য সকল ঠিক ঐরূপ হইত তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং কি মুক্ত কি অমুক্ত যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনেক অধিক; তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই।

ভক্তি সাধন।

যে ভগবানের পদপ্রান্ত হইতে ভক্তি-রূপিণী অমৃত নিঃস্বন্দিনী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হইয়া পাপরূপ সূর্য্য-ময়ূখ-প্রোত্তপ্ত অবিশ্বাস-বালুকাপূর্ণ নাস্তিক-হৃদয়কেও সুশীতল করিয়া অনন্তকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই চিরন্তন নির্ব্বিকল্প পুরুষ নিজ মুখেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীয় প্রাণোপম প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

> তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥
> যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তোতমোমত॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬অঃ ৪৬।৪৭।

উদ্ধৃত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে তপোনিষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কর্ম্মনিষ্ঠ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্লোকটি বলিয়া ভগবানের তৃপ্তি জন্মিল না, অপিচ কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল। যোগ সাধক-ভেদে ১৮।১৯ প্রকার; তবে প্রিয় শিষ্য কোন যোগ অভ্যাস করিবেন এই সন্দেহেই পরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য অর্থ এই যে "যোগীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্তরাত্মা আমাতেই সমর্পণ করিয়া ভজনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এই দুই শ্লোক দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্পষ্টত বুঝাইয়া ছিলেন। ইহার কারণ এই যে ভক্তিযোগ * সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। ভক্তি

---

* যদিও ভগবান ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্পষ্টত স্বীকার করিলেন, তথাপি পতঞ্জলি মুনি অনুশাসিত যোগের নিন্দা করা হইল না। ভক্তিযোগ কিছু সরল, কিন্তু "চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" যোগ বহুকাল ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ। তাহার কারণ এই যে, পতঞ্জলি প্রথমত যোগকে ৮ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। তাহার পর যম আবার দশ প্রকার, নিয়ম দশ প্রকার, আসন আট প্রকার, প্রাণায়াম তিন প্রকার, প্রত্যাহার পাঁচ প্রকার, ধারণা পাঁচ প্রকার, ধ্যান ছয় প্রকার, এবং সমাধি এক প্রকার, এবং কাহার কাহার মতে নানা প্রকার। একবার ভাবিয়া দেখুন এক যম অভ্যাস করিতে কত কাল লাগে, তার পর নিয়ম ইত্যাদি। যোগের ফল প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু সাধক এক জন্মে ফল পায় কি না সন্দেহ।

সাধনেচ্ছু ব্যক্তির ধন, মান, কুল, শীল, কিছুরই অপেক্ষা করে না—কেবল আবশ্যক একমাত্র সরল বিশ্বাস। * শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল "বিশ্বাসঃ ধর্ম্ম মূলং হি।" কি বাহ্য জগতে কি অন্তর্জগতে, উভয় জগতের কার্য্যের জন্যই বিশ্বাসের আবশ্যক। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিশ্বাস না হইলে লৌকিক জগতের কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে চলিত না। পিতা পুত্রে সদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা, বন্ধু বন্ধুতে প্রণয়, এক এই বিশ্বাস না থাকিলে,—জগতে কিছুই দেখা যাইত না। এই বিশ্বাসই ভালবাসার মূল। ভালবাসার অন্যতর নাম অনুরাগ। ঈশ্বরের প্রতি এই অনুরাগকেই শাস্ত্রকারগণ ভক্তি নামে অভিভূত করিয়াছেন যথা "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। শাণ্ডিল্য সূঃ ১ম অঃ ২ সূত্র।

এ পর্য্যন্ত কেবল ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল, এবং ভক্তি কাহাকে বলে তাহাই বলা হইল। এখন কি উপায়ে ভক্তি সাধন করিতে হয় তাহাই বলিতে হইবে। যদিও বস্তুতপক্ষে বলিতে গেলে ভক্তি সাধারণের সাধনের বস্তু নহে অর্থাৎ যে সে ব্যক্তিই সাধন করিতে আরম্ভ করিলে যে সফল-মনোরথ হইবেন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে ভক্তি সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অনুকূল তাহাই মাত্র আমরা বলিব। আর এক কথা—যে ভক্তি জ্ঞানের অভ্যুদয় সাপেক্ষা, তাহার কথা আমরা বলিব না, কারণ সে প্রকার ভক্তি সাধন বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোলযোগও আছে। এখন স্বয়ং ভগবান ও বহুদর্শী আচার্য্যগণ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান অনুশাসন করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব।

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততঃ মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমোভব।
মদর্থান্যপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যথাত্মবান্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২ অঃ ৮।৯।১০।১১ শ্লোক॥

* এই স্থলের সহিত পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখ্যার ৬৪৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের মন্তব্য মিলাইয়া দেখিবেন। [নবজীবন সম্পাদক।]

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে—(হে অর্জ্জুন) তুমি আমাতে মন অবধান কর এবং ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধিকেও আমাতে স্থির কর, তাহা হইলেই তুমি দেহান্তে আমাতে বাস করিতে পারিবে এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

যদি এইরূপ আমাতে চিত্তসমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে ইতস্তত বিক্ষিপ্তচিত্তকে * পুনঃ পুনঃ মৎস্মরণ রূপ কার্য্য দ্বারা সংযত করিতে অভ্যাস কর।

আর যদি অভ্যাস দ্বারা এরূপ করিতেও অক্ষম হও—তাহা হইলে আমার প্রীত্যর্থে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান কর, † এবং এইরূপ কার্য্য করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ করিবে। আর যদি এরূপ করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে ভগবান বলিতেছেন সমস্ত মুখ্য ও নিত্য কর্ম্মাদি আচরণ করিবে; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন সমস্ত কর্ম্ম করিবে ফলপ্রত্যাশা একবারে বর্জ্জন করিয়া।

স্বয়ং ভগবান ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। এখন ভক্তিপথের পথিক ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই এক্ষণে উদ্ধৃত করিতে হইবে।

"ভক্তিসাধন—বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গ ত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।"

"সর্ব্বদা ভগবদ্ভজন দ্বারা।—"

"লেকের নিকট ভগবদ্গুণের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা।"

"ভগবানের কৃপাদৃষ্টি, ও মহাত্মাগণের অনুগ্রহই ভক্তি সাধন সম্বন্ধে মুখ্য অনুকুল।" ‡

---

* পাতঞ্জল দর্শন মতে চিত্তের পাঁচটী অবস্থা যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যখন চিত্ত ক্ষণেক এক বস্তুতে, পরক্ষণেই অন্য বস্তুতে নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ যখন এক বস্তুতে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, সেই অবস্থাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে।

† উক্ত দর্শন প্রণেতা ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে এই ভাবে বলিয়াছেন "তপঃস্বধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ।"—তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু ভগবান এ স্থলে (ভক্তি-যোগ সাধকের প্রতি) কিছু বিস্তৃত ভাবে আদেশ করিয়াছেন যথা—হরিনাম সংকীর্ত্তন, পূজা, যাগ, যজ্ঞ, একাদশীর উপবাস, হরি কথা শ্রবণ, ব্রাহ্মণাদির সেবা শুশ্রূষা আদি;

‡ "ওঁ তত্তু বিষয় ত্যাগাৎ সঙ্গ ত্যাগাৎ চ।"
"ওঁ অব্যাকৃত ভজনাৎ।"
"ওঁ লোকেঽপি ভগবদ্গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাৎ।"
ওঁ মুখ্যস্তু মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাৎ বা।"

নারদ সূত্র ৫ অনুঃ ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ সূত্র।

বিষয় ত্যাগ দ্বারা ভক্তিসাধন অতি দুরূহ কার্য্য সন্দেহ নাই। সংসারে থাকিয়া বিষয় ত্যাগ করা সামান্য লোকের সাধ্য নহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটি, এবং তাহার বিষয়ও পাঁচটি যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই পাঁচটি লইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। ইহাদের মোহিনী শক্তি অতি আশ্চর্য্য, যে কোনটিতেই লোককে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে পারে। মনে করুন অনতিদূরে বীণার মধুর নিক্কন শুনিতে পাইলাম। কর্ণের ধর্ম্মই এই যে, তাহা প্রতিধ্বনিত করিবে এবং মন তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক রসাস্বাদ করিবে। নারদ ঋষির মতে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধারণ ধর্ম্মের বিলোপ করিতে পারিলে ভক্তিসাধন হইয়াছে ও হইতেছে জানা যাইবে। একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় সহজেই ইহা বুঝা যাইবে। ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মন মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-প্রসূত বিষয়জ্ঞান আমাদিগের কখনই জন্মিতে পারে না। সুতরাং মন যদি ভগবৎপ্রেম রস পানে মত্ত থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদনে আর তাহার কোথায় অবসর রহিল?

সঙ্গ ত্যাগের গুণ অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গ ত্যাগের অর্থ এখানে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—সৎসঙ্গ ত্যাগ নহে, কারণ, ইহার পরেই নারদ ঋষি বলিতেছেন "মহৎ সঙ্গ দুর্ল্লভোঽগম্যো চ হমোঘশ্চ" অর্থাৎ মহৎ সঙ্গদুর্ল্লভ, অগম্য, এবং ভক্তিসাধন বিষয়ে অমোঘ।

ভগবদ্ভজন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এবং শ্রবণ দ্বারা অনুরাগ * বৃদ্ধি হয় ও মনোমালিন্য দূর হয়, এবং অনুরাগ জন্মিলেই কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবই ভক্তির অঙ্কুর। এ পর্য্যন্ত সাধারণত ভক্তি নামেই যাহা কিছু বলা হইল। এক্ষণে ভক্তির বিভাগ করিয়া বিস্তৃতরূপে কিছু বলিতে হইবে। ভক্তিসাধক ভেদে দুই প্রকার—পরা ভক্তি ও গৌণী ভক্তি। গৌণী ভক্তিই সাধকের সাধনানুকূল, এবং এই ভক্তিই পরাভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। শাণ্ডিল্য ঋষির মতে এই গৌণীভক্তি দ্বারাই চিত্তের পবিত্রতা জন্মে যথা "তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ" (শাঃ সূঃ ৫৯)। এই

---

* "রাগার্থ প্রকীর্ত্তি সাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্" (শাঃ সূঃ ৫৩)—নমস্কার, নাম কীর্ত্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ। তীর্থপর্য্যটন, ভগবদ্ মূর্ত্তির পূজা, নাম কীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ইত্যাদি কার্য্য কেবল অনুরাগ বশত এবং অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত।

শাণ্ডিল্য ঋষিই আবার গৌণী ভক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

ভগবদ্গীতায় ভক্তিকে সাধরণত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া কাতর করুণ-কণ্ঠে, এক মন প্রাণ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মধুসূদনের নাম লইয়া থাকে তাহাকে আর্ত্ত ভক্ত কহে। যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য ঈশ্বরে, শাস্ত্রে, গুরুবাক্যে, এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাকে অর্থার্থী ভক্ত বলা যায়। এবং জ্ঞানবান্ ভক্তকে জ্ঞানী ভক্তি বলা যায়। প্রথম তিন প্রকার লক্ষণোপেত ভক্তের ভক্তিকে গৌণীভক্তি কহে, জ্ঞানীর ভক্তি নিষ্কাম, সুতরাং গৌণীভক্তির মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এখন এইরূপ একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে "আজ কাল তৃতীয় প্রকার ভক্তের সংখ্যার ন্যূনতা নাই, কিন্তু তাহাদিগের কামনা সিদ্ধি হয় না? চিত্তের উৎকর্ষতাও তো কিছু বুঝিতে পারা যায় না, ইহার কারণ কি?" আমাদিগের বোধ হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিবার জন্য যে একটু চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতার আবশ্যক, তাহা তাহাদের আদৌ হয় না; সুতরাং বাঞ্ছিত ফল লাভের বা চিত্তের উন্নতি সাধনের আশা কোথা হইতে সম্ভবে? শুদ্ধ শুষ্ক সংস্কৃত ঈশ্বর স্তোত্র পড়িয়া শেষে "দাও ভক্তি, দাও প্রেম" বলিলে ঈশ্বর ভক্তি বা প্রেম দেন না—ভক্তি কি প্রেমের প্রার্থী হইলে, সেই প্রকারের আয়োজনের আবশ্যক, এবং তাহার অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় দলবলের সহিত একাসনস্থ থাকিয়া, গদগদ-স্বরে (বিকৃত কণ্ঠে) ঈশ্বরের আরাধনা ছলে যে কতকগুলি স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, তাহাতে চিত্তের সরলতা ও নির্ম্মলতা হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা তাহাতে দিন দিন কপটাচারী হইতে থাকে। ভক্তের চিত্তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে সকল বাহিক ভাব (অঙ্গ বিকৃতি, রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত, স্বরভঙ্গ, সময়ে সময়ে বেপথু) দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যত্ন কৃত বা লোক দেখাইবার জন্য নহে, তাহা স্বাভাবিক এবং অন্তরের অবস্থার বাহ্য স্ফূরণ মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় উক্ত লক্ষণ গুলি অভ্যাস করিয়া ভক্তির ভাণ করেন মাত্র। ভক্তের অঙ্গে প্রাগুক্ত ভাবগুলি শোভা পায় কিন্তু যত্ন কৃত ভাবগুলি শোভা পাওয়া দূরে থাকুক বরং বিষবৎ বলিয়া বোধ হয়।

এইবার আমাদিগের পূজাদি বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?—উপাস্য দেবতার প্রীতি সাধন। কি হইলে তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন হয়?—হৃদয়ের ভক্তি। এক্ষণে বিরোধী নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় প্রশ্ন করিতে পারেন "তবে যে হিন্দুদিগের দেব দেবীর পূজায় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল ইত্যাদি আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রয়োজন কি?" আমরা বলিতেছি,—আছে বৈ কি? যদি বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আছে বৈ কি? যদি বিষ্ঠা ও চন্দনে মনুষ্য হৃদয়ে দুই সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবের উদ্রেক করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে আছে বৈ কি? একবার পূতি গন্ধময় স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখুন, এবং তৎ পরক্ষণেই বেলা যুঁই, মালতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি প্রস্ফুটিত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া দেখুন—যদি হৃদয়ে কিছু বিষম ভাবের উদয় অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন—পুষ্প, ধূপ, দীপাদির প্রয়োজন সহজ বোধ্য। ভক্ত! তুমিই জান পূজার সময় তোমার অন্তরের ভাব কিরূপ হয়। বাজনার তালে তালে কি তোমার হৃদয়ও নাচিতে থাকে না? পুষ্প চন্দন এবং ধূপাদির গন্ধে কিন্তু তোমার প্রাণ প্রফুল্ল হয় না? কি এক নির্ম্মল, অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে প্রাণ মন বিভোর হয় না?

যে ব্যক্তি ভক্তি কি তাহা জানে না, অথবা কখন ঈশ্বরে ভক্তি করে নাই, সে কি সহসা বিক্রম করিয়া বলিতে পারে আমি অদ্য হইতে ভক্ত হইলাম—আর ইহাই কি কখন সম্ভব পর? ভক্তি বিক্রমের বস্তু নহে—ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ—এবং তাঁহার আদেশ বিহিত কর্ম্ম-কাণ্ড-সাপেক্ষ। কিন্তু এ সমস্তই গৌণী ভক্তি। পূজাদি দ্বারা যে ভক্তির অভ্যুদয় কামনা করা যায়, তাহা কেবল গৌণী ভক্তি। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে, পরা ভক্তি লাভ হয় না। আজন্ম যাহারা ভক্ত, তাহারাই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত—এবং তাহাদের ভক্তিই পরা ভক্তি। শুন শুন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত-দিগকে কি অভয় দিতেছেন—

"সর্ব্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
ন মে ভক্ত প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদাঃ॥"

দেবার্চ্চনা ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তির একটি সুগম পন্থা—হরিনাম সংকীর্ত্তন অপর একটি; তীর্থ পর্য্যটন আর একটি; ব্রাহ্মণাদির সেবা-শুশ্রূষা অপর একটি; ইত্যাদি। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা জন্মে—

ইহাই ভক্তির অঙ্কুর মাত্র। ইহার পর যত রস ঢালিবে ততই সতেজ হইয়া বৃদ্ধি পাইবে। পরে যদি তাঁহাকে প্রীতি করিতে করিতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভক্তির চরম পুষ্টিসাধন হইল—এবং সেই ভক্তি হইতেই অন্তে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এই ভক্তি সরল বিশ্বাসীর সুখসাধ্য—তার্কিকের নহে। ভাই ভক্ত! প্রাণান্তেও যেন তর্ক করিও না—তর্ক তোমার জন্য নহে, জ্ঞানীর জন্য, তুমি যেন এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও—

"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

কুমারীর শিব-পূজা।

অজ্ঞানে পিতামাতার স্নেহে শৈশবকাল অতিবাহিত হইল, ধূলা খেলায় বাল্যকালও দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল; এই বার কৈশোরে সংসার-শিক্ষার সময় আসিল। রমণী-হৃদয়ই প্রেম-পযোধি, অনন্ত বিশ্ব-প্রেম শিখাইবার সামগ্রী; সুতরাং প্রথমে প্রেমই বালিকা-হৃদয়ের শিক্ষার পদার্থ। ধূলি কর্দ্দম লইয়া বালিকা রন্ধন করিল, পাঁচ জন সম বয়স্ক বালক বালিকাকে তাহা ভোজন করিতে দিল, বালিকার হৃদয় আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রেম জনিত আনন্দ অনুভব করিয়া পরম সুখী হইল। গ্রাম্য উৎসব দেখিতে গিয়া বালিকা দুই চারিটী পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া আনিল, তাহাদিগকে পান ভোজন করিতে দিল, ছিন্ন বস্ত্রে সজ্জিত করিল এবং তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আর পাঁচটি বালক বালিকার সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া প্রেমের সংসার রচনা করিল। এইরূপে বাল্যকাল কাটিল বটে; কিন্তু বালিকার বাল্যকালের সংসার-বন্ধন স্থায়ী হইল না; প্রত্যহ প্রেম পরিবার গঠন করে, আবার প্রত্যহ তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং সে এখন এমন একটি সংসারের সহিত হৃদয়কে বাঁধিতে চায়, যাহার সহিত ইহ জগতে

বিচ্ছিন্ন হইতে না হয় এবং ঘটনা-বিড়ম্বনায় নৈসর্গিক নিয়মে ইহ জগতের সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেও পরকালে বা জন্মজন্মান্তরে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। যখন এই চেষ্টায় বালিকা-হৃদয় ব্যাকুল হইল, তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর উপস্থিত হইল এবং তৎসহ হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইল। হৃদয় এত দিন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া—বিস্তৃত ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে ফিরিতে আরম্ভ করিল। বালিকার শিক্ষার উপযোগী বিস্তর সহজ সহজ ব্রত নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী বালিকার চক্ষে পড়িল। কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনে শিক্ষা হয় না, তাহার সহিত কর্ম্মের আবশ্যক; এই জন্য গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন সহজ জ্ঞান, কর্ম্মও তেমনি সামান্য; কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা অন্যত্র বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও আছে কি না সন্দেহ। অতি সহজ উপায়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া জগতের ভিত্তিরূপিণী বালিকাদিগের শিক্ষা ও হৃদয় গঠনের সামগ্রী হইয়াছে।

মানুষের পশুভাব এতই প্রবল, মানুষ এমনই স্বার্থপর যে, স্বার্থের ভিতর দিয়া ব্যতিরেকে পরার্থপরতা শিক্ষা হয় না। সুতরাং বালিকার সংসার-শিক্ষাও প্রথমে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হয় এবং ক্রমে অলক্ষিত ভাবে আপনাকে অতিক্রম করিয়া সংসারময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে কোন ব্রত বা পূজাই হউক না, তাহার ফল সংসার ব্যাপী; জগৎ সংসারের জন্য যাহা করিবে, তাহাই স্থায়ী ও কার্য্যকর হইবে; কেবল আপনি ফলভাগী হইব, এই আশায় কর্ম্ম করিলে, তাহা বিড়ম্বনা হইয়া উঠিবে। এই জন্য গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণ করিবার শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। বালিকা শিব-পূজা করে, মনোমত পতি পাইবার জন্য; কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তে সমস্ত জগৎ সংসারের উপর। বিবাহে কেবল যে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, এমন নহে, বালিকা যাহাকে বিবাহ করে তাহাকে, তাহার আত্মীয় স্বজনকে এবং অবশেষে সমগ্র সমাজকে জগৎ প্রণয়ে অনুপ্রাণিত করে।

মনোমত পতি পাইবার জন্য শিবপূজার বিধি কেন? "কন্যা বরয়তি রূপং"—মহাদেবের রূপের সীমা কি! মস্তকে জটাজূট, বিষপানে ঢুলু ঢুলু চক্ষু, অঙ্গে চিতাভস্ম, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কর্ণে ধুতুরা, গলে হাড়মালা, সর্ব্বাঙ্গে ফণিফণা। যাহা যাহা বিকট, যাহা যাহা উৎকট মহাদেবে

তৎসমস্তই আছে; তথাপি তিনি মনোমত পতির আদর্শ। পরমা সুন্দরী গিরিসুতা পার্ব্বতী আর পাত্র পাইলেন না; তাই উমেদারী করিয়া মহাদেবকে তপে তুষ্ট করিয়া তাঁহার গলায় বরমাল্য দিলেন! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু রমণী বাহ্যিক চাকচক্যে বিমোহিত না হইয়া, গুণের দাসী হইতে শিক্ষা করিবেন, সুতরাং বালিকার চক্ষে সুরূপের প্রয়োজন নাই। অনন্ত প্রেম শিক্ষাই বালিকার উদ্দেশ্য; সেই জন্য দিগম্বর তাহার আদর্শ পতি। অতি কুরূপও তাহার হৃদয়ের আদরের সামগ্রী হইতেছে। যে অলঙ্কার ও ধনের জন্য স্ত্রীজাতি একেবারে উন্মত্তপ্রায়, এমন কি মাতা সর্ব্বদা যাহাতে জামাতাকে অধিকারী দেখিতে চাহেন, মহাদেবে তাহার বিন্দুমাত্র না থাকিলেও তিনি আদর্শ জামাতা।

"মাতা বিত্তং"—মাতা চাহেন কন্যার স্বামী ধনশালী হইবে; কিন্তু মহাদেবের এক কড়া কাণা কড়িরও সম্বল নাই। যাহার একখানা লজ্জা-নিবারণ জন্য বস্ত্র যুটে না, যে পেটের দায়ে ভাং ধুতুরা খায়, গৃহাভাবে শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করে, বাহন অভাবে দাগা ষাড় চড়িয়া বেড়ায়, অলঙ্কারাভাবে হাড়ের মালা গলায় পরে, সে যদি ধনবান তবে আর নির্ধন কে? তথাপি তিনি আদর্শ জামাতা। কেন না তিনি প্রেমিক; প্রেমের নিকট পার্থিব ধন যে অতি অপদার্থ, মহাদেবকে আদর্শ পতি করিয়া বালিকা তাহাই শিক্ষা করে। "পিতা শ্রুতম্"—পিতার ইচ্ছা পণ্ডিত জামাতা; কিন্তু মহাদেবে পাণ্ডিত্যের কিছুই লক্ষিত হয় না। যে জীবন-নাশক হলাহল পান করে সে যদি বিজ্ঞ, তবে অজ্ঞ কে? যাহার কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাই, যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানবিবর্জ্জিত, সে যদি শাস্ত্রপারগ, তবে নিরক্ষর কে? তথাপি মহাদেব আদর্শ পতি। ইহার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রেমের নিকট কি রূপ, কি ধন, কি বিদ্যা কিছুরই আদর নাই। যদি বিশ্বপ্রেম, রূপ বা ধন বা বিদ্যা সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে অনন্ত প্রেমের পথে বাধা পড়িত; কারণ সকলেই যে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অবশেষে বিশ্বপ্রেম কুল, জাতি কিছুই অপেক্ষা করে না' সুতরাং যে সকল "বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি" তাঁহারাও মহাদেবকে পতির আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাদেব স্বয়ম্ভূ; সুতরাং তাঁহার পিতামাতা, জাতি কুল কিছুই নাই। বিশ্বপ্রেম এ সকল কিছুরই অপেক্ষা করে না—যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই প্রেমপ্লাবনে প্লাবিত করিয়া ধাবিত হয়। এই সকল কারণে মহাদেবই প্রকৃত আদর্শ

পতি। বালিকা-হৃদয়ে একবার এই আদর্শপতির মূর্ত্তি অঙ্কিত হইলে, তাহা আর এ জন্মে মিশায় না—বিশ্ব-সংসারের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে। শুভ বিবাহে কন্যা ও তাহার পিতা এবং বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অপর লোকে মিষ্টান্নের আশা করিয়া থাকেন। মহাদেবের বিবাহে তাহা মিলিবার সম্ভাবনা নাই বটে; কিন্তু যে বিবাহের বীজমন্ত্র বিশ্বপ্রেম, তাহাতে আপামর সাধারণ প্রেমে বদ্ধ হইলে, অপর মিষ্টান্নে প্রয়োজন কি? যে বিবাহে জগৎ সংসার এক অনন্ত প্রেম প্রবাহে পরিপ্লুত হয়, তাহতে মিষ্টান্নের অভাব নাই। সুতরাং যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এ বিবাহে তাহারা যেমন লাভের ভাগী, অপরেও তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই সকল কারণে কুমারীগণ সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার সময় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার তুল্য পতির কামনা করিয়া থাকে। এ ব্রত রমণী জীবনের মহাব্রত এবং অতি কোমল সময়ে কুমারীগণ এ ব্রতে দীক্ষিত হয় বলিয়া, আজীবন ইহার সাধনা করিয়া হিন্দু পরিবারকে অমরাবতী করিয়া তুলে। ইহাতে ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সুখের সম্ভাবনা এবং নিতান্ত সংস্রব-বিহীন লোকেও ইহার সুফল ভাগী হইয়া থাকে। অতএব হিন্দু গৃহে যত কুমারী আছে, সকলেই যেন এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা ও হিন্দু রমণী কুলের গৌরব বৃদ্ধি করে!

সেই বৃন্দাবন।

(যমুনাতট—সময় সন্ধ্যা।

চেতন যমুনা-কুলে,
চেতন তমাল-মূলে,
দাঁড়ায়ে কালিয়ে নট পীতবাস পরা।
চূড়ায় কুসুম দাম,
লেখা তাহে রাধা নাম,
গলে দোলে চাঁদ মালা সদা সুধা ভরা।

সেই সুধা লভিবারে
ফেরে অলি চারিধারে,
সেও গুন্ গুন্ স্বরে রাধা নাম গায়।
অলকা তিলকা গায়,
রতন নুপুর পায়,
কোটী রবি শশী তাহে লুটোপুটি খায়।
ললাটে চন্দন-চাঁদ,
রমণী-মোহন-ফাঁদ ;
ফুলধনু লয়ে তথা বসে আছে কাম ;
ব্রজ-কুল-বালা কুল
শ্যামে সঁপে দেয় কুল,
হেরে সেই সুকুমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
শ্যামের বাঁশরী বোলে
ব্রজবালা হিয়া দোলে,
ঢেলে দেয় শ্যাম পদে যৌবন নিছনী ;
যবে সে বাঁশরী ভাষে,
নয়ন ঢুলিয়া আসে,
অবশ অলস অঙ্গ সুথির চাহনী !
থির বিজুরির মালা—
করে থাকে যেন আলা,
প্রেমিকা-ব্রজের বালা যমুনার তীরে।
মন্ত্র মুগ্ধ ফণি প্রায়
আপনায় পাশরায়,
হৃদয় ভাসিয়ে যায় নয়নের নীরে।
যবে ঘোর ভেঙে যায়,
পড়িয়ে শ্যামের পায়,
কেঁদে কেঁদে কহে সবে আকুল পরাণে,—
"শুন শ্যাম গুণধাম !
তুমি শান্তি, তুমি কাম,
জপি মোরা তব নাম ধেয়ানে গেয়ানে।

তুমি কৃপা, তুমি ভক্তি,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শক্তি,
প্রেমিকের তুমি প্রেম, তুমি সে বিরহ।
তুমি মান, অভিমান,
তুমি দান, প্রতিদান,
তাই ব্রজবালা তোমা ভাবে অহরহ।
অভাগিনী মোরা নারী,
তুমি নয়নের বারি,
হৃদয়ে বসতি কর হৃদয়ের ধন।
বড় ব্যথা হ'লে পরে,
দেখি তোমা প্রাণভরে,
ধরিয়ে হৃদয়ে রাখি করি আলিঙ্গন।
তুমি দীপ্তি, তুমি রূপ—
তুমি রস, রস কূপ—
নীরস রসিক হয় লভিলে তোমায়।
তুমি ধারা যমুনার,
বাঁশরী মাধুরী ধার,
তুমি হে অমৃত-সিন্ধু এ মরু ধরায়।
তুলি মলয়ের বায়,
মধুমাস এ ধরায়,
তুমি তমালের শাখে কোকিল কূজন।
মরতের স্বর্গ ভূমি,
বিকচ নলিন তুমি,
তুমি মধু, তুমি অলি, তুমি হে গুঞ্জন।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা,
সকলি তোমার ধারা,
সৃজেছ ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোমার কণায়।
তুমি রাধা, তুমি শ্যাম,
শুধু ভিন্ন ভিন্ন নাম,
একরূপে দুইরূপ অভেদ আত্মায়।

গোপ নারী মোরা নাথ!
প্রেম আশ তব সাথ,
এত কি পুণ্যের বল অবলা বালার।
তব অংশ বলে ভাই!
যদি কিছু জানে রাই;
তুমি প্রেমচাঁদ, সে যে জ্যোৎস্না তোমার।
নাহি তব আত্ম পর,
তাই ওহে নটবর!
ভরসায় ভাসে প্রাণ পদ লভিবারে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ!
রাখ রাখ মান রাখ!
অকুলে এসেছি বলে সবে তিরস্কারে।"

দেবশর্ম্মা।

নারীজীবন।

"বিদ্যাবতী ধর্ম্ম পরা কুলস্ত্রী লোকে নরাণাং রমণীয় রত্নং
তৎশোভতে যস্য গৃহে সদৈব ধর্ম্মার্থ কামং লভতে স ধন্যঃ।

বিদ্যাবতী ও ধর্ম্ম-পরা কুলনারী এক মনোহর রত্ন; এই রত্ন যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা শোভা পায়, তিনি ধন্য ও তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ কাম লাভ হয়। এক্ষণে যদিও তাদৃশী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব্বকালে এইরূপ নারীরত্ন দুর্লভ ছিল না। পূর্ব্বকালে যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠা নারী ছিলেন, তাঁহাদের নাম লইলে স্বর্গের দেবী বলিয়াই পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা বাস্তবিকই এক একটি রত্ন। আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাচীন মহিলাগণ অতি উচ্চধর্ম্মময়

নারীজীবন গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অদ্যাপি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। অরুন্ধতী, অদিতি প্রভৃতি নারীগণ পতিসহ যোগাচারে রত থাকিতেন। স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞব্রত বা ধর্ম্মাচরণ নাই। স্ত্রীধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে পতিরই সহচারিণী ও অনন্ত জীবনের সঙ্গিনী। ইহাতেই তিনি নরলোকে ধন্যা ও সুরলোকে প্রশংসিতা হন। গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যই ধর্ম্মচর্য্যা। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করে না। বাস্তবিক হিন্দুদিগের এ নিয়মটী অতি উৎকৃষ্ট। ধর্ম্ম নর নারী উভয়েরই অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মনুষ্য হইলেই জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ধর্ম্মের জন্যই আবশ্যকীয়। ধর্ম্ম বিনা জীবন নিরর্থ, ধর্ম্মহীন জীবনের কোন অর্থই নাই। মানবজীবনে যদি ধর্ম্মের চর্চ্চা বা সাধন ভজন না থাকে, তবে ইহার যে কি প্রয়োজন তাহা আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং
ধর্ম্মোহি তেষা মধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

মনুষ্যেরা যেমন আহারাদি করিয়া থাকে, পশুরাও সেইরূপ করে; কিন্তু পশুতে এবং মানুষেতে বিশেষ এই যে, মানুষের ধর্ম্মবোধ আছে, পশুর তাহা নাই। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ পশুর সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবলা নারীগণ অধুনা প্রায়ই সদাচার ও ধর্ম্মবর্জ্জিত। যাহাদের জীবনে ধর্ম্মের জ্যোৎস্না পতিত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, কিছুমাত্র জানে না, তাহাদের জীবন ঘোর অন্ধকারময় নরক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পুরুষই স্ত্রীলোকের জ্ঞানধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, পুরুষের দোষেই নারী জাতির এত হীনতা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা ছলমাত্র। স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন, সকলেরই উন্নতির জন্য নিজের যত্ন করা কর্ত্তব্য। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু।

আবার অনেকের ধারণা এই যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিবার শক্তিই নাই,—এটিও নিতান্ত ভ্রমাত্মক কথা। কেননা, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন কেন? আত্রেয়ী, গার্গী, গৌতমী, অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সকল মহিলার নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মে পুরুষের ন্যায় উন্নতা ছিলেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মন অধিক কোমল, অতএব ধর্ম্মসাধনে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শক্তি অধিক বলিতে হইবে। তবে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্ত্রী-পুরুষের যদি বিদ্যা এবং ধর্ম্মে সমান অধিকার হয়, তবে পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যাবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর সংখ্যা এত অল্প কেন? উত্তর এই যে, স্ত্রীলোকদিগের নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহ নাই। তাই তাহাদের এত দুর্দ্দশা। স্ত্রীলোকেরা নিজের দোষেই নিজে জ্ঞান ধর্ম্ম শূন্য হইয়া আছেন। "উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" সিংহ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, সেইরূপ উদ্যোগ বিনা লোকের মনোরথ সিদ্ধ হয় না। স্ত্রীলোকের নিজের উদ্যোগ নাই বলিয়াই তাঁহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের এরূপ হীন অবস্থা লক্ষিত হয়। অবশ্য পুরুষের সাহায্য ব্যতীত রমণীর পক্ষে বিদ্যালাভ দুষ্কর বটে, কিন্তু ধর্ম্মসাধন সেরূপ দুষ্কর নহে। আর বিদ্যালাভেই বা পুরুষকে অন্তরায় বলিব কেন? রমণী বিদ্যার জন্য প্রকৃত ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন, অথচ পুরুষ তাহার সাহায্য করিতেছেন না, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল, অন্তত আমি এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দেখি নাই। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ তাঁহাদের রমণীদিগকে দেবী মনে করিতেন। তাঁহাদের আচরণও ঠিক দেবীর মতই ছিল। সেই প্রাচীনতার সহিত আধুনিক ভাবের অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালের রমণীগণ গুরুজনদিগের সেবাশুশ্রূষাকে পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। আধুনিক নব্যগণ গুরুজন দিগের সেবা না করিয়া সেবা পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সেবা করাতেই অধিক সুখ। শরীর দ্বারা এবং আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই জীবের জীবন সার্থক হয়। মহিলাগণ যদি উৎসাহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে সদাচার ও ধর্ম্মাচারে রত থাকেন, তাহা হইলে আর সুখসৌভাগ্যের সীমা থাকে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষ যদি এক হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হয়। ধর্ম্মময় জীবন বড়ই সুন্দর, ইহা সুগন্ধি ফুলের মত লোকের মনে আনন্দ দেয়। কর্ত্তব্যকার্য্যে অটল ও সর্ব্ব জীবে দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলেই জীব ধর্ম্মময় ও সুন্দর হয়। বিশেষত নারীজীবন ধর্ম্মময় হইলে আরো সুন্দর দেখায়।

অনেকে সাংসারিক জীবনকে বিরক্তিকর বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্মভাবে চালিত হইয়া চলিতে পারিলে ইহাতেই পরম সুখ। যাঁহাদের ধর্ম্ম আছে, জীবনে সাধন ভজন আছে, তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মবলে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। নারী সধবাই হউন আর বিধবাই হউন, যদি তিনি ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মা সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার ভয় কি? ঈশ্বর তাঁহার সকল দুঃখ খণ্ডন করেন। আমরা যে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, জীবনে ধর্ম্ম থাকিলে সুখের অভাব থাকিবে না। সংসারে লোক ধনের জন্য, মানের জন্য, যত ব্যস্ত থাকে, ধর্ম্মের জন্য তদ্রূপ হইলে ইহ জীবনেই স্বর্গসুখভোগ করিতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুমারী, সধবা, বিধবা সকলের জন্যই ঈশ্বর এক এক অবস্থার সুখ রাখিয়াছেন। কুমারী বিদ্যা শিখিয়া, সধবা পতিসেবা করিয়া, বিধবা দেবী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন করিতে অধিকারিণী। পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আহা! ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব মহিমা। যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা কুসংসর্গ এবং পাপ কার্য্যে রত থাকে, তাহাদের জীবনেও যদি ধর্ম্মের ছায়া পতিত হইতে পারে, তবে সেই দুর্গন্ধ কলুষিত জীবনও কেমন অপূর্ব্ব হইয়া উঠে। আমার নিকট একখানা পুস্তক আছে, তাহার নাম "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা।" ইহা পাঠ করিলে মনে কি সুখ হয়; রামায়ণে একটি হীনজাতীয়া তাপসীর বৃত্তান্ত আছে, তাহাও কি মিষ্ট, পাঠ করিলে মনে কি অপূর্ব্ব ভক্তির সঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয় এই, ইদানীন্তন কালে নারীগণ মধ্যে তাদৃশ ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কাল পুরুষের মধ্যে যদিও ধার্ম্মিক দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ধার্ম্মিকা নারী বড়ই দুর্লভ। পূর্ব্বকালে এ রত্নের অভাব ছিল না। প্রতি তপস্বীর আশ্রমেই দুই একটী রত্ন শোভা পাইতেন। আহা! কবে আবার এমন দিন আসিবে, যখন প্রতি গৃহস্থের ঘরে রমণীগণ পবিত্র নারীজীবন লাভ করিয়া জগৎকে স্বর্গতুল্য করিবেন। যদি আমরা সকলেই ধার্ম্মিকা ও শুদ্ধাচারিণী হই, তবে অচিরে ইহজীবনেই স্বর্গ দর্শন করিতে পারি। হে ঈশ্বর! আমরা অবলা রমণী, আমাদের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্ম্মবল নাই। হে প্রভো! তুমি জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবল প্রদান কর। আমরা যেন চির দিন তোমার চরণের দাসী হইয়া থাকি। তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ধর্ম্ম, তোমার চরণ হইতে আমাদিগকে পৃথক রাখিও না। প্রভো

দয়াময়! চির দিন যেন তোমার পাদপদ্মে আমাদের মতি রতি থাকে। দয়াল! আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দুর কর। তুমি পাপহারী হরি, আমরা অজ্ঞান, কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয় এবং কিরূপেই বা তোমার পূজা করিতে হয়, কিছুই জানি না। প্রভো! আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই দাসীরা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া তোমার পাদপদ্মে ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রীমুক্তকেশী দেবী।

[শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি এ, হেডমাষ্টার, পুটিয়া হায়র ইংরাজি স্কুল, ডাক—নাটোর—আমাদিগকে লিখিয়াছেন, লেখিকা "ষোড়শ বর্ষীয়া"—"ইবাজি জানেন না, অন্তঃপুরে থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।"

নবজীবন সম্পাদক।]

প্রাচীন কলিকাতার দুই একটী চিত্র।

আজ যে কলিকাতার এত নাম ডাক, এত সৌন্দর্য্য, এত গৌরব, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায়, ইহার কিরূপ ভাব ছিল, তখন কলিকাতার কোথায় কি ছিল, তাহা জানিতে অনেকের আগ্রহ থাকিতে পারে, আমরা এ সম্বন্ধে যত টুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অদ্য তাহার একটু পরিচয় দিব।

পলাশীর যুদ্ধের পরও কলিকাতা অরণ্যে পূর্ণ ছিল। এখন যে গঙ্গাতীর বাণিজ্য ও বায়ু সেবনের সুন্দর স্থান হইয়াছে সে সময় তাহা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। চৌরঙ্গীর তখন নাম গন্ধ হয় নাই, কেবল ইংরেজের গৌরব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সবে মাত্র তখন নির্ম্মিত হইতেছে। এক্ষণে যে স্থানে পর্মিট বা কষ্টম হাউস, ঐ স্থানে ইংরাজদিগের পুরাতন দুর্গ ও তাহার সন্নিকটে একটী ছোট খাট ডক্ ছিল, সেই ডকে কোম্পানীর বোট প্রভৃতি মেরামত হইত। তখন কলিকাতায় এত ষ্টীমার ছিল না, জাহাজ কদাচিৎ দেখা যাইত।

নানা প্রকার বড় বড় দেশী নৌকায় তখন কোম্পানীর কাজ চলিত। অবে এখানকার ন্যায় তখন কলিকাতায় এত ঘাটও ছিল না, পুরাতন কেল্লার সম্মুখে একটী এবং আরও দুই একটী সামান্য ঘাট মাত্র ছিল। কেল্লার ঘাটে কোম্পানীর লোকজন নামা উঠা করিত।

১৭৫৬ অব্দে নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের কিছু লাভ হইয়াছিল। নবাবের কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সেই ক্ষতি পূরণের জন্য বিস্তর টাকা ধরিয়া দেন, সেই টাকায়, ইংরেজদের ত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালী নূতন ঘর বাড়ী প্রস্তুত করেন, অনেকেব জরাজীর্ণ আবাস ও কুঁড়ে ঘর এই দুষ্ট সিরাজ উদ্দৌল্লার আক্রমণের ফলে নূতন আকার ধারণ করে। আর এই উনবিংশতি শতাব্দীতে ইংরাজ বাহা-দুরের কল্যাণে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া সহর আর একরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার আক্রমণ ফলে কলি-কাতার শ্রী একটু ফিরিয়া যায়, ও বর্ত্তমান ইংরাজ টোলার এই উপলক্ষে প্রথম সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন চৌরঙ্গীর নাম গন্ধ ছিল না; ইংরাজ দোকানদারেরা রাধাবাজার, চীনেবাজার, মুরগীহাটা ও আর্ম্মানি গির্জ্জার নিকট দোকান পত্র করিত, এখন ইংরাজেরা লালদিঘি, চৌরঙ্গী ও ও ধর্ম্মতলা অধিকার করায় বাঙ্গালীরা এই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন লালবাজার এখনকার চৌরঙ্গীর সম্মান উপভোগ করিত, কোম্পানীর বড় বড় কর্ম্মচারীরা তখন লালবাজারবাসী ছিলেন। এই স্থান তখন কলিকাতার মধ্যে 'ভদ্রপল্লী' বলিয়া সম্মান লাভ করিত।

পুরাতন দুর্গের উত্তরাংশে কোম্পানীর কাপড়ের গুদাম ও অপরাপর অংশে কর্ম্মচারী লোকজনেরা বাস করিত। চৌরঙ্গী তখন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, কেবল কলিঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। গড়ের মাঠের কতকটায় বন জঙ্গল আর কতকটা আবাদী জমি ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিখান কুঁড়ে ঘর দৃষ্ট হইত। এই সকলের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা গিয়াছিল, এই রাস্তা দিয়া তখন আলিপুর ও খিদিরপুরে যাইতে হইত। আলিপুর খিদিরপুর তখন যৎ সামান্য গ্রাম মাত্র, উপনগরের সম্মান লাভ তখন ঘটে নাই। এখন আদি গঙ্গা পার হইয়া এই দুই গ্রামে যাইবার নিমিত্ত যেরূপ কয়েকটি বৃহৎ সুবিস্তৃত লৌহ সেতু রহিয়াছে, তখন দুইটি অপ্রশস্ত কাষ্ঠের

সেতু ইহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল মাত্র। কলিকাতায় এখনকার মত তখন যেখানে সেখানে ক্রুম, বগী, ফিটনের হুড়াহুড়ি ছিল না; ভাল গাড়ীর মধ্যে ক্লাইবের একখানি এবং ওয়াট সাহেবের একখানি সবে মাত্র দুই খানি ছিল, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বটে। বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে বড় একটা কেহ গাড়া ঘোড়ার ধার ধারিত না। বড় লোকেরা পাল্‌কিতে করিয়াই প্রায় সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, আর বাঙ্গালী টোলায় তখন গাড়ি চড়িবারও বড় সুবিধা ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় বন জঙ্গল আর পুকুর, বড় রাস্তার মধ্যে সবে চিৎপুর রোড, সুতরাং বাবুরা ভাল গাড়ী চড়ে, কি কর্‌বেন। কলিকাতার উত্তর পল্লী কয়টির বা বাঙ্গালী টোলার এখনকার তুলনায় তখন লোক সংখ্যা সামান্য হইলেও অধিবাসীর সংখ্যা বড় মন্দ ছিল না। কোম্পানীর চাকরীতে রোজগার থাকায়, কলিকাতার লোক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য বড় মন্দ ছিল। জ্বর, পালাজ্বর, পিলে, উদরাময় প্রভৃতি রোগগুলি তখন কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলের নিত্য সহচর ছিল। এখন যেমন একজন ইংরাজ আপন অত্যাচারের ভোগে ভুগিয়া মরিলেও তাহার খবর পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যায়, ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটী ও গ্যাস কোম্পানীকে তাহার জবাব দিহি করিতে হয়, তখন এত ঝঞ্ঝাট কাহাকেও পোহাইতে হইত না, অথচ প্রতি বৎসর আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে (অর্থাৎ বর্ষা ও শীতকালে) বার ঘণ্টার মধ্যেই অনেককে ইংরাজ লীলা সম্বরণ করিতে হইত। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে বৎসর মেজর ফিলপেট্রিক দুই শত চল্লিশ জন ইংরাজ-সৈনিক লইয়া ফলতায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে এই কয় মাসের মধ্যে দুই শত দশ জন সংক্রামক জ্বরে প্রাণত্যাগ করে।

১৬৮৯ সালের সংক্রামক জ্বরে আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বার শত ইংরাজ অধিবাসীর মধ্যে চারি শত ষাট জনকে কবরস্থ করিতে হয়। ১৭৬২, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০ সালে কলিকাতায় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে শেষোক্ত বৎসর জ্বর ও আমাশয় রোগে আশী হাজার বাঙ্গালী ও দেড় হাজার ইংরাজের কলিকাতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। মনে করুন, এখন-কার তুলনায় তখন ইংরাজের সংখ্যা কত অল্প ছিল। কেবল কলিকাতাতেই

যে ইংরাজদিগকে এইরূপ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রাণ হারাইতে হইত তাহা নহে, জলপথেও প্রভুদের পরিত্রাণ ছিল না; ভাল বৎসরেই প্রত্যেক জাহাজের প্রায় সিকি লোককে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গালাভ করিতে হইত। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সৃষ্টি হইয়া এই মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে, তাই সাহেবদিগের মিউনিসিপালিটীকে লইয়া আজকাল এত আবদার বাড়িয়াছে ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটীর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন।

মৃত্যু সংখ্যার ন্যায় তখনকার কলিকাতায় আগুণ লাগার সংখ্যারও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। প্রতি বৎসরই বিস্তর গৃহ অগ্নিতে ছার খার হইয়া যাইত। তন্মধ্যে ১৭৮০ সালের ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবসে কলিকাতায় যেরূপ অগ্নি কাণ্ড হয়, সেরূপ অগ্নিকাণ্ড সমস্ত বাঙ্গালায় পরবর্ত্তী শত বর্ষের মধ্যে হইয়াছে কি না সন্দেহ। উক্ত দিবস বহুবাজারে প্রথম আগুণ লাগিয়া জান বাজার ও কলিঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশাধিক পথে হাজার গৃহ ধ্বংশ করে। এই অগ্নিকাণ্ডে কত লোক পুড়িয়া মরে তাহার সংখ্যা নাই, তবে এই আগুণের ধুঁয়াতে এক শত নব্বই জন লোককে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতায় বিস্তর লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আবার এই অগ্নিকাণ্ডের কথা শেষ হইতে না হইতেই এপ্রেল মাসে উহার নিকট পুনরায় এক ভয়ানক আগুণ লাগে। এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন কলিকাতার অধিবাসীগণ কতদূর নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিতেন।

ইংরাজদিগের কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় পুলিস আদালত ছিল না। তখন মেয়র কোর্ট বলিয়া এক রকম আদালত ছিল। ১৭২১ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরা এই আদালত সংস্থাপন করেন। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে মেয়র ও অল্‌ডারম্যানেরা তখন বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। এই সকল বিচারকার্য্য বড় চমৎকার ছিল, "জোর যার মুলুক তার" "টাকা যার জয় তার" এই প্রণালীতে তখন বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত।

প্রাচীন কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা লিখিতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। সাহেবরাই আমাদের দেশের সকল সময়ের ইতিহাস লেখক, বাঙ্গালী বাবুরা এ সকল বাজে কাজের ধার ধারেন না; আবার সাহেব-

দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বেশী করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিশনরি, সুতরাং তাঁহাদের লেখায় নিন্দা ভিন্ন প্রশংসা খুঁজিয়া বাহির করিবার যো নাই; তবে আমরা এই নিন্দার মধ্য, হইতে এইটুকু ছাঁকিয়া লইতে পারি যে, তখনকার হিন্দুয়ানীতে ভেল চড়ে নাই, ভণ্ডামী, দোকানদারী করিবার লোক তখনও জন্মায় নাই, আর হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র বলিয়া তখন কেহ দাবী দাওয়া করিত না, সকলে সরল বিশ্বাসের সহিত হিন্দুধর্ম্মেয় নিয়ম রক্ষা ও ক্রিয়া কাণ্ড পালন করিত। কারনওার সাহেবের লেখায় বোধ হয় বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্তের প্রাদুর্ভাব তখন যেন কিছু বেশী ছিল; তাঁহার লেখার মধ্যে চিতপুরে ও কালি-ঘাটে নরবলির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই নর বলির সংখ্যাও যে বড় মন্দ ছিল না,—তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইত। সতী দাহ, শিশু সন্তান গঙ্গায় নিক্ষেপ ও অন্তর্জ্জলির তখন বড় ধুম ছিল। দশহরা এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গায় শিশু সন্তান নিংক্ষেপের প্রশস্ত দিন ছিল। আমরা চিরকাল সতী "দাহের" কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, অনেককেই যে জোর করিয়া নিষ্ঠুরভাবে 'দাহ' করা হইত,—আমরা বরাবর সাহেবদের মুখে ইহাই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কায়রওার সাহেবের লেখায় আমরা দেখিতে পাইলাম, কোন কোন বিধবা স্ত্রী স্বামীর অনুগমন না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে যাইয়া বসিয়া থাকিত, পরে জোয়ারের স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বোধ হয়, যাহাদের স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইত তাহারা এই প্রকার করিত। যাহা হউক, সতীদাহর মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও সাহেবরা সতীদাহ প্রথাটাকে হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথার ন্যায় ভীষণভাবে বর্ণনা দ্বারা হিন্দু হৃদয়ের যতটা নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও পিশাচ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরু-ষেরা যে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেন, শেষোক্ত ঘটনার দ্বারা ঠিক তাহা বোধ হয় না, বরং অনেক সতী স্ত্রীলোক যে স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জন করিতেন—গঙ্গাতীরে বসিয়া দেহ ত্যাগ করার ঘটনায় তাহাই বিশেষ প্রমাণ হইতেছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

বনিবে না।

তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না। কেমন করিয়াই বা বনিবে বল, তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতির আকাশ পাতাল প্রভেদ।

তোমরা সুখের কোলে লালিত পালিত হইয়া, পরিজনে বেষ্টিত হইয়া, কৌমুদী-স্নাত সৌধোপরি বসিয়া, আশার মোহন মূরতি হৃদয়ে আঁকিতে আঁকিতে যে সুখভোগ কর, আমি গাঢ় অন্ধকারাবৃত, প্রাবৃটধারায় সিক্ত, পরিজন-চ্যুত, একাকী এবং নির্জ্জনে অবস্থিত, লোক-ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্রে উপনীত—হইয়া তোমাদের চেয়েও সুখ পাই। এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে সুখের আবেগে, বড় বড় তরঙ্গ ছুটিতে থাকে, তাই বলি তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

তোমরা সুখ চাও, আমি কেবল দুঃখ চাই; তোমরা সর্ব্বদা হাসিলে সুখ পাও, আমি এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া যদি দু ফোটা চক্ষের জল ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমার বড়ই সুখ হয়। তোমরা সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা হও, কাঁদ; আমি তোমাদের এই রহস্য দেখিয়া বড়ই সুখ পাই, আমার খুব হাসি আসে। তোমরা সুখের পেছুনে পেছুনে ছুটিয়া যে সুখ পাও, আমি কেবল তোমাদের সুখের কথা ভাবিয়া তাহা হইতেও আমোদ পাই। মোট কথায় তোমাদের সুখ এক রকম, আমার সুখ অন্য রকম। তবে বনিবে কি করিয়া?

মানুষ মরিলে তোমরা 'বিচ্ছেদের' জন্য কাঁদ, কিন্তু আমি কেবল 'তাহাদের' জন্য কাঁদি। তোমরা বল যে "তাহাকে আব দেখিতে পাইব না; সে যে একেবারে গেল; সে তো আর আসিবে না," আমি বলি তাহাকে দেখিতে পাইব, কিন্তু চিনিতে পারিব না। সে গেল আবার আসিবে, কিন্তু অন্য রূপে। তাহাকে দেখিব, তাহার কথা শুনিব, তাহাকে আবার পাইব কিন্তু চিনিতে পারিব না। তোমরা তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল বলিয়া কাঁদ, আমি তাহার অস্তিত্ব রহিল বলিয়া কাঁদি! সুতরাং তোমাদের চেয়ে আমার কষ্ট বেশী।

শ্মশানের ন্যায় আমার মন। শ্মশানক্ষেত্রে যদি তোমরা ঘৃণা কর, তবে আমি তোমাদের ঘৃণার্হ। রাবণের চিতার ন্যায় আমার মন সর্ব্বদা ধূ ধূ

করিতেছে। তাহাতে পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, মোহ-মায়া, প্রণয়-স্নেহ, মমতা-ভাল-বাসা, ভক্তি প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, পূজা-যোগ, ভালমন্দ, মান অপমান, জ্ঞান অজ্ঞান, বুদ্ধি-বৃত্তি, স্বার্থ-পরার্থ, কাম নিষ্কাম, আলোক অন্ধকার, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আস্থা অনাস্থা,—এই সকলই পুড়িতেছে। মনের যে গুণটা সোণার মত, তাহা এই আগুণে পুড়িয়া বিশুদ্ধ হইতেছে; যেটা অতি অকিঞ্চিৎকর, সেটা পুড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। স্বীকার করিলাম তোমাদের মনও চিতার মত। কিন্তু তবু তোমাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে প্রভেদ বিস্তর। চিতার্পিত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে চিতা নির্ব্বাণ হয়। তোমাদের ঠিক্ সেইরূপ দশা। তোমাদের মন জ্বলিয়া উঠিল, যে জিনিষটা তোমাদের মনে ছিল, তাহা সেই সঙ্গে পুড়িয়া গেল। অবশেষে ফোঁস ফোঁস করিয়া ফোঁটা কত তপ্ত অশ্রু পড়াতে তোমাদের মনের চিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল—সব ফুরাইল। তার পর অন্য দ্রব্য আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল, পূর্ব্বের চিহ্ন মাত্রও রহিল না। কিন্তু আমার মনে যখন চিতা জ্বলিয়া উঠে, তখন সেই চিতাধূম মনের সর্ব্বাংশ একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। চিতাও যত নিবিতে থাকে, সেই ধূমও তত আমার মনের অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিজড়িত হইতে থাকে। চিতা নির্ব্বাণ হইলে যে সকল অস্থিখণ্ড পড়িয়া থাকে সেগুলিও আমার মনের ভিতর স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া যায়। তোমাদের মন সমতল, আমার মন তদ্বিপরীত। আমার মনে 'পাড়' রহিয়াছে। সেই 'পাড়ের' এক পার্শ্বে তোমরা যদি দাঁড়াইতে পারিতে, তবে দেখিতে যে স্তরে স্তরে কত অসংখ্য চিতার স্তর রহিয়াছে। কত অস্থিখণ্ড, কত অঙ্গারখণ্ড, কত চিলুর দাগ—আরো কত কি! তাই বলি, আমার মনে যে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহার কাছে পৃথিবীর আগুণ অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ, অতি হেয়।

আজি এক বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী 'পোষ্টমর্টেম' অর্থাৎ শব-ব্যবচ্ছেদ দেখি। সে একটী কিশোরীর শব। বয়স ১৪।১৫ বৎসর। যখন তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্ঘাটিত হইল, তখন একটী কথা আমার মনে পড়িল। সে কথাটী এই যে, লোকে বলে—

"আমায় হৃদয় যদি দেখাবার হ'তো,
বুক চিরে দেখাতাম ভালবাসি কত।"

কিন্তু কৈ? হৃৎপিণ্ডে যে কিছুই অঙ্কিত থাকে না। তাই আমি আমার হৃৎপিণ্ড কিম্বা মানসিক শ্মশান দেখাবার ভাণ করিব না। তবে এই মাত্র

বলিতে পারি যে, যদি কেহ তোমরা যাহাকে বিনা কারণে বল, সেই বিনা কারণে শ্মশান ভ্রমণ, নির্জ্জন-রোদন, সংসারে বৈরাগ্য, অতর্কিত অশ্রুফোটা, শূন্যদৃষ্টি, জীবনে নির্ম্মতা, প্রকৃতির পূজা, অন্তরের ধ্যান, অসতর্কতা এইগুলির অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তবে তিনি আমার মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন। নচেৎ অন্যের কি সাধ্য যে আমার মনের কথা জানিতে পারে ?

তোমরা যাহাকে বীভৎস বল,—তাহাই আমার রম্য। তোমাদের যাহা ভাল লাগে না, তাহা আমার বড় আদরের। তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতি-গত প্রভেদ বিস্তর। তাই বলি তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

তোমরা সংসারী, আমি বৈরাগী। তোমাদের চিন্তার অন্ত আছে, আমার চিন্তার অন্ত নাই। তাই আমি সদা অনন্তে ডুবিয়া থাকি। আমি 'অনন্তের' বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যে সুখ পাই, তাহার বিন্দুমাত্রও বোধ করি তোমরা পাও না। সেই জন্য—

"Alone and pensive, the deserted strand
I wonder o'er with slow and measured pace,
And shun with eager eye the lightest trace
Of human foot, imprinted on the sand.

I find alas ! no other resting—place
From the keen eye of man ; for in the show
Of joys gone by, it reads upon my face
The traces of the flame that burns be low.

And thus, at length, each leafy mount and plain,
Each wondering stream and shady forest know,
What others know not—all my life of pain."

জনশূন্য গঙ্গাতীরে, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে,
একা একা ভ্রমি আমি পায়ে পায়ে গণে,'
বালুর উপরে লেখা, মানবের পদরেখা',
দেখিলে দূরেতে যাই চকিত নয়নে।

মানবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ছেয়েছে সংসারসৃষ্টি,
জুড়াবার স্থান মম আর কোথা জুটে?
অন্তরের দাবানল, মানবের লক্ষ্যস্থল,
যতই ছাপাতে যাই তত ফুটে উঠে।

তাইত,—

প্রান্তর, পর্ব্বতগণ, ছায়া-আচ্ছাদিত বন,
ধীর প্রবাহিনী নদী জানে মম ব্যথা,
জীবনের এ যন্ত্রণা, আর কেহ জানিল না,
মরমে রহিল মম মরমের কথা।

এক দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। যে দিন মৃদু পবনের মৃদু মৃদু হিল্লোলে ছোট ছোট ঢেউগুলি, অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের মৃদুরশ্মি সংস্পর্শে মণ্ডিত হইয়া, দুলিতে দুলিতে আমার হৃদয় দুকূলে আসিয়া ধীরি ধীরি প্রতিঘাত করিত, সেই দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। হায়! সে দিন এখন আর আমার নাই,—সে দিন কখন আর আসিবে না। তবে আর তোমাদের সঙ্গে বনিবে কি করিয়া?

সে দিনও আর নাই, সেই ঢেউগুলিও আর নাই! তাহার পরিবর্ত্তে, হৃদয় এখন একটী মহাসমুদ্রের আধার। যদি সাহস হয়, সেই সমুদ্রের বেলাভূমির উপর অবস্থান করিয়া দেখ, অনন্ত ব্যাপিয়া, নিম্নদেশে কি পড়িয়া রহিয়াছে! কি শান্ত, কি গভীর, কি প্রাণোন্মাদকর! ইহাতে 'উত্তমাশা অন্তরীপের' আবর্ত্ত নাই, 'কৃষ্ণসাগরের' ঝটিকা সঙ্কুলতা নাই। বন্যার ন্যায় ইহার জল ছুটে না; খরস্রোতার মত ইহাতে ডাক নাই। ইহার জল বড়ই প্রশান্ত, বড়ই স্বচ্ছ, এবং অনন্তবিস্তৃত। নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, ফল্গু নদীর ন্যায় ইহা অনেক স্থলেই অন্তঃসলিলা। অনেক জলবিন্দুর সমষ্টিতে ইহা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু কার সাধ্য এখন ইহার গতিরোধ করে?—সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মিলিবে না।

তোমায় আমায় কিরূপে মিলিবে গৌরাঙ্গ? তুমি নন্দনোদ্যানবিহারী, আমি পথের ভিখারী। সুপ্রশস্ত সুবাসিত সুশীতল সুরম্য হর্ম্ম্যে তোমার বাস,—বাত্যোৎক্ষিপ্ত বর্ষা-সলিল-সিক্ত কর্দ্দমময় কুটীরতলে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস। বরুণ তোমার ভয়ে তটস্থ,—জমিয়া বরফ; সে বরফ-স্নিগ্ধ বিয়ার-বারুণী তোমার পানীয়। আর আমার পেয়—সকর্দ্দম কূপোদক, সমল সরোবর সলিল, অথবা ভগীরথের কঠোরতম তপোলব্ধ এখনকার এই জবাকুসুম-সঙ্কাশ জাহ্নবী জল। তোমার সহধর্ম্মিণী—দিব্য বসন ভূষিতা চারুচন্দ্রপ্রভাননী গৌরী! আর

"মন্দোদরী মে শয়নে বিলগ্না
স রাবণোঽহং দিকপাল হীনঃ।"

এমন উত্তম ও এমন অধমে কিরূপে মিলিবে, গৌর?

তুমি আছ, অমরাবতীতে—স্বর্গে। আর আমি, পাতালে—পুতিগন্ধময় অন্ধকার বিবর মধ্যে। দেখ, কেলো ভুলো আমার চাকর; তাহাও সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারি না যে, তাহারা আমার ভৃত্য, কি আমি তাহাদের ভৃত্য। কিন্তু তোমার পরিচারিকা—স্বয়ং চপলা। কি বশীকরণ তুমি জান জানি না—যাহার প্রভাবে তুমি অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলতার আদর্শ সৌদামিনীকেও স্থির অচঞ্চল করিয়া গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছ; আর সেও 'বিনা ওজর আপত্তিতে' তোমার ভৃত্যকে আহ্বান করিতেছে, তোমার সংবাদ দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছে, আবশ্যক মত সুবিমল শুভ্র আলোক রাশিতে তোমার গৃহ ও উদ্যান উদ্ভাসিত করিতেছে,—আর কত কি করিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। ধন্য তোমার মহিমা! তোমার প্রতাপে ক্ষণপ্রভা স্থিরপ্রভা হইয়া তোমার গৃহে নিত্য বিরাজমানা। তুমি স্বর্গের দেবতা, আর আমি মর্ত্ত্যের মানব। কত অসাধ্য, কত অদ্ভুত কার্য্য তোমার দ্বারা সাধিত হইতেছে। আর আমার দ্বারা কি হইতেছে? আমি কি? আমি তোমার পদলেহী ভৃত্য মাত্র। তোমাতে দেবত্ব, আর আমাতে নিগারত্ব। এমন উত্তমে ও এমন অধমে কেমনে মিলিবে, দেব?

ব্রহ্মতেজ এখন তোমারি। শুনিতে পাই, সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ ফুৎকারে

অগ্ন্যুৎপাদন করিতে পারিতেন। সত্য মিথ্যা সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবই জানেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, তোমার সঙ্গে অগ্নি সর্ব্বদা বিদ্যমান। তোমার বাক্যে অনল বাহির হয়, তোমার বুটাঘাতে অনল নিকলে, তোমার বেত্রে ত অগ্নি বিদ্যমান আছেনই, তোমার পকেটেও বহ্নিদেব সর্ব্বদা বিরাজমান। সুতরাং তুমিই এক্ষণে এই প্রবল কলিযুগে নিষ্ঠাবান বর-ব্রাহ্মণ, তাহার সন্দেহ নাই। আর তাহা না হইলে ইংলণ্ডে বসিয়া মোক্ষ মূলর সাহেব হিন্দুর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের 'বিদায়' পাইলেন কিরূপে? ব্রাহ্মণের বাক্যই বেদ। সে বেদবাক্যে এখন আমাদের অটল বিশ্বাস। তাইত বলি, সামৃগযজুঃ কেবল কৃষকদের ভয়গীতি মাত্র বই ত নয়! যোগ, এখন কেবল তোমারি সাধ্য। প্রমাণ—অল্‌কট্‌ সাহেব। 'যজন যাজনের' কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। কেন না তুমি ব্রহ্মদেশ হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমগ্র দেশটা যেরূপ যজাইয়াছে, তাহা লোক-বিশ্রুত। 'অধ্যয়ন অধ্যাপন'—শিক্ষাবিভাগের বিবরণীতেই প্রকাশ। আর দান প্রতিগ্রহণে' তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাহাদুরী। দুই চারিটা ফাঁকা আওয়াজ 'দান করিয়া তুমি দেশীয় ভারত ভাণ্ডারস্থ অমূল্য রত্ন সকল যে অতুলনীয় অনুকম্পার সহিত 'প্রতিগ্রহণ' করিতেছ—তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়! বালকে যেরূপ "গোপ্তাখেকো" ঘুড়ীতে "কান্নে" অথবা "নেজুড়" লাগাইয়া দিয়া আকাশ কোলে উড়াইতে পারে, তুমিও সেইরূপ বড়লোকদিগের নামে এক আবটু নেজুড় যুড়িয়া দিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত অত্যুচ্চে উড়াইতে পার; এবং বায়ুবেগে তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে তুমি সেই বালকদেরই মত নির্ম্মম ও দ্বিধাশূন্য চিত্তে তাঁহাদিগকে অক্লেশে পরিত্যাগ করিতে পার, —সুতরাং তুমি বালকের ন্যায় সরলচিত্ত তাহাতে আর সন্দেহ কি? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের কোথায়ও যাইতে নিষেধ ছিল না, এখন তোমারি সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার। আমরা যেখানে গেলে গলা ধাক্কা খাইয়া "হাত মুখ" লেহন করিতে করিতে সুতাহাটার চোরের মত ফিরিয়া আসি, তুমি সেখানে সগর্ব্বে অবাধে প্রবেশ করিতে পার। পুলিশ প্রতিকৃতি দ্বারী মহাশয় তখন সশঙ্কে আভূমি সেলাম করিয়া তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। এমন প্রতাপান্বিত—এমন প্রবলের সহিত এমন দুর্ব্বলের মিলন কি কখন সম্ভব?

অকৃতি অধম আমি তোমার বিচারেও আমার অধিকার নাই। তবুও আমি তোমার স্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি, তবু আমি তোমার সহিত

মিলিবার?—তোমার সমান হইবার স্পর্দ্ধা করিতে যাইতেছি, আমার ধৃষ্টতা কম নয়! কিন্তু দেব! আমার এ অপরাধের মূল তুমি। "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" তুমিই আমাকে 'Struggle for existence' কি, বুঝাইয়া দিয়াছ। আর যখন Struggle for existence পদার্থটা বুঝাইয়াছ, তখন 'Survival of the fittest' কি, তাহা কি আমাকে বুঝাইবে না? অবশ্যই বুঝাইবে। তাই ত তোমার গুণকীর্ত্তন করিতে বসিয়াছি—তাই ত তোমার অনুগ্রহ লাভে এত যত্ন। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না। নিজ ভুজবীর্য্যবলে পরাজয় আটকাইয়া রাখিতে পারি না। তোমার প্রতি ভক্তি না দেখাইলে পরিত্রাণ পাই না। যে দিনই শুভ্র রজত পুষ্পে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তোমায় পরিতুষ্ট করিতে পারিয়াছি, সে দিনকার যুদ্ধে, দেখিয়াছি, জয় আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। তাই ত তোমার পূজার জন্য আমার এত আকিঞ্চন। তোমায় আমায় কখন মিলিবে না বলিয়াই আমি তোমায় এত পূজা করি। তাইতে বলিতেছি,—

আমার এ সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে একবার
এস, হে গৌর!
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে
এস, হে গৌর!
যদি 'বিলাত' ছেড়ে রইতে নার,
আমার এই 'ভারত' মাঝে বিলাত কর।
তুমি হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠান কর, আমি তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা করি।

লীলা।

১ম অধ্যায়।

রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সুপণ্ডিত। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র হরদয়াল কলেজে পড়েন। কন্যা লীলা, সে বালিকা।

রামদয়ালের বড় সাধ পুত্রটীকে মনের মত সুশিক্ষা দেন। কিন্তু বিধাতা ক'জনকে মনের সাধ পূর্ণ করিতে দেন! হরদয়াল পৃথিবীর মায়া—পিতার মায়া পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্র শোকে রামদয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। রামদয়ালের আর পুত্র হইবার আশা রহিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন "লীলাকে সরস্বতী করিব।"

রামদয়ালের যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—তাহাতে একটী ক্ষুদ্র পরিবার বেশ সম্ভ্রমে থাকিতে পারে। সুতরাং তিনি চাকরী ও বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে আসিলেন। লোকে তাঁহার শোকে শোক মিশাইয়া হরদয়ালের অভাবযাতনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিল—তিনি লীলাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, "লীলা আমার শত হরদয়াল।"

বাড়ী আসিয়া রামদয়াল এক নূতন চাকরী লইলেন—চাকরী অবৈতনিক কিন্তু রামদয়াল শিমলা শিখরে বসিয়া বিশ হাজার টাকা পাওয়ার চেয়েও তাহা অতি বেশী সুখের বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি লীলার শিক্ষক হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ শিক্ষক হইলে নারীর উচ্চ শিক্ষার ফল যৌবন স্রোতে বিষের সাগরে ভাসিয়া যাইতে পারে না।

২য় অধ্যায়।

রামদয়াল লীলাকে অতি সাবধানে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। লীলা শিক্ষার এক পদ অগ্রসর হইলেই তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন—উঁহাকে সরস্বতী করিতে পারিবেন।

লীলার বয়স যখন নয় বৎসর হইল তখনই লীলা রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া পিতাকে শুনাইত এবং ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ, সীতার বনবাস, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও নব নারী প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া পড়িতে পারিত। আর অতি পরিষ্কার অক্ষরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিত।

রামদয়াল দেখিলেন কন্যার বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ জ্ঞান সুন্দর জন্মিয়াছে, সুতরাং আর এখন উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া একযোগে

সংস্কৃত ও ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। লীলা খেলার আনন্দে তাহা শিখিতে লাগিল।

তের বৎসর বয়সের সময় লীলা একদিন পিতার শিয়রে বসিয়া পড়িতেছে। একখানি পুথি বাম হস্তে ধরিয়া ক্রোড়ে রাখিয়াছে—আর এক খানি ডান্ হাতে ধরিয়া মৃদুস্বরে পড়িতেছে। এই সময়ে রামদয়ালের এক জন প্রাচীন বন্ধু উপস্থিত হইয়া বসিলেন। লীলার কোমল মাধুরীতে তাঁহাকে বিস্মিত ও মোহিত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা—করিলেন—"মা তুমি ও খানি কি পড়িতেছ," লীলা ধীরে ও সম্ভ্রমে কহিল "গীতা।"

বন্ধু অবাক্ হইয়া রামদয়ালের মুখপানে চাহিলেন। রমদয়াল হাসিয়া বলিলেন, "গীতা উহার কণ্ঠাগ্রে—নিজে ব্যাখ্যা করিয়া ও বুঝিয়া পড়িতে পারে।" বন্ধু পুনরায় লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাঁ হাতে ও খানি কি বই মা ?" এবারে লাজ-শীলা লীলা একটু হাসিয়া বলিল " জন বুনিয়ানের পিল গ্রিমস্ প্রগ্রেস" বন্ধু নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ !

৩য় অধ্যায়।

লীলার পনের বৎসর বয়স হইল। গ্রামের লোক ছি—ছি করিতে লাগিল—আর এ দিকেও কত সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

লীলা কুলীন কন্যা বটে, কিন্তু সে জন্য যে উহার বয়েস বেশী হইয়াছে তাহা নহে। রামদয়াল কন্যা চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না। সুতরাং তিনিই দোষী।

লীলা পনের বৎসরের হইয়াছে এবং ইংরেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেশ শিখিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও তাহার বালিকা ভাব যায় নাই—এখনও পৃথিবীর দূষিত বায়ু তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে পায় নাই। লীলা কেবল বহি পড়িয়াছে, পীড়িতা মাতার সেবা করিয়াছে, এবং পিতার উজ্জল বদন নিয়ত দেখিয়াছে। ইহা বৈ লীলা নূতন কিছু জানে না, নূতন কিছুই শিখে নাই।

একদিন রামদয়াল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লীলা এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এখন আর রাখিতে পারি না, স্বামীগৃহে সকলের প্রিয় হইয়া থাকিতে গেলে অনেক কষ্ট সহিতে হইবে"—

লীলা দেখিল পিতৃদেবের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে—স্নেহময়ী কি উত্তর দিবে,—তবে অশ্রুপাতের প্রতিদান. যদি অশ্রুপাত হইতে পারে তবে লীলার নয়ননির্ঝরই তাহার যথেষ্ট উত্তর। লীলা কাঁদিল—

"মা কাঁদিতেছ কেন ?"

"তুমি কাঁদিলে কেন বাবা ?"

"তোমার বিবাহের কথায়"

"বিবাহ ?"

"হাঁ—মা"

"তবে বিবাহে কাজ কি ?

রামদয়াল হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন, 'বিবাহে কাজ না থাকিলেও বিবাহ করিতে হয়। নারীর স্বামী বই গতি নাই। স্বামী পিতা মাতা হইতে উচ্চ—স্বামী দেবতা। নারীর বিবাহের অর্থ—নারীর দেবসেবায় রত হওয়া। এখন তোমার বয়স হইয়াছে—এখন কঠোর ব্রত ধারণ করিতে পারিবে, দেব-সেবা করিতে সক্ষম হইবে—এখন তোমাকে গৃহে রাখিলে আমাদের পাপ হইবে।'

লীলা শুনিল, কিছু বলিল না। রামদয়াল পুনরায় বলিলেন "লীলা, তুমি সুশিক্ষিতা, এবং তোমার ভাল মন্দ বুঝিবার উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে, তুমি যদি লজ্জা না করিয়া আমার কথার সদুত্তর দাও, তবে আমাকে বড় খুসী করিবে।"

লীলা বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন "সিন্ধুকে দেখিয়াছ ?"

"যিনি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন ?"

"হা।"

"দেখিয়াছি।"

"তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে চাহি।"

লীলা ইহার কোন উত্তর দিল না—ধীরে ধীরে পিতার নিকট হইতে উঠিয়া মাতার শয্যাপ্রান্তে যাইয়া বসিল।

রামদয়াল লীলাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা বোধ করি-লেন না। লীলার ফুল্ল বদন এবং নৃত্যশীল নয়নই তাঁহার প্রশ্নের পরিস্ফুট উত্তরদান করিল।

৪র্থ অধ্যায়।

লীলার বিবাহ হইল। লীলা সুখী হইল—ভাবিল, "নবজীবন পাইয়াছি—পতিসেবা নহে—যথার্থই দেবসেবা করিতে পাইয়াছি—ইহার পরেই বুঝি স্বর্গ—সে স্বর্গ, কত দূরে, কত উচ্চে"?

চাঁদে কলঙ্ক না থাকিলে চন্দ্র-মাধুরী পরিস্ফুট হইত না। কমলদলে কণ্টক না থাকিলে কমলের গৌরব বাড়িত না, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত না থাকিলে সুখ সুখের হইত না। তাই সহসা লীলা চন্দ্রে কলঙ্কপাত হইল,—লীলার সুখের হাসি—না ফুরাইতেই দুঃখ আসিয়া তাহাকে ঘিরিল।

বিবাহের ছয় মাস পরে লীলার মা মরিল; আর ছয় মাস পরে বাপ মরিল—তাহার তিন মাস পরে স্বামী শয্যাগত রোগে মৃতপ্রায়। ধর্ম্ম-বল—যোগ-বল—ঐশী-বল কি সৌভাগ্য-বল—যে বলেই বল—লীলা বিধবা হইল না। লীলা স্বামীকে কলিকাতা নিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইল। স্বামী মৃতদেহে জীবন পাইল—কিন্তু তাঁহার পৌরুষ শক্তি নষ্ট হইল।

লীলা রুগ্না নহে, লীলা আমেরিকা বা ইউরোপীয় ললনা নহে, লীলা নারীসমাজ-সংস্কারিনী বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিতাও মনে করে না; সুতরাং স্বামীর পুরুষ-শক্তি ধ্বংশাধ্বংশের জন্য সে কিছু মাত্র বিষণ্ণ নহে। স্বামী মৃত্যু-মুখ হইতে বাঁচিয়াছেন এই তাহার আনন্দ, স্বামীপদসেবা তাহার সুখ। পতিসেবা—দেবসেবা—ইহা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই তাহার শান্তি। যে কাজ সে জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়াছে, তাহা তাহার বজায় রহিয়াছে সুতরাং—আর সে কিছুই চাহে না।

লীলার জন্য লীলার স্বামী বিষণ্ণ। লীলার রূপ গুণ মুগ্ধা পরিচিতা রমণীগণ বিষণ্ণ, কিন্তু লীলা বিষণ্ণ নহে। তাহার সুখ ও প্রফুল্লতা এখনও হৃদয়ে আতট পূর্ণ। তন্মধ্যে কেবল একটু চিন্তা, পাছে স্বামী মনে করেন ইন্দ্রিয় সেবনে অসমর্থ হইয়া সে কষ্ট পাইতেছে বা অসুখে আছে।—শুদ্ধ এই ভয়ে বা ভাবনায় লীলা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। লীলা অধিকতর স্বামী সেবা প্রিয়—এবং অধিকতর আনন্দিতা ও সর্ব্বদা হাস্যমুখী, ইহা দেখিয়া তাহার স্বামীর আর বিস্ময়ের পার রহিল না।

এ হেন স্ত্রীরত্ন তাহার সহবাসে বনকুসুমের ন্যায় বিশুষ্ক হইবে ইহা

ভাবিয়া তিনি অস্থির। লীলা কোমলকরে যখন তাঁহার পদ সেবা করে তখন তিনি লীলার তুঃখে ক্রন্দন করেন—লীলা অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা করে।

একদিন পদ সেবা তাঁহার অসহ্য হইল—ধীরে কোমল বন্ধন হইতে পদ মুক্ত করিয়া বসিলেন—কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন—"লীলে, সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় তোমার কে?" লীলা হাসিয়া বলিল "আমার কে?—আমার স্বামী—আমার দেবতা।" এবারে সিন্ধু কান্দিয়া বলিলেন—"তোমার সিন্ধু মরিয়াছে, সে ক্লীব, ধর্ম্মমতে তুমি পুনরায় বিবাহ করিতে পার—তাহা করিতে হইবে।"

লীলা তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিল।—কান্দিয়া বলিল "কি অপরাধে দাসীকে এ নিষ্ঠুর কথা কহিতেছ; তোমার একটা পিস্তল আছে, যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি তাহা দিয়া আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা শুনাইয়া কষ্ট দিও না।" সিন্ধু নীরবে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

৫ম অধ্যায়।

সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় যুবাপুরুষ, সুন্দর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সংসারে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী কেহই নাই, স্বয়ং বিপুল পৈত্রিক বিষয়ের এক মাত্র অধিকারী। তাঁহার পীড়া না হইলে লীলার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা ও পরমা সুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি পৃথিবীর সম্রাটকেও এক দিন তুচ্ছ করিতে পারিতেন—কিন্তু কি বিষম বিড়ম্বনা!

সিন্ধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কলিকাতা থাকিবেন, যে কোন উপায়ে হয়, লীলাকে বিবাহ দিয়া সুখী করিবেন। ইহা করিতে যাইয়া সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়, জাতি কুল হারাইতে হয়,—তাহাতেও স্বীকার। তিনি ভাবিলেন নামে মাত্র বিবাহ করিয়া এহেন সুন্দরী লীলার চিরসুখের কণ্টক হইয়া থাকিবেন না।

সিন্ধু বিবাহে রাজি করিবার জন্য লীলাকে কত অনুনয় বিনয়, কত প্ররোচনা, কত অনুরোধ, কত উপদেশ, কত তিরস্কার করিলেন; কিন্তু লীলার হৃদয় অটল। এরূপ অটলতা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে

লজ্জাবশতই লীলা বিবাহে এরূপ অস্বীকৃত হইতেছে। সুতরাং আর মুখে কিছু না বলিয়া কৌশল অবলম্বন করাই শ্রেয়।

প্রথম কৌশল—সিন্ধু তাঁহার তিনটী অবিবাহিত বন্ধুকে লীলার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন, ইহার এক জন ব্রাহ্ম, দুই জন খৃষ্টান—তিন জনই সুশিক্ষিত সুন্দর ও যুবক। সিন্ধু নিজ উদ্দেশ্যও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—এরূপ সুবিধা কোন্ রসিক যুবা অবহেলা করিতে পারে—সুতরাং তাহারা প্রতিনিয়ত লীলার সহিত কথোপকথন করিতে আসিতে লাগিল। কিন্তু লীলা স্বামীর অনুরোধ উপেক্ষা করা পাপ মনে করিয়া, অতি কষ্টে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। অবশেষ সিন্ধুর বন্ধুত্রয় ক্লান্ত হইয়া হারি মানিলেন, একে একে সকলেই সিন্ধুকে বলিলেন "লীলা সাধারণ নারী নহে—দেবী, ছলে বলে বা কৌশলে কিছুতেই তাহার চিত্তাকর্ষণ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।"

কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া সিন্ধু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, অন্যে বিবাহ করিলে তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া হয় ত লীলা বিবাহে স্বীকৃতা নহে। সুতরাং উকিলবাড়ী যাইয়া লীলার নামে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং যথারীতি রেজেষ্টরি করিয়া আনিয়া লীলার হাতে দিলেন।

এক মাস পর লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দানপত্রখানি যত্নে রাখিয়াছ?"

"দানপত্র কি?"

"আমার সমস্ত বিষয় যে তোমার হইয়াছে সেই দলিল?" লীলা হাসিয়া বলিল "তোমার হইলেই আমার হইল, তার আবার দলিল কি?"

সিন্ধু বলিলেন "এক মাস হইল তোমাকে একখানি কাগজ দিয়াছি, তাকি তুমি পড় নাই?"

"না"

"পড় নাই?"

"না—তুমিত পড়িতে বল নাই?"

"তবে কি করিয়াছ?"

"বাক্সে রাখিয়াছি।"

সিন্ধু আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন "দলিলখানি লইয়া আইস।"

লীলা তিলমাত্র গৌণ না করিয়া দলিল আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। সিন্ধু বিষয়গুলি পাঠ করিলেন।

লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "আমার নামে কেন?" সিন্ধু বলিলেন "এখন হইতে সকল বিষয়ই তোমারই হইল, যাহা খুসি করিতে পারিবে—আমার কিছুতেই অধিকার থাকিল না।"

লীলা কাঁদিয়া বলিল—"নির্দ্দয় হইলে কেন, আমি ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব, তুমিই আমার একমাত্র ঐশ্বর্য্য।"

সিন্ধু বলিলেন "প্রশ্ন করিও না, এখানি রাখিয়া দাও?" লীলা আদেশমত উহা গ্রহণ করিল।

সিন্ধু এবারে খুলিয়া বলিলেন, "লীলে, আমার জন্য কেন কষ্ট পাইবে, বিবাহ করিয়া সুখী হও। এখন আমার সকল ঐশ্বর্য্যই তোমার—লোভে অতি রূপবান এবং গুণবান পুরুষ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে এবং বিবাহ করিলে কোন কষ্টই পাইবে না। কলিকাতা, কাশী বা বৃন্দাবন যেখানে খুসী রাজরাজেশ্বরী হইয়া থাকিতে পারিবে। আর——"

সিন্ধুর বাক্য শেষ না হইতেই লীলা মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইল। তিনি শুশ্রূষা করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, সে কাঁদিয়া তাঁহার পা ধরিয়া বলিল "এরূপ নিষ্ঠুর কথা আর বলিও না, তা হ'লে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না।"

সিন্ধু কিছুকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন "লীলে যদি বিবাহের কথায় এত কষ্ট পাও, আর বলিব না, এই দলিলখানি সম্প্রতি তোমার কাছে রাখিয়া দাও।"

লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া বলিল "আর আমায় কাঁদাইও না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লীলার অটলতা দেখিয়া সিন্ধুর মনে কেমন এক প্রকার ভয় জন্মিল। তিনি একেবারে হতাশ হইয়া চিন্তায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ভাবিলেন "বুঝি আমি মরিলে লীলা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।" সুতরাং এখন তাঁহার চিন্তা এবং চেষ্টা হইল,—কিরূপে সহজে মরিতে পারা যায়। উদ্বন্ধনে

বা তীব্র বিষ পানে মরিলে, লীলা বিপদগ্রস্ত হইবে, তিনি পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন—সাধারণে নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারে,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এখন আর লীলার শুশ্রূষা—লীলার রূপ—লীলার হাসি মুখ—লীলার ভালবাসা—তাঁহার ভাল লাগে না। এখন লীলা তাঁহাকে শত্রু মনে করিলে, অথবা সহজে তিনি মরিতে পারিলেই কেবল সুখী হইতে পারেন।

একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল ডাক্তর পলিডোরি কিরূপে ধীর-বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রভু পত্নীর যোগে প্রভুকে বধ করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল, মনে শান্তি হইল—এক লম্ফে শয্যা হইতে উঠিলেন—তাড়াতাড়ি বস্ত্র লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। যাইবার কালে লীলা জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাও ?"

সিন্ধু অনেক দিন পরে আজ হাসিয়া বলিলেন "নিমন্ত্রণ খাইতে।" স্বামীর বদনে হাসি দেখিয়া লীলার প্রাণ শীতল হইল।

* * * * * * *

রাত্ এগারটার সময় সিন্ধু গৃহে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। লীলাকে বলিলেন—"বড় অসুখ হইয়াছে।" লীলা সারা রাত্ জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল। প্রাতে, জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার আনাইব ?"

যে হতভাগ্য ডাক্তারকে টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন—সিন্ধু তাহাকেই আনিতে কহিলেন।—ডাক্তার আসিতে বিলম্ব হইল না।

ডাক্তার যথারীতি রোগী দেখিয়া বলিয়া গেল "আমার ঔষধালয়ে লোক পাঠাইয়া ঔষধ আনাইও।"

ঔষধ আসিল, রোগী তাহা যথারীতি সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৭ম অধ্যায়।

একদিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে দশ দিন গত হইল, কিন্তু সিন্ধু ক্রমেই বেশী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লীলা দেখিলেন ঔষধে তাঁহার স্বামীর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে—তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছেন।

লীলার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দেখিলে বোধ হয়—এক রোগী আর এক রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। লীলা দশ দিনের দিন সিন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—"এ চিকিৎসক ভাল নহে—আর একজনকে আনা যাক্।" সিন্ধু—অতি কষ্টে বলিলেন "আবশ্যক নাই।" লীলা তাঁহার কথা না শুনিয়া চুপে চুপে সহরের প্রধান ডাক্তার সাহেবকে—আনিতে পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিন্ধুর অবস্থা আরো মন্দ হইল। এত মন্দ হইল যে লীলা কান্দিতে লাগিল। সিন্ধু লীলার মুখপানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "লীলা—আমি যাই—স্বামী-বাক্য পালন করো—আমি মরিলে বিবাহ করিবে বল—প্রতিজ্ঞা কর।"

লীলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"হৃদয়ে যদি সহমরণ যাইবার বল না থাকে—সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তোমার জীবন রক্ষা করিতে না পারি—প্রতিজ্ঞা করিতেছি—তোমার আজ্ঞা পালন করিব।" সিন্ধুর বদন প্রসন্ন হইল—সিন্ধুর নিদ্রা হইল।

একাদশ দিনে পূর্ব্ব চিকিৎসক প্রেরিত ঔষধ লীলা সিন্ধুকে সেবন না করাইয়া, নূতন চিকিৎসকের অপেক্ষায় রহিলেন। সিন্ধু যখন ঔষধ চাহেন, লীলা তখন ঔষধ বলিয়া জল পান করিতে দেন।

এই সময়ে নূতন চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন—লীলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কান্দিয়া বলিল—"আপনি যত টাকা চান—আপনি যাহা চান, আমার যাহা কিছু আছে সকলই আপনাকে দিব—আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ভাল করিয়া দিন।"

চিকিৎসক আশ্বাস দিয়া রোগীর অবস্থা দেখিলেন—দেখিয়া বলিলেন—

"এরূপ অজ্ঞানাবস্থা কতক্ষণ ?"

"এই মাত্র।"

"পীড়া কত দিন হইতে ?"

"এগার দিন।"

"পূর্ব্ব চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখাও ?"

"ব্যবস্থা পত্র তিনি দেন না।"

"তবে ঔষধ পাঠান ?"

"হাঁ।"

"নিজের ডিস্পেন্সারির ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ঔষধের শিশি কোথা ?"

লীলা কান্দিতে কান্দিতে শিশি আনিয়া দিল—ডাক্তার শিশি-সহ পত্র লিখিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য পাঠাইলেন—লোক আর একখানি চিঠি লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল—সাহেব তাহা পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আপনার স্বামী ভাল হইবেন চিন্তা নাই"—এই বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন—"এই ঔষধ সেবন করাইবেন—আমি কাল আসিয়া দেখিব।"

যাইবার কালে লীলা পুনরায় সাহেবের পা ধরিয়া কান্দিতে লাগিল—সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয় ভাল করিয়া দিব।"

* * * * * * *

লীলার শুশ্রূষাগুণে এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে—সিন্ধু এক মাসের মধ্যে শুদ্ধ আরোগ্য হইলেন না, সবল এবং সুস্থও হইলেন। এ সবলতা—এ স্বাস্থ্য—সিন্ধু অনেক দিন হারাইয়াছিলেন। বিধাতার কি অনন্ত লীলা, বিষ পান—অমৃত পান হইল। এ লীলা—লীলার সতীত্বের পুরস্কার।

উপসংহার।

একদিন সিন্ধু প্রফুল্ল মনে নিজ হাতে লীলাকে নূতন আভরণে সাজাইতেছেন—লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল—"কনে ত সাজাইলে, এখন আমার বর কোথায়—বিবাহের কি করিলে ?"—সিন্ধু তাঁহার গণ্ড নাসাগ্রে স্পর্শ করিয়া বলিলেন 'এইত বিবাহের আয়োজন করিতেছি।' একটা শুক পাখী এক পাশে ছিল—সেও বলিল—"এইত বিয়ের আয়োজন কচ্ছি।" সিন্ধু ও লীলা হাসিয়া উঠিলেন।

লীলা আবার বলিল—"এখন তোমার সকল বিষয় সম্পত্তির মালিক হইতে রাজি আছি, আবার জোরে দখল করিবে না ত ?

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন "যদি তাহাই করি," লীলা বলিল "তাহা করিবার আগে আমার সকল বিষয় ছারখার করিয়া ফেলিব।"

'কিরূপে ছারখার করিবে?'

"দেখিবে?"

"দেখিব।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া লীলা দৌড়িয়া একটা ছোট বাক্স লইয়া আসিল এবং উহা হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল।

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন "পুরুষ হইয়া সতীন দেখিবার সাধ এত দিনে পুড়িয়া ছাই হইল।"

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৭।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মাকৃবেথের প্রাসাদ সম্মুখস্থ ডন্‌সিনেনের নিকট সিওয়ার্ড, মাকুডফ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে, রণবাদ্য সহকারে মালকোম্ সমর সজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন। কে কোন দিকে যুদ্ধ করিবেন, মালকোম্ তাহারই বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সপ্তম দৃশ্যে সমরক্ষেত্রের অন্য স্থলে শত্রু সৈন্য বেষ্টিত মাকৃবেথ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মাকৃবেথ এখন সূক্ষ্ম আশা সূত্রে জীবন ধারণ করিয়া আছে। সেই সূত্রটি বার বার পরীক্ষা করিতেছে; বলিতেছে "রমণীর জঠর-প্রসূত নহে—এমন কি কেহ কখন হইতে পারে? তা কখনই হইতে পারে না—তবে আমি আবার কাহাকে ভয় করিব?" মাকৃবেথ ভয় ভরসায় এইরূপ তোলাপাড়া করিতেছে—এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষ সিওয়ার্ডের পুত্র যুবক সিওয়ার্ড যুদ্ধার্থ মাকৃবেথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবা সিওয়ার্ড। কহ—তোমার কি নাম ?

মাক্‌বেথ। শুনিলে পাইবে ত্রাস।

যুবা। দানব রাক্ষস যক্ষ—ভয়ঙ্কর নামে,
আরো ভয়ঙ্কর হ'লে—না ডরিব আমি।

মাক্‌বেথ। মাক্‌বেথ নাম মম—

যুবা। সয়তান্ কোন নাম না পারে বলিতে,
তব নাম হ'তে আরো অধিক ঘৃণেয়।

মাক্‌বেথ। --কিম্বা অধিক ভয়াল।

যুবা। মিথ্যা কহ তুমি—বীভৎস্য ব্যধিপ !
সাক্ষী এই করবাল—মিথ্যা কহ তুমি।

[দ্বন্দ্ব করবাল যুদ্ধে—মাক্‌বেথ কর্ত্তৃক যুবা সিওয়ার্ড হত হইল।]

মাক্‌বেথ। নারী গর্ভ-সৃত তুই !
নারী গর্ভজাত ব্যক্তি ধরিলে আয়ুধ—
খড়্গো হাসি, অন্য অস্ত্রে উপহাসি আমি।

(নিষ্ক্রান্ত)

মাক্‌বেথ ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই শেষ সূত্র এখনও ধরিয়া আছে। যুবা সিওয়ার্ডের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে সেই সূত্রের পরীক্ষা করিল। সিওয়ার্ড যুবক, নির্ভীক, উৎসাহী, সাহসী ছিল, কিন্তু হইলে কি হয়? মাক্‌বেথ যতক্ষণ সূত্র ধরিয়া আছে, তখন কে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে ? তরঙ্গে তৃণের মত যুবা নষ্ট হইল—মাক্‌বেথ উপহাসে বীভৎস হাসি হাসিতে লাগিল।

রণ-রঙ্গ-স্থলের অন্যত্র—সুষুপ্ত সৈন্যসহ পাণ্ডব-শিশু-পঞ্চকের হত্যাকারী অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে উন্মুখ, ব্রহ্মাস্ত্র বিক্ষেপে উদ্‌যুক্ত, অর্জ্জুনের মত-মাক্‌ডফ্ অকাল-নষ্ট আত্মীয়গণের শোক স্মৃতিতে উত্তেজিত হইয়া, দারুণ প্রতি বিধিৎসায় প্রেরিত হইয়া, গভীর গর্জ্জনে মাক্‌বেথের অন্বেষণে, ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন। এখন তাঁহার একমাত্র ভাবনা, পাছে মাক্‌বেথকে অন্য কেহ বধ করে ; তাহা হইলে তাঁহার পুত্র কলত্রের প্রেতাত্মাগণ চিরদিন তাঁহাকে ধিক্কার দিবে! মাক্‌ডফ্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—মাক্‌বেথ ভিন্ন অন্য কাহারও উপর তিনি অস্ত্র চালনা করিবেন না। এখন অদৃষ্টের নিকট মাক্‌ডফ্ কেবল এই মাত্র ভিক্ষা চাহিতেছেন যে তিনি যেন জীবন্ত মাক্‌বেথকে একবার তাঁহার সম্মুখে পান, তাঁহার অন্য প্রার্থনা নাই।

এ দিকে মাক্‌বেথের প্রাসাদ দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, মাক্‌বেথের অনুচরেরা অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। জয়শ্রী যে মাল-কোম্‌কে আশ্রয় করিবেন, তাহাও একরূপ নিশ্চয়। সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধ সিওয়ার্ডের পরামর্শ মত। মাল্‌কোম্‌ প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সপ্তম দৃশ্য শেষ হইল।

মাক্‌বেথ নাটকের শেষ দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অন্যত্র। মাক্‌বেথ বুঝিয়াছে যে, এ সংগ্রামে তাহার আর জয়ের আশা নাই, তবু মাক্‌বেথ আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল; ভাবিল,—আপন শরীরে আঘাত করা অপেক্ষা পরদেহে অস্ত্রাঘাত ভাল। প্রতিবিধিৎসায় প্রতিজ্ঞাত মাক্‌ডফ্‌ সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন—

"আয়! নরক-কুক্কুর! আয় তোরে দেখি" মাক্‌বেথ বলিলেন—"মাক্‌ডফ্‌ বৃথায় উদ্যম তব, আমি বর পাহিয়াছি—রমণীর জঠর-প্রসূত ব্যক্তিরা আমায় কেহ কিছু করিতে পারিবে না।" মাক্‌ডফ্‌ বলিলেন, "বর্ব্বর! তাহাতে তোর অব্যাহতি নাই। মাতৃকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া অকালে আমাকে নিষ্কাশিত করা হয়, আমি প্রসূত হই নাই।"

তখন মাক্‌বেথ, মাক্‌ডফ্‌কে অভিসম্পাত করিলেন, ডাকিনীগণের উপর গালি পাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, 'কেহ যেন ঐ সকল প্রতারিকা প্রেতিনীদের বিশ্বাস না করে—উহারা দ্ব্যর্থ-বাচক প্রহেলিকায় আমাদিগকে বিড়ম্বিত করে—তাহাদের প্রতিজ্ঞার সুর আমাদের কাণে লাগিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে আশায় নিরাশ হইতে হয়।'

ভাল—মাক্‌বেথ তুমি সত্যসত্যই কি প্রেতিনীদের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলে? যদি সত্যসত্যই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলে যে তুমি ভাগ্যবলে স্কটলণ্ডের রাজা হইবে, তবে ডঙ্কানকে হত্যা করিবার তোমার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? যদি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, তোমার পরে বাঙ্কো বংশীয়েরা স্কটলণ্ডের রাজা হইবেন, তবে ফ্লিয়ান্সকে বধ করিবার জন্য ঘাতুক নিযুক্ত করিয়াছিলে কেন? না, মাক্‌বেথ তুমি আসন্ন-কালেও আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছ। মানুষ আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে বিশ্বাস অবিশ্বাস করে। প্রেতিনীরা—বাঙ্কো এবং তুমি—তোমাদের উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়াছিল; কিন্তু তুমি স্বীয় দুরা-কাঙ্ক্ষাময়ী প্রকৃতির বশে আর তোমার তদ্রূপ দুরাকাঙ্ক্ষাময়ী প্রবৃত্তির উত্তেজ-

নায়, অতি গুরুতর মহা মহা পাপে পাপী হইয়াছ—আর সেই বাঙ্কো নিষ্পাপ শরীরে তোমারই প্রেরিত ঘাতুকগণের হস্তে পরলোকগত হইয়াছে। তুমি দুরাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই দুরাকাঙ্ক্ষা-রূপিণী প্রেতিনীরা তোমার উপর বল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস—বিশ্বাস ত তুমি তাহাদের কর নাই। বিশ্বাস করিলে—তুমি নরঘাতী, গুপ্তঘাতী, রাজদ্রোহী, নারীঘাতী, শিশুঘাতী হইবে কেন? মানুষ আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে, আপনার গরজের মত করিয়া, অনেক বিষয়েই খানিক বিশ্বাস, খানিক অবিশ্বাস করে। সেই অৰ্দ্ধ বিশ্বাসই অনেক অনর্থের মূল। ঐ যে বর্ষীয়ান্ এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন "হায়! হায়! আমার সহোদরকে বিশ্বাস করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইল।" আমার বিনীত জেরা সওয়ালের উনি সরল উত্তর দিলে, আমি দেখাইতে পারি যে, উনি স্বীয় সহোদরকে পুরা বিশ্বাস একদিনের তরেও করেন নাই—অৰ্দ্ধ বিশ্বাস করিয়াছিলেন মাত্র। মাক্‌বেথ তুমিও বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাস পুষিয়াছিলে। পাপের ধর্ম্মই এই যে, পাপ কখন কাহাকেও পুরা বিশ্বাস করিতে পারে না। যে প্রেতিনীদের ভবিষ্যদ্বচনে তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা ইন্ধন পাইল, কৈ তুমি তাহাদিগকে ত পুরা বিশ্বাস করিতে পারিলে না?—যে পিশাচীর প্রেরোচনায় রাজহত্যায় লিপ্ত হইলে, কৈ বাঙ্কো ফ্লিয়ান্সের হত্যাব্যাপারে—তাহাকেই বা বিশ্বাস করিতে পারিলে কৈ? পাপী—দেব দৈত্য পুত্র কলত্র—কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপে অবিশ্বাসের পরিমাণ বুঝা যায়, অবিশ্বাসে পাপের পরিমাণ জানা যায়; ও দুটায় বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

পাপে বিশ্বাসের যেমন সঙ্কোচ হয়, বিশ্বাস যেমন খণ্ডীকৃত হয়, তেমনই পাপের ভরে বুদ্ধিবৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি হয় না। যে মূর্ত্তি মাক্‌বেথকে বলে যে, "বর্ণাম জঙ্গল ডন্‌সিনেনে না আসিলে তোমার পরাজয় নাই," সেই মূর্ত্তির হস্তে একটি বৃক্ষ-শাখা ছিল। মাক্‌বেথ কেবল তাহার কথাই কাণে লইল, তাহার ভাব-ভঙ্গি বুঝিবার চেষ্টা করিল না। চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিত যে, জঙ্গল চলিয়া আসা অসম্ভব নহে। তাহার পর যে মূর্ত্তি তাহাকে বলিল, যে "নারী-জঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না"—সে মূর্ত্তি রক্তাক্ত বালক মূর্ত্তি। মাক্‌বেথ তাহারও আকার ইঙ্গিত বুঝিল না। বুঝিল না, যে বালক প্রসূত না হইয়াও অস্ত্ররূপে নিষ্কাশিত হইতে পারে। বুঝিবে কে? যে পাপভরে বিভোর তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না। পাপী কেবল

আপনার ভালর দিকই দেখিতে পায়—আপনার মন্দের দিক দেখিবার বুদ্ধি তাহার ক্রমেই লোপ পায়; শেষে একেবারে মন্দের মধ্যস্থলে আসিয়া ডুবিয়া যায়। ঐ দেখ ব্রহ্মরাক্ষস রাবণের দশমুণ্ড লঙ্কার বেলাভূমিতে লুটাইতেছে; ঐ দেখ ভীম-শিশুর মস্তক হস্তে মান-ধন দুর্য্যোধনের হর্ষ-বিষাদে মৃত্যু হইল, ঐ দেখ সেণ্টহেলেনার পাতালপুরে ক্ষিপ্ত সিংহ কি ভয়ানক অথচ হৃদয়ভেদী মৃত্যু-গর্জ্জন করিতেছে—আর ঐ দেখ যে মাকৃবেথ এক দিন স্বীয় অতুল সাহসে অসীম প্রতাপে নরওয়ের অযুত যোধ নষ্ট করিয়াছিল, আজি সেই মাকৃবেথ মাকৃডফের 'জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া, সম্মুখ-যুদ্ধার্থী সেই মাকৃডফকে সচ্ছন্দে বলিতেছে—"আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

মাকৃডফ। "কাপুরুষ! যুদ্ধ করিবি না, ত আত্মসমর্পণ কর্। মোটা খোঁটার উপর পিঁজরায় পূরিয়া তোকে রাখিয়া দিব, লোককে দেখাইব, নীচে লিখিয়া রাখিব, 'এইখানে দুরন্ত দুর্বৃত্তকে দেখিতে পাইবে।'

তখন মাকৃবেথ বলিল 'আমি আত্মসমর্পণ করিব না—আর তোমাকে অস্ত্র সম্বরণ করিতেও বলিব না।' তখন যুদ্ধ করিতে করিতে দুই জনে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ওদিকে জয়বাদ্য বাজাইয়া বিজয়-নিশান উড়াইয়া মালকোম্ বৃদ্ধ সিওয়ার্ড, রস্ প্রভৃতি আসিতেছেন—সিওয়ার্ডকে রস্ ধীরে ধীরে বলিলেন—তাঁহার পুত্র সম্মুখ সমরে হত হইয়াছেন—তাঁহার শরীরের পুরোভাগ শত্রুঅস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু পশ্চাদ্দেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। বৃদ্ধ শোকে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—'তবে ভগবান তাহাকে নিজ সেনা করিয়া লউন—যদি আমার সহস্র পুত্র থাকিত, এবং সকলেই ঐরূপে হত হইত তা হইলেও আমি আনন্দিত হইতাম।'

মালকোমে বৃদ্ধ সিওয়ার্ডে কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মাকৃবেথের ছিন্নমুণ্ড সঙ্গীনে গাঁথিয়া লইয়া মাকৃডফ প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "জয় মহারাজকি জয়! এখন আপনিই মহারাজ; এই দেখুন রাজ্যাপহারীর মস্তক কোথায় রহিয়াছে।"

তা ত দেখিতেছি, মাকৃবেথের জড়-মুণ্ড তোমার সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া নিশ্চল ত্রস্ত চক্ষুতে চাহিয়া রহিয়াছে; তা ত বেশ দেখিতেছি—কিন্তু তাহার চক্ষু কর্ণ মুখবিবর,—হস্তপদ, অস্থি পঞ্জর—ছাড়া যদি আরও কিছু থাকে, তবে সেই আরও কিছুর কি গতি হইবে—মাকৃডফ তুমি তাহা বলিতে পার কি? এরূপ

আশ্রিত সুপ্তের গুপ্ত হত্যাকারী মানবের, এরূপ উপকারী আত্মীয় রাজার হত্যাকারী প্রজার, এরূপ বন্ধু-বধ-কারী বান্ধবের এবং এরূপ নিরাশ্রয় শিশু নারী হত্যাকারী রাজার,—হস্তপদ, অস্থি-পঞ্জর ব্যতীত যদি ভিতরে আরো কিছু থাকে—তবে তোমরা কেহ বলিতে পার—যে, সেই আরো-কিছুর কি গতি হইবে? আচ্ছা বলিতে পার আর নাই পার—ভাবিতে ত পার, আপাতত ভাবিলেই যথেষ্ট।

তথন মাক্‌বেথের সেই ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া মাক্‌ডফ্ মাল্‌কোম্‌কে উচ্চ রবে অভিবাদন করিলেন, "জয় স্কট্‌লাণ্ড-রাজকি জয়!" সকলে বলিয়া উঠিল—'জয় স্কটলাণ্ড-রাজকি জয়!" তথন মাল্‌কোম্ অধিরাজ রূপে সকলের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। উপস্থিত সৈন্য সামন্ত সকলকে নতশিরে অভিবাদন করিলেন এবং অভিষেক স্থলে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নাটক সমাপ্তি করিলেন।

আমরাও এই সমালোচনার শেষার্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ হামলেট সমালোচনায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছি এবং দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষ্মীমন্ত ইংরাজির একখানি মহানাটকের এরূপ বিস্তৃত সমালোচনা যাঁহারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নতশিরে বড়ই আহ্লাদে আজি অভিবাদন করিতেছি।

নাটকের গল্প।

৩।

চন্দ্রহাস।

চন্দ্রহাস কেরল দেশের রাজপুত্র। তাঁহার জন্মের অতি অল্পকাল পরেই, শত্রু পক্ষ কেরল রাজ্য আক্রমণ করে। রাজা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন; রাজ্য শত্রু হস্তগত হইল। একজন ধাত্রী চন্দ্রহাসকে লইয়া পলায়ন করিল, কুতলক রাজপুরে আসিয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করত চন্দ্রহাসকে লালনপালন করিতে লাগিল। চন্দ্রহাসের তিন বৎসর

বয়সের সময় ধাত্রীর মৃত্যু হইল, পুরবাসীরা চন্দ্রহাসকে বড় ভাল বাসিত, এখন লালনপালন করিতে লাগিল। চন্দ্রহাসের পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, কুতলক রাজ মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির যজ্ঞে সমাহূত বহুতর ঋষি মুনি চন্দ্রহাসকে দেখিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধিকে বলেন, "এই বালক অতি সুলক্ষণাক্রান্ত, তবে ইহার রাজপদ প্রাপ্তি না হইতে পারে, কিন্তু বহু সম্মানিত রাজমন্ত্রীত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবে। ইহাকে ভালরূপে প্রতিপালন করিও।"

হিতে বিপরীত হইল; মন্ত্রী কোথায় চন্দ্রহাসকে সুপালন করিতে আদিষ্ট হইল, কোথায় সে ধৃষ্টবুদ্ধি, এ 'আমার পদলাভ' করিবে, অতএব এ আমার শত্রু, এইরূপ বিবেচনা করিয়া চন্দ্রহাসের বিনাশার্থ চণ্ডালদিগকে আদেশ করিল। চণ্ডালগণ স্নেহ পরবশ হইয়া, চন্দ্রহাসের একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলী ছিল, সেইটি মাত্র ছেদন করিয়া লইয়া চন্দ্রহাসকে বনে পরিত্যাগ করিয়া গেল। চন্দ্রহাসের অতিরিক্ত অঙ্গুলি থাকিলে, বিকৃতাঙ্গ বলিয়া, কখন রাজপদে বসিতে পাইতেন না, এখন অঙ্গুলি ছেদনে সে অন্তরায় দূরীকৃত হইল। অহিতে হিত হইল।

ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেই বন প্রদেশের অধ্যক্ষ—কুলিন্দ মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়াছিলেন, রোরুদ্যমান চন্দ্রহাসকে অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া লইয়া গেলেন। আপনার সহধর্ম্মিণী মেধাবিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন; দম্পতি অপুত্রক—চন্দ্রহাসকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহাস সুপণ্ডিত, মহাবীর এবং হরি পরায়ণ হইলেন। যথাকালে কুলিন্দ তাঁহাকে স্বীয় নগরী চন্দনাবতীতে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। চন্দ্রহাস স্বীয় রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, কেহ যেন একাদশী দিনে উপবাস ভঙ্গ না করে।

কুলিন্দককে কুতলক রাজসকাশে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইত। চন্দ্রহাস সেই কর ও অন্যান্য উপহার সম্ভার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূতেরা একাদশী দিনে কুতলক পুরে উপনীত হইল; ধৃষ্টবুদ্ধি দ্রব্যজাত গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া কুলিন্দ কিঙ্করগণকে সুচারু অন্ন পানাদি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা একাদশীতে আহার করিতে অসম্মত হইল। ধৃষ্ট বুদ্ধি অবমাননা বোধ করত মনে মনে রোষাবিষ্ট হইল।

আবার হিতে বিপরীত। কুলিন্দের উপহার আয়োজনে কোথায় সন্তুষ্ট হইবে,—না ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল; কিঙ্করগণের হরি-বাসর-ব্রত-পরায়ণতায় কোথায় প্রীত হইবে, না সে রোষাবিষ্ট

হইয়াছিল—সুতরাং ধৃষ্টবুদ্ধি যুগপৎ রোষ হিংসা পরবশ হইয়া কুলিন্দকে নির্য্যাতন মানসে স্বয়ং রাজার আদেশ লইয়া চন্দ্রবাবতী যাত্রা করিল। স্বীয় পুত্র মদনকে কার্য্যভার দিয়া গেল। কুলিন্দের মুখে তাহার বন মধ্যে চন্দ্রহাস প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির সন্ত্রাস হইল; মনে ভাবিল, এই সেই বালকই হইবে; অতএব ইহার নিধন সাধন করা অচিরাৎ কর্ত্তব্য।

'অতি গূঢ় বিষয়ের সংবাদ বিশেষ বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আমার পুত্রের নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজন হইয়াছে' এই বলিয়া চন্দ্রহাসকে মদনের নিকট প্রেরণ করিল। চন্দ্রহাসের হস্তে মদনের নামে এক পত্র দিল—তাহাতে লিখিয়া দিল—'এই চন্দ্রহাসই আমার বিষয় ধনের ভাবি অধিকারী হইবার কথা। অতএব ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল পরাক্রম—কোন বিষয়েই দৃষ্টি না করিয়া, কোন দ্বিধা না করিয়া, ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। তাহা হইলে আমরা উভয়েই কৃতার্থ হইব।'

চন্দ্রহাস পত্রী লইয়া অতি ত্বরায় কুন্তলপুরে আগমন করিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, ক্রীড়া সরোবর তীরে শয়ান হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা বিষয়া সেই স্থলে আসিয়া চন্দ্রহাসের রূপে মুগ্ধা হইলেন; বসন-স্খলিত পত্রী পাঠে বিষণ্ণা হইলেন—শেষে পত্র মধ্যে দুইটি অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজিত করিয়া 'বিষয় ধন' স্থলে 'বিষয়া-ধন' এবং 'বিষ প্রদান' স্থলে 'বিষয়া প্রদান' করিয়া দিয়া—পত্র পূর্ব্বাবস্থ ভাবে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন শুভলগ্নে মদন স্বীয় ভাগিনী বিষয়াকে চন্দ্রহাস করে যথা-শাস্ত্র-রীতি সমর্পণ করিলেন।

ওদিকে ধৃষ্টবুদ্ধি কুলিন্দকে নিগড় নিবদ্ধ করিয়া, অতি দ্রুতযানে কৌতলক পুরে প্রত্যাগমন করিলেন; দেখিলেন, পুরী উৎসবময়ী, শুনিলেন মদন চন্দ্রহাসের সহিত বিষয়ার বিবাহ দিয়াছে, পুত্রকে বলিলেন, 'বর্ব্বর কি করিয়াছ?' মদনউৎসবের কিছু ত্রুটি হইয়াছে বোধে বলিলেন "সময়ের স্বল্পতা-নিবন্ধন সমারোহের আয়োজন করিতে পারি নাই, তবে যতদূর সম্ভব তাহাই করিয়াছি"—ধৃষ্টবুদ্ধি আপনার পত্র আনয়ন করিতে বলিলেন, পত্রে বিষয়া প্রদানের কথা সুস্পষ্ট দেখিলেন; আপনারই ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া নীরবে রহিলেন। বিষয়া বিধবা হয় হৌক, তথাপি চন্দ্রহাসকে নষ্ট করিতে হইবে ইহাই স্থির করিলেন।

মনে মনে একটা কৌশল স্থির হইল। নগরের বাহিরে বনমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির ছিল, সেইখানে দুইজন ঘাতুককে বিশেষ ধনলোভ দেখাইয়া এই বলিয়া পাঠাইয়াদিলেন, 'অদ্য সন্ধ্যার পর কেহ প্রণামার্থ চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হইলে, তোমরা তাহার শিরচ্ছেদ করিও, ইতস্তত করিও না।' তাহারা আদেশমত চণ্ডীমন্দির মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

পরে ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বুঝাইয়া দিল যে, 'কুলপ্রথানুসারে নবজামাতার চণ্ডী বন্দনা একান্ত আবশ্যক। অদ্যই বনচণ্ডীকে সন্ধ্যার পর বন্দনা করিয়া আসিবে।' চন্দ্রহাস শ্বশুরের আদেশমত একাকী পুষ্পচন্দনাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় চণ্ডীপূজায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মদনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; মদন বলিলেন, "আমি পুষ্পচন্দনাদি লইয়া দেবীমন্দিরে যাইতেছি, আপনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসুন, আপনাকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন।" মদন দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঘাতুকেরা তাঁহার শিরচ্ছেদন করিল।

এদিকে চন্দ্রহাস রাজ-সকাশে অভূতপূর্ব্বরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়া গজপৃষ্ঠে মন্ত্রীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মন্ত্রী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ তুমি বন-চণ্ডীকে প্রণাম করিতে যাও নাই?" চন্দ্রহাস বলিলেন "আমি আপনার আদেশমত যাইতেছিলাম, মদন বলিলেন 'মহারাজ আহ্বান করিয়াছেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসুন, আমি পুষ্পচন্দন লইয়া অগ্রসর হইতেছি।'" মন্ত্রী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি মদন দেবীমন্দিরে গমন করিয়াছে?" চন্দ্রহাস বলিলেন, "হাঁ গিয়াছেন।" তখন মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—"যে পরের জন্য গর্ত্ত খনন করে, সে নিজেই তাহাতে পতিত হয়।"

মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ঐ কথা বলিতে বলিতে বনাভ্যন্তরে দেবীমন্দিরে উপনীত হইলেন—দেখিলেন, ছিন্ন-পশু-বলিবৎ তাঁহার পুত্র মদন দ্বিখণ্ডীকৃত দেহে পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি শোকে দুঃখে মর্ম্মর স্তম্ভে মস্তক আস্ফালন করিতে লাগিলেন; তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল।

* * * * * *

চন্দ্রহাস কুন্তলকপুরে রাজা হয়েন। তিনি অতীব হরিপরায়ণ ছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষার্থ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হয়। মহাভারতে এই গল্প আছে; কাশীরাম দাস তাহার মর্ম্মানুবাদ করেন। জৈমিনি ভারতে এই গল্পের বিস্তৃত বাদ আছে।

হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে এবং তাহার বঙ্গানুবাদেও এই গল্প আছে—বীণা-রঙ্গভূমির জন্য শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় এই গল্প নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। আমরা জৈমিনি ভারতের বঙ্গানুবাদ হইতে গল্পটি প্রধানত লইলাম; কাশী-দাসে ও ভক্তমালে এই গল্পের বিভিন্ন আকার আছে; কিন্তু মূল কথা এক—দুর্জ্জনের হিতে বিপরীত—সজ্জনের বিপরীতে হিত।

ভক্তমাল গ্রন্থোক্ত চন্দ্রহাসের বিবরণ।

এক রাজপুত্র, তার চন্দ্রহাস নাম।
বিপদ কালেতে লইয়া রাখে অন্য ধাম॥
অন্য সেই দেশাধিপ রাজার দেওয়ান।
শিশু লইয়া ভেট দিল নৃপতির স্থান॥
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজ ঘরে।
দাসী পুত্র ন্যায় থাকে, নাহি সমাদরে॥
এক দিন রাজপুরে ব্রাহ্মণ ভোজন।
সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর।
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর॥
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মনে।
মোর কন্যা যোগ্য এই দাসীর নন্দনে?
এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে।
নীচগণে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে॥
স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপদে মতি।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি॥
শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে।
কৃষ্ণে যার মতি, তার কি করিবে আনে?
চন্দ্রহাস কহে মোরে দইবে মারিবে।
কিন্তু এক কথা মোর নেহারা রাখিবে॥
আঁখি মুদি মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব।
খড়্গ হানিবে, যবে শির হেলাইব॥
ইহা বলি কৃষ্ণপদে মন নিয়োজিল।
শির হেলাইয়া খড়্গ হানিতে কহিল॥

কৃষ্ণের করুণা মহা বলবান হয়।
আর্দ্র হইল নীচ গণের হৃদয়॥
কেহ বলে ছাড়ি দেহ, যাউক অন্যন্তরে।
মারিনু করিয়া ছল কহিব রাজারে॥
কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে।
অঙ্গুলী কাটিয়া লহ প্রতীত করিতে॥
বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলী ছিল।
বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলীর এক কাটি নিল॥
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর।
রাজা যোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলী নর॥
এই হেতু এক অঙ্গুলী তার কাটাইল।
পরে নৃপাসন যোগ্য ছলে করাইল॥
নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল।
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
ঐ রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য।
মৃগয়া করিতে গিয়া বেরিল অরণ্য॥
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক।
আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কতক॥
পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক।
আর কত দাস দাসী ধনাদি যতেক॥
আপোসেতে ভেট দিল প্রণয় পূর্ব্বক।
চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥
এই বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত।
পুন কোথা হইতে আইল একি অদ্ভুত॥
রাজা বুদ্ধিমান মনে বিচার করিল।
দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা।
বালক কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি।
কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি॥

সেইত রাজার কন্যা নাম তার বিখে।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে।
উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্র দ্বারে॥
পত্র লিখে পুত্রে, 'ইহ যে দণ্ডে যাইবে।
সেই ক্ষণে বালকেরে বিখ্ সমর্পিবে॥'
পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি।
উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্র গতি॥
পত্রী নিয়া শীঘ্র দিলা রাজপুত্র স্থানে।
পত্রী পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে॥
সুন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে।
রাজা পাঠাইলা বিখে কন্যার কারণে॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেই ক্ষণ মাত্রে।
ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥
হরিভক্ত মহিমার কর্ম্ম কে জানয়?
বিষ দিতে বিখে মিলে এ বড় বিস্ময়॥
বর কন্যা গৃহে আইল মঙ্গলাচরণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা নিন্দয়ে আপনে॥
ছিছি ধিক ধিক মোর এ ছার জীবনে।
এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥
মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেন মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয়।
কন্যা রাঁড় হয় হউক, স্বীকার করয়॥
বিবাহের পরে দেবীপূজা কুল ধর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লইয়া শুভ কর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্র গণ সবে গেলা।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥

ভাল মন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মন বুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥
দেবীরে প্রণাম করিতে সবে কহে।
সেই তর্কে রাজদূত খড়্গা হস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়।
প্রতিমা ফাটিয়া উগ্ররূপে বাহিরয়॥
খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়ে যাই দেবী স্থানে।
আত্মঘাত করি তেয়াগয় নিজ প্রাণে॥
কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতএব বিঘ্নের বিঘ্ন হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি, সেহ এই মত॥
চন্দ্রহাস রাজ সিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিল রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া॥
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হৈয়া যেন জন্ম লই॥

মোগলের দরবারে বিদেশী ভ্রমণকারী।

মোগলসম্রাট আওরঙ্গজীব যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব ও ক্ষমতা যে সময়ে উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হয়, সে সময়ে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ একে একে ভারতে উপনীত হইতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বেও অনেকে ভারতে আসিয়া আপন আপন ভ্রমণ বিবরণ লিখিয়া স্বদেশীয়দিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনলস, একাগ্রতায় তৎপর, বর্ণনায় বৈচিত্র সম্পাদনে অগ্রসর ও

কল্পনার চাতুরী প্রদর্শনে উন্মুখ ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সকল ইউরোপীয় প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়া আপনাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তাহাদের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তাহারা আপনাদের সাহস ও আপনাদিগের বাহুবলের উপর নির্ভর কবিয়া অনেক স্থলেই অনেক দুরূহ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা এক হস্তে তরবারি, অন্য হস্তে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিয়া অসঙ্কোচে অবলীলায় আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের উদ্যম, তাহাদের একাগ্রতা ও তাহাদের জিগীষা কোন স্থলেই প্রতিহত হয় নাই। তাহারা নানা বিপত্তিপূর্ণ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, সমুদ্রপথে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছে। সমৃদ্ধ নগর সকল অধিকার করিয়াছে, এবং বলশালী ভূপতির সহিত তুল্যবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মমন্দির, তাহাদের আশ্রমগৃহ, মুসলমানের মস্‌জিদ ও হিন্দুর দেবমন্দিরের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা বিস্তার করিয়াছে। তাহারা অনেককেই আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং অনেককে আপনাদের সৈনিকদলে নিবেশিত করিয়া তাহাদিগকে রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিযাছে। অনেক ভ্রমণকারী তাহাদের দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। অনেক সুবাদার তাহাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অধিপতিদিগের নিকট হইতে সনন্দলাভ করিয়াছে, এবং নানা স্থানে কর সংগ্রহের জন্য কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তাহাদের ক্ষমতা ও গৌরবের কাহিনী লোকের স্মৃতিতে জাগরুক ছিল। কথিত আছে, এই সময়ে একজন মোল্লা যুবক আওরঙ্গজীবকে একজন প্রধাম পর্ত্তুগিজ ভূপতির গল্প বলিয়া আমোদিত করিতেন। বিদেশীয়দিগের এই গৌরবকাহিনী ভারতের এই শেষ গৌরবান্বিত মোগল সম্রাটের স্মৃতি হইতে কখন স্খলিত হয় নাই।

ভারতে পর্ত্তুগীজ জাতির এইরূপ গৌরব কাহিনী শুনিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিতে উদ্যত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকে আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির বা ভূয়োদর্শন লাভের আশায় ভারতের উপকূলে পদার্পণ করিতে থাকে। এই সকল ভ্রমণকারীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্বভাবে ও কার্য্যে এই উভয় শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে উভয়ের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। এক দল ইউরোপীয়—সমাজের অতি ঘৃণার পাত্র ও

মানব জাতির অতি অপকৃষ্ট অংশের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহারা সমাজে নানা প্রকার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, বিধি ব্যবস্থার অবমাননা করিয়া নানা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, অবশেষে ফাঁসি কাষ্ঠ বা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের শোচনীয় জীবনে আপনারাই পরিতপ্ত হইয়াছে, তাহারাই দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মোগলের দরবারে বা আরাকানের ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায় দেখিত। ইহাদের উদ্যম ও ইহাদের অধ্যবসায় একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহারা সাহসী, উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্য কুশল ছিল। যদি ইহারা অশ্বচালনায় দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারিত, কামান সকল সজ্জীভূত করিতে সক্ষম হইত, বন্দুকের গুলি লক্ষ্যে পাতিত করিতে কৌশল দেখাইতে পারিত, বা অন্য কোনরূপে আপনাদের সমর কৌশলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সম্রাটের দরবারে ইহাদের কখন অবমাননা হইত না। ইহাদের পরিচর্য্যার জন্য অনেক অনুচর নিযুক্ত হইত, আবাসের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গৃহ সকল সজ্জীভূত করা হইত। ইহারা বহু সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া সম্রাটের দরবারে বিশেষ সুখ ও সম্মানের সহিত কালাতিপাত করিত। ইহারা যে এক সময়ে আপনাদিগের জন্মভূমিতে উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল, বিলুণ্ঠনে, বিধ্বংসে বা বিপ্লবে আপনাদের বলবতী জিঘাংসায় পরিতর্পণে সাহসী হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ইহারা এখন পরিতপ্ত হইত না। ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ নাবিক, দস্যু, ও নরঘাতকেরা এইরূপে ভারতের মোগল দরবারে আসিয়া আপনাদের জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিল। স্বদেশে ইহাদের দুরাচারের কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বিদেশেও ইহাদের কার্য্য কলাপের কোন চিহ্ন থাকে নাই। ইহাদের দুর্দান্ত প্রকৃতির কথা লিপিবদ্ধ হইয়া ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করে নাই; উহা ইহাদের দেহের সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই শ্রেণী ব্যতীত আর এক দল লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, গবেষণার চরিতার্থতা এবং আপনাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য ভারতে সমাগত হইয়াছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসিরাও অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা সুশিক্ষিত সুব্যবস্থিত ও সৌম্য প্রকৃতি ছিলেন। ইউ-রোপের অনেক পণ্ডিত ও তত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মান করিতেন। এই

সকল পণ্ডিত ইঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি আগ্রহের সহিত পড়িতেন। কিন্তু ইহাদের যেমন ভূয়োদর্শিতা ছিল, বিচার শক্তি তেমন সূক্ষ্ম ছিল না। কৌতূহলপর লোকে ইহাঁদের নিকট যাহা কিছু বলিয়াছে, ইহারা তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। সুতরাং ইহাঁদের বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই অতিশয়োক্তিতে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইহাঁরা অনেক স্থলে এরূপ অতি-রঞ্জন-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন যে, ইহাঁদের লিখিত বিষয় কোন কোন স্থলে ঈসপের গল্প-মালাকেও অধঃকৃত করিয়াছে। অধিকন্তু ইহাঁরা ঘটনাবলীর তারিখ সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। স্থানের দূরত্বও সূক্ষ্মরূপে অবধারণে সমর্থ হন নাই। ইহাঁরা প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্থানের ও ব্যক্তির নাম এরূপ লিখিয়াছেন যে তাহাতে সার উইলিয়ম জোন্স এবং মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনও বিস্মিত ও বিব্রত হইতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণনা চিত্রকরের চাতুরীতে বা ঐতিহাসিকের যথার্থ-প্রিয়তায় মনোহারিণী হয় নাই! তাঁহারা এভাবে ভারতের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, যে উহাতে হুগলি একটা দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং রাজমহল বঙ্গ অখাতের উপকূলে শোভা পাইতেছে।

ভ্রমণকারীরা এইরূপে আপনাদের কল্পনাপ্রিয়তা বা অতিরঞ্জন-শক্তির পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক স্থলে অনেক বিবরণ জানিতে পারি। তাঁহারা অনেক সময়েই অনেক ঘটনা যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মোগলের দরবারে উপনীত হয়েন, আমরা এ স্থলে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। প্রথমে সর টমাস রো ভারতে উপনীত হয়েন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে সর টমাস্ ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমসের দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আইসেন। ইনি তদানীন্তন সময়ের ঘটনা সূক্ষ্মরূপে লিখিতে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। ইনি স্বয়ং যে ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন সে ভার বহনে তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইলে বিশেষ সূক্ষ্মদর্শিতার আবশ্যক। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়া নিজের ভূয়োদর্শিতা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু সর টমাসের এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও এরূপ ভূয়োদর্শিতা ছিল না। দরবারের প্রধান

প্রধান ওমরাহের সহিত ইহাঁর তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বে কি ঘটিয়া থাকে, তাহা ইনি সুক্ষ্মরূপে জানিতে পারেন নাই। সম্রাট আপনার সিংহাসনের উপরিভাগে প্রাচীরে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর, লেডী এলিজাবেথের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরক্টর জেনারলের প্রতিকৃতি রাখিয়াছিলেন। সম্ভবত সার টমাস্ রো এই সকল প্রতিকৃতি সম্রাটকে উপহার দেন। রো আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতে যে ইংলণ্ডের আধিপত্য বদ্ধমূল হইবে, তাহা আওরঙ্গজেবের এই কার্য্য হইতে বোধ হয় সূচিত হইয়াছিল।

এড্‌ওয়ার্ড টেরি ও কাপ্তেন ফকেন্স বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁরা সর টমাস রোর সমকালে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন। রো অপেক্ষা ইহাঁদের কর্ম্মক্ষমতা অধিকতর ছিল। কিন্তু শেষোক্ত ভ্রমণকারী আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রথম জনের লিখিত বিবরণ উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত নহে। ইহার বর্ণনা মনোহর ও বিষয়গুলি সুপ্রণালীতে বিন্যস্ত। এই সকল বিষয় জানিয়া বিশেষ আমোদিত হওয়া যায়।

চতুর্থ ভ্রমণকারী জন্ আলবর্ট মন্‌বেল্‌সো একটি প্রসিদ্ধ বংশে মাকবেলবর্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভ্রমণে প্রগাঢ় অনুরাগ বশত ইনি সুখ ও সম্পত্তি উভয়ই জলাঞ্জলি দেন। পারস্য, আরব প্রভৃতি স্থান হইতে এই ভ্রমণকারী সুরাটে পদার্পণ করেন। ইহাঁর সাহস ও উদ্যম কোথাও পর্য্যুদস্ত হয় নাই। ইনি সুরট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত গমন করেন। ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সমকালে যে তিন জন ভ্রমণকারী ভারতে সমাগত হন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক জ্ঞাতব্য ও আমোদকর বিষয়ে পরিপূর্ণ। এ অংশে অন্যান্য ভ্রমণকারীরা ইহাঁদের ন্যায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের এক জনের নাম জন্ বাপটিস্ত টেবারনিয়া। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে যাইয়া অত্রত্য রীতিনীতি ও ভাষা অবগত হন। স্বয়ং রত্নব্যবসায়ী হওয়াতে ইনি তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থলে যাইয়া রত্নাদি বিক্রয় করিতেন, ভারতের নবাবদিগের মধ্যে ইনি কিরূপে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়াছেন, সুরাট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত কিরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বর্ণিয়ারের সহিত বঙ্গের সমতল ক্ষেত্র ও জলাভূমি সকল কিরূপে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার

ব্যবসাবাণিজ্য কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তিনি কিরূপে রত্নাদি বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশদরূপে জানিতে পারা যায়।

অন্য ব্যক্তি ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত তপন-কর-বিভাসিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় ভূখণ্ডের অধিবাসী। ডাক্তার জন্ ফ্রান্সিস্ গেমেলিকাবিরে এই ভূখণ্ডের যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আলেখ্যবৎ রমণীয়তার জন্য চির প্রসিদ্ধ। ইতালীয়গণ প্রকৃতির এই প্রিয় নিকেতনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন ও পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য গেমেলি-কারিরে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তিন জনের মধ্যে ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তই অধিকতর বৈচিত্র্য-পূর্ণ। ইনি সরলভাবে সকল কথাই অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া বহুদর্শিতা উপার্জ্জন ভিন্ন ইহাঁর ভ্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা শুনি-য়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ক্রটি করেন নাই। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য পশু পক্ষীর বিবরণ, অধিবাসীদিগের রীতিনীতি, হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজ্যের শাসনপ্রণালী, পর্ত্তুগিজদিগের উন্নতি ও যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমু-দয়ের কথা—সমস্তই তাঁহার ভ্রণবৃত্তান্তে অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। এই চিত্র অনেক স্থলে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি হৃদয়াকর্ষক। কিন্তু তিনি বোধ হয়, সাতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, ইনি যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিতে বিমুখ হন নাই। ১৬৯৫ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইনি গোয়া হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

সর্ব্বশেষ ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার। এই ফরাসী ভ্রমণকারীর যেমন উৎসাহ ও একাগ্রতা, তেমনি সূক্ষ্মদর্শিতা, রহস্যপটুতা ও লোকরঞ্জনে শক্তি ছিল। ইনি সাধারণের এরূপ অধিগম্য ছিলেন যে, নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত অনেকে ইহাঁর বন্ধুমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। যাহা কিছু ইহাঁর সম্মুখে পতিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করিতে ইনি কষ্ট-স্বীকার করিতে বা অর্থব্যয়ে কাতর হন নাই। আওরঙ্গজেবের এক জন প্রধান পারিষদের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া ইনি দরবারের সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোন দরবারের কোন ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে ইহাঁর ন্যায় সুযোগ পাইয়া-

ছিলেন কি না সন্দেহ। ইনি অনর্গল উর্দ্দু বলিতে পারিতেন। পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে জানিতেন, এবং গোলেস্তার পদাবলী মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইহাঁর উদ্যম কোথাও প্রতিহত হয় নাই; মনের স্থিরতা কোথাও বিচলিত হয় নাই এবং বিচারশক্তি কোথাও অবনত হইয়া পড়ে নাই। ইতি বালেশ্বর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই চিত্র যথাযথ ভাবে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে উদাসীন হন নাই। ঘটনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বর্ণনায় ইনি বস্‌ওয়েলের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। গিবন্ ইহাঁর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং এল্‌ফিনষ্টন ইহাঁর উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় দুর্গম পথ অনেকাংশে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই তিন জন ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের অনেক কথা বিশদরূপে জানিতে পারা যায়।

কর্ণেল অলকট।

১

সুনীল আকাশে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা, গৌরবে-গর্ব্বিনী,
মার্কিনের অঙ্কে বসি ধ্যান রত,
হে শ্বেতর্ষি! তুমি দেখিলে কি, হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-দর্শন ধূয়ায়
যাইছে ছুটিয়া নিপাতের পথ!
শান্তি-সিন্ধুতীরে শ্বেতাঙ্গ ঈশান
বিষাণ ঝঙ্কারে কহিলে সম্ভাষি,—
"হায় মা! ফিরিয়া দেখ রাশি রাশি
"তারাময় তব অতীত বিমান।
"যোগীন্দ্র মহাত্মা, অমরেন্দ্রগণ
"হিমাদ্রি শেখরে ওই অগণন!

২

"দাঁড়াইয়া ওই নর-নারায়ণ,—
"পাঞ্চজন্য রবে পূরিয়া গগণ,
"কহিছে—ত্যজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নর!
লও একমাত্র আমার শরণ!"
ফিরিলা জননী; দেখিলা চাহিয়া
নক্ষত্র-খচিত আকাশ তাঁহার।
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া
ডুবা'য়ে পাশ্চাত্য ঝিল্লির ঝঙ্কার।
মৃতা ভারতেরে দিলে তুমি প্রাণ!
লও পাদ্য অর্ঘ ঋষি আয়ুষ্মান্।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

চতুর্থ ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্থ বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" উমেশচন্দ্র গুপ্ত
" কানাইলাল মিত্র
" কামিনীকুমার দাস
" কালীপ্রসন্ন দত্ত
" কুলচন্দ্র দে
" গঙ্গাচরণ সরকার
" গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
" গিরিশচন্দ্র বসু
" গোপালচন্দ্র চৌধুরী
" গোবিন্দচন্দ্র দাস
" চন্দ্রনাথ বসু
" চন্দ্রমোহন সেন
" চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
" জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি
" নবীনচন্দ্র সেন
" নিমাইচাঁদ শীল
" পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি ঘোষ
" প্রকাশচন্দ্র বসু
" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল গোস্বামী
" ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র
" মুক্তকেশী দেবী
" যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" রঘুনাথ দে
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" রামদাস হাজরা
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
" শরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি
" শরচ্চন্দ্র মজুমদার
" শশীভূষণ দে
" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সতীশচন্দ্র রায়
" সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
" সিদ্ধেশ্বর রায়
" হরচন্দ্র চৌধুরী
" হরিচরণ রায়
" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
" হারাণচন্দ্র রক্ষিত
" হারাধন মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ শাস্ত্রী

ও সম্পাদক।

কলিকাতা,

৫৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, অপূর্ব্ব কার্য্যালয় হইতে

শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১২৯৫।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সূচিপত্র।

—○—

গদ্য।

পদ্য।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } আষাঢ়, ১২৯৫। } ১২শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্॥ ২৫।

পদচ্ছেদঃ। তত্র, নিরতিশয়ং, সর্ব্বজ্ঞ, বীজম্।

পদার্থঃ। তত্র—তস্মিন্ ভগবতি, নিরতিশয়ং-নির্নাস্তি অতিশয়ঃ যস্মাৎ তৎ কাষ্ঠাপ্রাপ্তমিতি যাবৎ, সর্ব্বজ্ঞবীজং সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞত্বস্য অতীতানগতাদিগ্রহণস্য বীজং লিঙ্গং অনুমাপকোহেতুরিতি যাবৎ। কারণমিতি কেচিৎ।

অন্বয়ঃ। তত্র সর্ব্বজ্ঞবীজং নিরতিশয়মস্তীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। দৃশ্যতে হি অণুত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠা প্রাপ্তিঃ, যথা পরমাণাবণুত্বস্যাকাশে চ পরমমহত্ত্বস্য। এবং জ্ঞানাদয়োপি চিত্ত ধর্ম্মা স্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ কচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি যত্র জ্ঞানস্য কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। যে চৈতন্যরূপ পুরুষে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক জ্ঞান চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত সেই পুরুষ ঈশ্বর।

সমালোচন। পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা আপ্ত বচনানুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে অনুমান-রূপ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন। আমরা এস্থলে দর্শন শাস্ত্রের একটি রহস্য দেখিতেছি।

আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি বিষয়ে পতঞ্জলির মতন নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা ঋষিগণও অনুমানরূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের মত পরস্পর ঐক্য হইলেও

পতঞ্জলির অনুমানের রীতি তাঁহাদের অনুমানের রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের মতে ঈশ্বর সগুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন প্রভৃতি অনেক গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান; কাযেই তিনি স্বয়ং কর্ত্তা, আপনার ইচ্ছামত সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিতে সক্ষম। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নির্গুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। জগৎ কার্য্যের প্রতি তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি উদাসীন ভাবে উহার দ্রষ্টামাত্র। এরূপ স্থলে এই উভয়ের অনুমানের পদ্ধতি যে ভিন্ন হইবে, তাহা বড় বিচিত্র নয়।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা আছে; এই জগৎ যখন কার্য্য—তখন ইহারও অবশ্য একজন কর্ত্তা মানিতে হইবে;—সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর। পতঞ্জলির পক্ষে এই অনুমানটি খাটে না। কারণ যোগশাস্ত্র সাংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবিষ্ট; এই সাংখ্য সম্প্রদায়ে এত দিন ধরিয়া যে নিরীশ্বরতা দোষ ছিল, পতঞ্জলি এই ঈশ্বরাস্তিত্ব নিরূপক সূত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন মাত্র; এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্র সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাংখ্যেরা বলেন, কার্য্য মাত্রেরই এক একটি কর্ত্তা আছে সত্য এবং সেই জন্য এই জগৎ কার্য্যেরও একটি কর্ত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু সে কর্ত্তা প্রকৃতি। জগৎ কার্য্যের উপর একমাত্র প্রকৃতিরই যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা সাংখ্যাচার্য্যগণ বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সার মর্ম্ম এই "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতিই জগতে যাবদীয় কার্য্যের কর্ত্রী। তবে আত্মা কেবল অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল কার্য্যকে নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন। এই নিমিত্তই মহর্ষি কপিল মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, যদি জগৎ-কার্য্যের কর্ত্তৃত্বের জন্য ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" সেরূপ ঈশ্বর না মানিলে কোন ক্ষতি নাই, যে হেতু প্রকৃতিই জগৎ কার্য্যের কর্ত্তা।

মহর্ষি পতঞ্জলি নিজের সাংখ্য সাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন অথবা কপিলের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই বাক্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিতেছে না, তাহাই বুঝাইতেছেন। তিনি বলেন জগৎ কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়াই যে ঈশ্বর নাই এমন কথা বলিও না, কারণ আমরা অন্য প্রকারেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান করিতে পারি। তাহা এই—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্।" এই অনুমান বা তর্কটিকে বিশদ করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে আর একটি অনুমান

বা তর্কের অবতারণা করিতে হইবে। যথা—আমরা ইহ জগতে যে সকল বস্তুর তারতম্য অর্থাৎ স্থল বিশেষে আধিক্য বা নূন্যতা দেখিতে পাই, তাহারা যে এক স্থলে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন অণু-পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে পরমাণুতে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর কিছুই নাই। এইরূপ মহৎ পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে আকাশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ আকাশ হইতে মহৎ আর কিছুই নাই। এক্ষণে দেখ সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞান একটি তারতম্যতাবিশিষ্ট বস্তু বা ধর্ম্ম; কেননা পুরুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু পরিমাণে সর্ব্বজ্ঞতা লক্ষিত হয়; কিন্তু সকলের সমান নয়, রাম অপেক্ষা শ্যামের জ্ঞান কিছু বেশি। আবার শ্যাম অপেক্ষা যাদবের আরও অধিক; কেবল তা নয়, একা রামেরই বাল্যকালের জ্ঞান একরূপ অস্ফুট, যৌবনে তাহা অপেক্ষা স্ফুট, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তদপেক্ষাও পরিণত হয়, অতএব এই জ্ঞান যে কোন স্থানে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে স্থানে এই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর।

পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখ, মহর্ষি পতঞ্জলি কিরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য-বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধিবিষয়ে এই নূতন অনুমানের আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহাতে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তিত প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রহিল অথচ তাঁহাদের নিরীশ্বরতাপবাদ দূর করা হইল; ইহাই যথার্থ চাতুর্য্য। ভাষ্যকার বলেন, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা সংসারপতিত ভূতগণের উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য সেইরূপ সম্পূর্ণরূপ সর্ব্বজ্ঞতা পূর্ণ পুরুষের স্থিত আবশ্যক।

এই নিমিত্তই—ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।

ব্রহ্মাদিরও সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা নাই, কাযেই তাঁহারা ঈশ্বর হইতে পারেন না।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬

পদচ্ছেদঃ। পূর্ব্বেষাং, অপি, গুরুঃ, কালেন, অনবচ্ছেদাৎ।

পদার্থঃ। স পূর্ব্বোক্তঃ, এষ ঈশ্বরঃ পূর্ব্বেষাং পূর্ব্ববর্ত্তিনাংসর্গাদ্যুৎপন্নানাং অপি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদীনাং, গুরুঃ। অন্তর্য্যামী বিদ্যয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদশ্চ

উপদেষ্টা, কালেন, সময়েন ন অবচ্ছিদ্যতে ইত্যনবচ্ছেদঃ তস্মাৎ অনাদিত্বাদিত্যর্থঃ।

অন্বয়ঃ। কালেন অনবচ্ছেদাৎ স পূর্ব্বেষামপি গুরুর্ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। স কালাতীতঃ অনাদিস্ততশ্চ সৃষ্টে রাদৌউৎপন্নানাং রক্ষাদীনাং দেবানামৃষীণাঞ্চ উপদেষ্টা তাদৃশং কালানবচ্ছিন্নং গুরুং ব্রহ্মাদীনাং জ্ঞাতৃত্বা সম্ভব ইতি ভাবঃ। ক্বচিৎসূত্রে এব ইতি পাঠোনাস্তি।

অনুবাদ। সেই পরমেশ্বর কালাতীত অর্থাৎ কোনরূপ কাল পরিমাণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতির ইয়ত্তা করা যায় না, অতএব তিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণের জ্ঞান উপদেষ্টা গুরু।

সমালোচন। সেই ঈশ্বর অমুক সময়ে এত ঘণ্টা বেলার সময় উৎপন্ন হইয়াছেন, এত কাল অবস্থিতি করিবেন এবং অমুক সময়ে তাঁহাব ধ্বংস হইবে। ইত্যাদি প্রকার কাল কৃত ইয়ত্তা তাঁহাতে নাই। অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাবা আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা গুরুস্বরূপ। ভাষ্যকার বলেন, কেবল যে বর্ত্তমান সর্গের প্রথমে উৎপন্নদিগের গুরু তাহা নহে, যে সকল অনন্ত সর্গ হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল অনন্ত সর্গ উৎপন্ন হইবে, সে সকলের প্রথমোৎপন্ন দিগেরও তিনি জ্ঞানোপদেষ্টা।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ২৭।

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টং।

পদার্থঃ। তস্য ঈশ্বরস্য, বাচকঃ অভিধায়কঃ প্রণবঃ প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তেঽনেনেতি প্রণবঃ ওঙ্কারঃ।

অন্বয়ঃ। প্রণবঃ তস্য বাচকো ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বরস্য বাচকঃ, প্রণবঃ, প্রণবস্য তু বাচ্য ঈশ্বরঃ। তয়োশ্চ বাচ্যবাচকভাবলক্ষণ সম্বন্ধো নিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রকাশ্যতে, নতু কেন চিৎ ক্রিয়তে। যথা পিতৃপুত্রয়ো র্বিদ্যমানঃ সম্বন্ধোঽস্যায়ং পিতা, অস্যায়ং পুত্র ইতি কেন চিৎ প্রকাশ্যতে। অতএবাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ।
তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতোনাম তেনাহূতঃ প্রসীদতি॥"

অদৃষ্টবিগ্রহোঽস্ফুট শরীরো দেবঃ পরমাত্মা, ভাবগ্রাহ্যো ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যো,

মনোময়মনস্তল্য কারণোপাধিশবলঃ, তস্য নাম ওঙ্কারঃ স্মৃত ওঙ্কারেণ সহ তস্য বাচ্যবাচকভাবো নিত্য ইত্যর্থঃ, তেন ওঙ্কারেণ আহূতঃ সন্ প্রসীদতি কর্ত্তব্য বিচারোপযোগিনমর্থং পূরয়তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সেই ঈশ্বরের বাচক বা নাম প্রণবঃ।

সমালোচন। এই জগতে যতগুলি বস্তু বা পদার্থ দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বাচক বা প্রতিপাদক বিশেষ্য শব্দ আছে, যাহা উচ্চারণ করিবামাত্র সেই সেই পদার্থের বোধ হয়। যেমন গোরু এই শব্দটি উচ্চারণে এক প্রকার জানয়ারের বোধ হয়। সেই জানয়ারের বাচক গোরু। সেই বাচক শব্দগুলি দুই প্রকার, গুণবাচক এবং বস্তুবাচক। গুণবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষণ এবং বস্তুবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষ্য। এই উভয়বিধ শব্দই কালক্রমে বস্তুর বাচকরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা এক একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম বা বাচক শব্দ দেখিতে পাই। এমন কি, এক একটি বস্তুর নামের মধ্যে গুণবাচক বা বিশেষণ শব্দ এত প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে উহার মধ্য হইতে প্রকৃত বস্তুবাচক বা বিশেষ্য শব্দটি খুঁজিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়াছে, অনেক স্থলে প্রকৃত বিশেষ্য শব্দটি হয় ত লোপ প্রাপ্ত হয়; অন্যান্য বস্তুর মত এক্ষণে ঈশ্বরের বাচক অনেকগুলি শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সকল গুণবাচক মাত্র, উহারা ঈশ্বরের এক একটি গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের বাচক প্রকৃত বিশেষ্য শব্দ একমাত্র প্রণব বা ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের সহিত ঈশ্বরের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য বা স্বতঃসিদ্ধ, কোন গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে কল্পিত হয় নাই। যেমন পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ—লোক দ্বারা অমুক পিতা অমুক পুত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও ওঙ্কারের মধ্যে বাচ্য বাচক সম্বন্ধও নিত্য; বেদাদি দ্বারা ঈশ্বর বাচ্য এবং ওঙ্কার বাচক, এইরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। এই নিমিত্তই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ।
তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতোনাম তেনাহূত প্রসীদতি॥"

ঈশ্বরের শরীর প্রত্যক্ষ হয় না, তিনি ভক্তির বশ্য এবং মনের মত স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ সম্পন্ন। ওঙ্কারই তাঁহার নাম; এই নাম দ্বারা আহূত হইয়া ভক্তের উপর প্রসন্ন হন। এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐ ওঙ্কারের অ, উ, ম,

এই অবয়বের মধ্যে কোন না কোনটির সহিত যোগ করিয়া তন্ত্রের মূল মন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে।

এই স্থলে ইংরাজী দর্শনাভিজ্ঞ, মিলের বাদশাস্ত্রের দুইটি কথা স্মরণ করিলেই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ পরিস্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন। কথা দুইটি Denotation এবং Connotation. বিধাতা বলিলে তাহার denotation কেবল বিধান-কর্ত্তা, কিন্তু connotation অর্থ ঈশ্বর বটে। সেই রূপ ভগবান্ বলিলে ষড়ৈশ্বর্য্য যুক্ত পুরুষ মাত্র denote করে, Connotation অর্থে ঈশ্বর বটেন। ইংরাজিতে যে সকলকে Proper Noun বলে, সেই সকল সংজ্ঞার Denotation এবং Connotation একই। ঈশ্বরের সেইরূপ proper name বাচক নাম ওঁ। ওঁ বলিলে কাল শাদা, ভাল মন্দ, ধারণ কর্ত্তা সৃষ্টি কর্ত্তা,—এ সকল কিছুই বুঝায় না—বুঝায় কেবল ঈশ্বর। ঐ ওঙ্কার মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বাচক, ধাতা বিধাতাদি পদ তাঁহার গুণবাচক মাত্র।

তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনম্॥ ২৮।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-জপঃ, তৎ-অর্থ-ভাবনম্।

পদার্থঃ। তস্য সার্দ্ধ ত্রিমাত্রস্য প্রণবস্য 'জপঃ' যথাবদুচ্চারণং, তদ্বাচ্যস্যে শ্বরস্য 'ভাবনং' পুনঃপুন শ্চেতসি বিনিবেশনম্।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বর প্রণিধানদ্বেতি সূত্রেণ সমাধি সিদ্ধৌ যো দ্বিতীয় উপায উক্তঃ, ইদানীং তমেবোপায়ং বিবৃণোতি-তজ্জপ ইতি। প্রণিধানং নাম ঈশ্বর ভাবনং তদ্ধি ওঙ্কারস্য যথাবদুচ্চারণাৎ নান্যৎ। অতএব সমাধি সিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপ্যঃ, তদর্থশ্চ ভাবনীয়ঃ। তথা চোক্তং—পদস্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগ সম্পত্ত্যাপরমাত্মা প্রকাশতে।

অস্যার্থঃ। স্বাধ্যায়াৎ প্রণবার্থ ভাবনাৎ যোগং আসীত প্রাপ্নুয়াৎ প্রণবার্থ-ভাবনা চিত্তস্যৈকাগ্রতা সম্পত্ত্যা যোগস্য সিদ্ধির্ভবতি, তথা যোগাদপি স্বাধ্যায়ং আমনেৎ যোগস্য সিদ্ধাবপি প্রণবার্থং চিন্তয়েদেব। যতঃ স্বাধ্যায়স্য যোগস্য চ সম্পত্ত্যা সম্মেলনেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম প্রকাশতে জ্ঞাতো ভবতীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সেই ওঙ্কারের যথানিয়মে উচ্চারণই ঈশ্বরানুশীলন।

সমালোচন। সমাধি লাভের প্রতি ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যে উপায়ান্তর কথিত হইয়াছে এই সূত্রে সেই প্রণিধানেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে

মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান আর কিছুই নয়, কেবল ওঙ্কারের যথানিয়মে উচ্চারণ এবং মনে মনে তাহার অর্থ পরিচিন্তন। উক্তরূপ ওঙ্কারের প্রতিনিয়ত জপ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, চিত্তের একাগ্রতাই যে সমাধি সিদ্ধির কারণ, ইহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ, প্রত্যক্, চেতনা, অধিগমঃ, অপি, অন্তরায় অভাবঃ, চ।

পদার্থঃ। ততঃ তস্মাৎ জপাৎ, তদর্থ ভাবনাৎ চ, প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ প্রতি অঞ্চতি বিষয় প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখং গচ্ছতীতি প্রত্যক্ তাদৃশী যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ জীবঃ তস্যা অধিগমঃ জ্ঞানং অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাঃ ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ সমাধিসিদ্ধৌ প্রতিবন্ধকীভূতাঃ তেষাং অভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ, চকার সমুচ্চয়ার্থঃ।

অন্বয়ঃ। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমো ভবতি অন্তরায়া ভাবশ্চ ভবতি।

ভাবার্থঃ। তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন জীবাত্মজ্ঞানং বিষয়ত্যাগশক্তিশ্চ চেতসি জায়েতে। তাভ্যামীশ্বর সাক্ষাৎকারো ভবতি। তেন সাক্ষাৎকারেণ চিত্তৈকাগ্রতা তয়া অসংপ্রজ্ঞাতসিদ্ধিঃ। বক্ষ্যমাণানাং ব্যাধিপ্রভৃতীনা মন্তরায়াণাং হানিশ্চ ভবতি।

অনুবাদ। সেই ওঙ্কারের জপ এবং তাহার অর্থচিন্তন-রূপ ঈশ্বর প্রণিধান অভ্যাস করিতে করিতে জীবতত্ত্বের জ্ঞান এবং বক্ষ্যমাণ ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায়ের বিনাশ হয়।

সমালোচন। ওঙ্কারের জপ এবং তাহার বাচ্য ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তন করিতে করিতে ঈশ্বরের সহিত তুলনাদ্বারা জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ 'ঈশ্বর পুরুষ, জীবাত্মাও পুরুষ, অতএব ঈশ্বর যেমন নির্ম্মল, সত্ত্বময়, অন্য সংস্রব রহিত এবং সর্ব্ব প্রকার উপসর্গ রহিত আমাদের জীবাত্মাও ত সেইরূপ; কেননা উভয়ই পুরুষ, উভয়েরই এক প্রকার স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে জীবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আপনা আপনিই মনে উদয় হয় যে, আমার যে এই সাংসারিক অনন্ত দুঃখভোগ, ইহা কেবল বিষয়ের সম্ভবে হইয়াছে। অতএব বিষয়বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেই চিত্ত স্থিরভাব অবলম্বন করে এবং চিত্তস্থৈর্য্যের বিঘ্নকারী ব্যাধি প্রভৃতি আর তাদৃশ স্থির চিত্তকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদের বিঘ্নকারিণী শক্তির বিলোপ হয়। এইরূপ ক্রমে অসংপ্রজ্ঞাত

সমাধি সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন, কেবল ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা নয়, পূর্ব্বোক্ত উপায় অনুশীলন দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা হইলে এইরূপ ফল লাভ হয়। সেই চিত্তের বিক্ষেপকারী অন্তরায়গুলির নাম কি এবং তাহারা কত প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রের উপন্যাস করিয়াছেন।

ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে হন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

পদচ্ছেদঃ। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ, তে, অন্তরায়াঃ।

পদার্থঃ। ব্যাধিঃ ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো জ্বরাদিঃ, স্ত্যানং চিত্তস্য অকর্ম্মণ্যতা, সংশয়ঃ সন্দেহ উভয়কোট্যালম্বনং জ্ঞানং, যথা যোগ সাধ্যোনবেতীত্যেবং রূপঃ, প্রমাদঃ অননুষ্ঠানশীলতা সমাধি সাধনে ঔদাসীন্য মিতি যাবৎ। আলস্যং কায়শ্চিত্তয়োগু রুত্বং, যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যভাবহেতুঃ। অবিরতিঃ বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শনং শুক্তিকায়াং রজতত্ববদিতি বিপর্য্যয় জ্ঞানং, অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ স সমাধিভূমেরলাভোঽসম্প্রাপ্তিঃ, অনবস্থিতত্বং লব্ধাবস্থায়ামপি সমাধিভূমৌ চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠা। চিত্তং বিক্ষিপ্যতে এভি রিতি চিত্তবিক্ষেপকাঃ, তে এতে, সমাধেরেকাগ্রতয়াঃ যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাৎ অন্তরায়া ইতি উচ্যন্তে।

অন্বয়ঃ। ব্যাধিস্ত্যান—অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা ভবন্তি, তে অন্তরায়া ইতি চ উচ্যন্তে।

ভাবার্থঃ। এতে হি ব্যাধি প্রভৃতয়ো রজস্তমোবলাৎ প্রবর্ত্তমানাশ্চিত্তং বিক্ষিপন্তি অস্থিরং কুর্ব্বন্তি ততশ্চ তে সমাধেরন্তরায়াঃ কথ্যন্তে। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই নয়টিচিত্তের বিক্ষেপক অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বিঘ্নকারী বলা হয়।

সমালোচন। ব্যাধি প্রভৃতির অর্থ অবগত হইলেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ব্যাধি—শরীরস্থ বাত পিত্তাদি ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য জনিত জ্বরাদি রোগ; স্ত্যান, চিত্তের অকর্ম্মণ্যাবস্থা; সংশয় সন্দেহ, উভয় কোটি স্পর্শী জ্ঞান;—উহা এই রূপ, কি এই রূপ? এই উপায়ে সমাধি লাভ করা যাইবে কি না? এই প্রকার আন্দোলনের নাম সংশয়; প্রমাদ অনবধান; সমাধি

লাভের উপায় অনুষ্ঠানে অমনোযোগিতা বা হতশ্রদ্ধ ভাবে উপায়ের অনুষ্ঠান করা। আলস্য,—দেহ বা চিত্তের গুরুত্ব (ভার) নিবন্ধন সমাধি সাধনে অপ্রবৃত্তি। অবিরতি,—অবিশ্রান্ত বিষয় তৃষ্ণা; ভ্রান্তি দর্শন,—মিথ্যাজ্ঞান; যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই রূপ ভাবে জানা—যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা, শুক্তিকে রজত বলিয়া জানা, এবং যে বস্তুর সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া জানা। অলব্ধ ভূমিকত্ব,—সমাধি ভূমির অপ্রাপ্তি অর্থাৎ চিত্তের যে অবস্থায় সমাধিলাভ হয় সেই অবস্থা পর্য্যন্ত না পৌঁছান। অনবস্থিতত্ব—সমাধি ভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থির হইয়া থাকিতে না পারা। এই নয়টি রজ ও তম গুণ প্রভাবে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনে বিঘ্ন করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বলা হয়।

দুঃখ দৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাস প্রশ্বাসাঃ
বিক্ষেপ সহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

পদচ্ছেদঃ। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস, প্রশ্বাসাঃ, বিক্ষেপ-সহভুবঃ।

পদার্থঃ। দুঃখং চিত্তস্য রাগজঃ পরিণামঃ বাধনা লক্ষণঃ, যদ্বাধাৎ প্রাণিন স্তদপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে, দৌর্মনস্যং বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ কারণৈ র্মনসোঽস্বস্থতা, অঙ্গমেজয়ত্বং—সর্ব্বাঙ্গানাং বেপথুঃ, আসনস্থৈর্য্যবাধকঃ। প্রাণোয়দ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি সঃ শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। ত এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপ সহ ভুবঃ।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। পূর্ব্বোক্তৈর্ব্যাধিপ্রভৃতি শ্চিত্তস্য বিক্ষেপে সতি দুঃখাদীন্যপি সমুদ্ভবন্তীত্যর্থ।

অনুবাদ। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস এবং প্রশ্বাস এই কয়টি চিত্ত বিক্ষেপের সহিত সমুৎপন্ন হয়।

সমালোচন। দুঃখ কি ইহা বোধ হয় সংসারী ব্যক্তিকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তাঁহারা প্রতিপদেই উহার অনুভব করিয়া থাকেন; দৌর্মনস্য বলিতে মনের অসুস্থতা, অঙ্গমেজয়ত্ব বলিতে শরীরের কাঁপনি, শ্বাস বাহ্য বায়ুর গ্রহণ, প্রশ্বাস আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসারণ। এই কয়টি চিত্তের বিক্ষেপের সহিত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে কেবল

চিত্ত অস্থির হয় মাত্র তাহা নহে, চিত্তের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখাদিও উৎপন্ন হয়।

তৎ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-প্রতিষেধ-অর্থং একতত্ত্ব-অভ্যাসঃ।

পদার্থঃ। তেষাং (পূর্ব্বোক্তানাং বিক্ষেপাণাং) প্রতিষেধার্থং নিষেধার্থং একতত্ত্বাভ্যাসঃ একস্মিন্ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ) তত্ত্বে অভ্যাসঃ চিত্তস্য পুনঃ পুনর্নিবেশনম্।

অন্বয়ঃ। ক্রিয়েতেতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যৎকিঞ্চিদভিমতং বস্তু ধ্যায়ং চিত্তং তান্ বিক্ষেপান্ প্রতিরুন্ধ্যাৎ।

অনুবাদ। চিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুর পুন পুন ধ্যান করত ঐ পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপকারীদিগের কার্য্যকারিতা শক্তির রোধ করিবে।

সমালোচন। যোগচার্য্যদিগের মতে চিত্ত একই কিন্তু অনেক বস্তুগামী। চিত্ত অনেক বস্তুগত হয় বলিয়া ইহা চঞ্চল। চিত্তের এই চাঞ্চল্যই আমাদের দুঃখাদির কারণ। সুতরাং অনর্থের মূল চিত্তের এই চাঞ্চল্য দোষকে কোন মতে ঘুচাইতে পারিলে আমরা দুঃখাদির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি। এই সূত্রে সেই চাঞ্চল্য দোষ দূর করিবার উপায়ই বলা হইয়াছে। উহা এক তত্ত্বাভ্যাস—যে কোন একটি তত্ত্বে চিত্তের সংযোগ করিয়া প্রতিনিয়ত অনুশীলন দ্বারা ঐ সংযোগের দৃঢ়তা স্থাপন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তের সম্মুখে যে বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, চিত্ত সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয়। অতএব চিত্তের সহিত কোন এক বস্তুর সংযোগকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারিলে চিত্ত সেই একই প্রকার আকারে অবস্থান করে। কাযেই উহার চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হয়, কারণ নানা আকারে পরিণত হওয়াই চিত্তের চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হইলে ইহা একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন আর কিছুতেই বিচলিত হয় না। শরীরের ধর্ম্ম ব্যাধি প্রভৃতি সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইলেও তজ্জন্য দুঃখাদির অনুভব না হওয়ায় চিত্ত স্থির অবস্থাতেই অবস্থিত হয়।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার "চিত্ত ক্ষণিক এবং অনেক" ইত্যাদি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া চিত্তের একত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে সে সকল বিচারের বিশেষ উপযোগিতা বোধ করিলাম না বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

গঙ্গা।

"মা গো, কি হ'বে আমার।"

গভীর নিশীথকাল স্তব্ধ চারিধার,
জগতের জীব জন্তু স্তব্ধ নিদ্রাকোলে,
সুমৃদু গভীর বাজে 'প্রণব ওঙ্কার,'
বিশাল সংসার ভাসে শান্তির হিল্লোলে।

হেন কালে যুবা এক ভাগীরথী তীরে,
জুড়াইতে সন্তাপিত হৃদয়-অনল,
'আকাশ পাতাল' ভাবে ভাসি আঁখি নীরে,
অনুতাপ তাহে মিশি ঢালে হলাহল।

ভগ্ন-হৃদে অভাগার বৃশ্চিক দংশন,
দীর্ঘ শ্বাস পলে পলে শোষিছে শোণিত,
ক্ষিপ্ত সম শূন্য দৃষ্টি, শূন্য দু'নয়ন,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট, দিশে হারা, আপনা বঞ্চিত।

ভূত ভাবী বর্ত্তমান স্মরি' মনে মনে,
ভারবহ জীবনের ভীষণ বিকার,
সহসা পাষাণ ভেদী করুণ-ক্রন্দনে,
জানাইলা মহামায়ে—"কি হ'বে আমার!"

"মাগো, কি হবে আমার!"

মঙ্গলময়ী মা তুমি অতি মূঢ় হীন আমি
পাপ অবতার হেয় খল দুরাচার,
তাই তব হিতবাণী মনে কিছু নাহি মানি,
অসীম পাপ-অর্ণবে দিয়েছি সাঁতার।

স্বর্গ সুখ আশে মাতি অসার আমোদে নিতি
দুস্তর নরক-কুণ্ডে দি'ছি অঙ্গ ঢেলে,

অন্তর-যামিনী মাত কিবা তব অবিদিত
কি না জান তুমি—তবে কি ফল লুকা'লে ?

কূল—সীমা বিবর্জ্জিত সুদূর এ মহা স্রোত
কেমনে হ'ব মা পার ব'লে দে উপায়,
দিক্ হারা পথিকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিহঙ্গের
নিদারুণ দুঃখ-বাণী না মিলে ভাষায়,
তেমতি এ অভাজন মা গো নিরুপায়।

নিত্য জ্ঞানে অনিত্যেরে করিয়া আশ্রয়,
আমার আমার ব'লে সংসারের গণ্ডগোলে
মত্ত ছিনু দিবা নিশি ঐহিক-চিন্তায়,
বিশাল সংসার মাঝে কেন এনু কিবা কাজে,
না ভাবিনু একবার মজিয়ে মায়ায়।

এবে ঘোর তমোজাল ঘিরিয়াছে মহাকাল
বুঝেছি মা এত দিনে তোমারি কৃপায়,
সংসার এ পারাবার কেমনে মা হ'ব পার
বিনে তব কৃপা তরি শ্রীপদ-সহায়,—
তুমি না রক্ষিলে মাগো কে রাখিবে হায় !

ওই শুন ভীমরবে গর্জ্জিছে জলধি,—
চপলা বিকট হাসি' উজলিছে দশদিশি,
মুহুর্মুহু বজ্রনাদে কাঁপিছে হৃদয়,
তরঙ্গ হিল্লোল উঠে সুদূর আকাশে ছোটে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা একাকারময়।

কালের করাল-ছায়া —না, ওই ভীষণ কায়া
ক্রমে আসে আগুসরি গ্রাসিতে আমায়,
'মাভৈ মাভৈ' রবে সান্ত্বনা কর মা সবে
প্রকৃতিরে প্রকৃতিস্থ কর এ সময়।

(নতে) দেহ-তরী ডুবে যায় আয়ু-বায়ু হয় ক্ষয়,
'ভেলায় ভরসা' বল থাকে কতক্ষণ,
কোথা যাব কি করিব (এ) অকূলে কি কূল পা'ব
অনন্ত অপার এ যে দিগ্বিদিক হীন,—
নারকীর পরিণাম! কি ভীষণ দিন!
ইহ পর উভলোক গভীর আঁধার,
তবে কোথা যা'ব, মাগো, কি হ'বে আমার?

সহসা হৃদয়-যন্ত্র হইল নীরব,—
জীবন্ত-উচ্ছ্বাস-গাথা প্রকাশি' অন্তর ব্যথা
উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীর আবেগে,
পূত-ভাগীরথী জলে আত্ম বিসর্জ্জন কালে
জাহ্নবী ভক্তের হাত ধরিলেন বেগে।

সহসা উজ্জ্বল-জ্যোতি প্রকাশি' অপূর্ব্ব ভাতি,
উজলিল দশদিশি অপূর্ব্ব শোভায়,
সুগন্ধে পূরিল স্থান মায়ের মধুর তান
সঞ্জীবিল অর্দ্ধমৃত অভাগা যুবায়;—
কবির কল্পনা-ভেলা তাহে ডুবে যায়।

"সম্বরি হৃদয়-ব্যথা দেখ্ চেয়ে আমি হেথা
সান্ত্বনা করিতে তোরে এসেছি বাছনি,
আর ভয় নাই তোর, করুণা পেলি রে মোর,
ভবার্ণবে কর্ণধার আমি রে শিবাণী।

অনুতাপী যেই জন ডাকে মোরে অনুক্ষণ
ত্যজি' ভোগবিলাসিতা নশ্বর কামনা,
প্রায়শ্চিত্ত অবসানে কঠোর তপস্যাগুণে
অবশ্যই লভে সেই আমার করুণা।

জ্ঞান-চক্ষু লও এবে তিতিক্ষা বিবেক,—
বিশাল এ কার্য্যক্ষেত্রে যেন নাহি কোন সূত্রে,

স্খলিত-চরণ হও কর্ত্তব্য ভুলিয়ে,
মোহিনী মোহের বশে পৈশাচিক রঙ্গরসে
মজনা মজনা আর আপনা হারায়ে।

স্থির-লক্ষ্যে ধীর মনে আপনার পথপানে
যাও চলি'—অবহেলি' মায়া প্রলোভন,—
বিবেক-কৃপাণে কাটি সংসার-বন্ধন।

সান্ত্বনা অভয়-বাণী দিতেছি তোমায় আমি
যাও বৎস যাও গৃহে নাহি কোন ভয়,
নব-জীবন-প্রভাবে ললিত মধুর রাবে
তোল তান—ভক্তিগান মাতাও সবায়,
অক্ষয়-সুকীর্ত্তি লভ বিশাল-ধরায়।"

বীণা বিনিন্দিত-বাণী কহিতে কহিতে,
জাহ্নবী মিশায়ে গেলা জাহ্নবীজীবনে,
চিত্রার্পিত স্থিরনেত্রে সবিস্ময়চিতে—
দাঁড়ায়ে রহিলা যুবা আপনার মনে।

শ্রীহারণচন্দ্র রক্ষিত।

গঙ্গা স্তব।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

১। গঙ্গে! চলেছ মা কোথায়।
থাক থাক থাক থাক ক্ষণকাল নিবেদিব কিছু তব পায়॥

২। হেরিলে তোমার মুরতি সুন্দর,
নিরমল জল অতি মনোহর,
পরশিলে পাপী তাপী নারী নর, ব্রহ্ম পদ পায়।

৩। শ্রীশ পাদ রজো বিহারিণী,
সতীশ কামিনী, শৈলেশ নন্দিনী,
সুরেশ বারণ-প্লাবিনী,
কত দুর্গম নগর তীরে খাড়া হল,
তোমারই প্রতাপে গেল রসাতল,
কার সাধ্য বল, কার্ এত বল,
রাখে চিহ্ন তব গায়॥

৪। নগেন্দ্র পাদ ধুইয়া ধুইয়া, প্রসন্ন মনেতে চলিছ ধাইয়া,
আপন ভাবে আপনি মাতিয়া, উন্মাদিনী;
দর্পিত ভরে অঙ্গ হেলাইয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া দুলিয়া,
ছুটিছ নাচিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
দৃক্‌পাত নাহি কায়।

৫। কোথায় কংসারি দ্বারকাধিপতি,
কোথা রামচন্দ্র বীর-মহামতি,
কোথা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সন্ততি, কোথা পৃথুরায়;
জনমিল কত আমীর বাদসাহ,
ভূমে কীর্ত্তি রাখি তেয়াগিল দেহ,
তোমারে শাসিতে নিবারিতে কেহ, নারিল ধরায়॥

৬। হাঙ্গর কুম্ভীর কচ্ছপ মকর,
মৎস্য আদি কত শত জলচর,
আশ্রয় লইয়া তোমার ভিতর, সুখে ভাসি যায়;
কত নদনদী তোমাতে মিশিল,
পরশিয়া অঙ্গ পবিত্র করিল,
আহা কি মধুর বিশুদ্ধ সলিল, তুলনা নাহিক তায়।

৭। পতিব্রতা সাধ্বী কতই সুন্দরী,
ভারতের কোটি কোটি নর নারী,
পান করি তব সুবিমল বারি, কত সুখ পায়;
অবগাহ করি তোমার সলিলে,
মাতর্গঙ্গে বলি তোমায় মজিলে,
পতিত পাবনী পাপ নাশিলে, নবীন জীবন পায়॥

৮। সুবোধ সুধীব-পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
পুণ্যধারা সবে কব বিতরণ,
রাজায় প্রজায় সম আচবণ, ক্ষীবোদ শুভকারিণী ;
তব তীরে যতি যোগেতে মগন,
সমীরণ কবে চামব ব্যজন,
তবঙ্গ কি বব কবে অনুক্ষণ, বুঝি হরিগুণ গায়।

৯। বরষায় ধব স্ফীত কলেবব,
ভাবে গদ গদ প্রফুল্ল অন্তব,
শরতের বেলা দেখি ভাবান্তব, শীতে মাগো শীর্ণ কায় ;
গ্রীষ্মে দেখি অস্থি চর্ম্মসার ময়,
কেন মাত ক্রমে হইতেছ ক্ষয়,
প্রবোধ না মানে ব্যাকুল হৃদয, দুঃখে বুক ফেটে যায ॥

১০। প্রবল ভূজপাতি তোমাব উপৰ,
নিবমিল সেতু এতকাল পব,
বসাইল স্তম্ভ বুকের ভিতব, তাই বুঝি অভিমানে ;
শ্মশান নিবাসী পতির সন্ধানে,
চলিয়াছ দেবি তরঙ্গ তুফানে ;
ভারত শ্মশান তবে বল কেন, ছাড়িয়া যাইবে হায় ॥

শ্রীশবচ্চন্দ্র মজুমদার।

পশুপতি।

"মৃণালিনীতে" পশুপতির যে জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা মোটামুটি চারি ভাগে বিভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পশুপতির সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগে পশুপতির দুরাকাঙ্ক্ষা, সদ্বৃত্তির সহিত সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বিরোধ এবং পরিণামে দুরাকাঙ্ক্ষার জয়; তৃতীয় ভাগে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি জন্য পশুপতির কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ ও কার্য্যের পরিণাম এবং চতুর্থ ভাগে পশুপতির পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথমভাগ।

পূর্ব্ব পরিচয়।

পশুপতির পূর্ব্ব পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থকার ৩।৪ ছত্রে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইয়াছেন। কিন্তু তবু তাহা জানা আবশ্যক। সেই ৩।৪ ছত্রের মধ্যেই একটি কাব্য-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিচয়টি এইরূপ :—

"পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধি বিদ্যার প্রভাবে গৌড় রাজ্যের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

পশুপতির আকৃতি বর্ণনাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থি মাংসের সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দির স্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞান গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাব ব্যঞ্জক।"

ইহার পরে পশুপতির বিবাহের কথা যোগ করিলেই পূর্ব্ব পরিচয়টি শেষ হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এ স্থলে এখন ইহাই বলা আবশ্যক যে এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নী সহবাসে বঞ্চিত।

এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয়টি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম—পশুপতি প্রথমে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থার লোক ছিলেন। উন্নতির পরে উন্নতিতেই তিনি ধর্ম্মাধিকার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কথাটি পড়িয়াই মনে হইল, গ্রন্থকার অনর্থক এ পরিচয়টি প্রদান করেন নাই। এরূপ পূর্ব্ব পরিচয়ে তাঁহার যথেষ্ট কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা পশুপতির গুণগরিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই স্থির করিয়া, তৎপরবর্ত্তী পশুপতির আকৃতি বর্ণনা পাঠ করিলাম। দেখিলাম সুন্দর একটি রাজনৈতিকের আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিকের কথা মনে হইলেই তৎসঙ্গে আরও দুই একটি কথা মনে হয়। ভরসা করি, উনবিংশশতাব্দীর পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। একে রাজনৈতিক, তাহে চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, মনে মনে পশুপতির সচ্চরিত্রে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। পূর্ব্বের তত্ত্বটিও এই সন্দেহ নিরাকরণ না করিয়া বরং পরিবর্দ্ধিত করিল। আমরা সন্দিগ্ধচিত্তে পশুপতির কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিতে হইল না। অল্প পরেই সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে, বিশ্বাসঘাতক, শরণাগত অতিথির প্রাণগ্রহণে প্রস্তুত, প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যাপহরণাভিলাষী, কূটবুদ্ধি, সুচতুর পশুপতি সম্বন্ধে কথাগুলি বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টি পড়িল —কত জীবন্ত ঘটনা স্মৃতি পথে উদ্রিক্ত হইল; দেখিলাম, এইরূপ নীচাবস্থা হইতে যাহারা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া থাকে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা ফলবতী করিয়া, যাহারা ক্রমে বড় হইয়া উঠে, এরূপ কুমতি তাহাদের পক্ষে হওয়া অসম্ভবপর নহে। অনেক স্থলেই এরূপ ব্যক্তিকে শেষে আশার সর্ব্বশেষ সোপানে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়—উন্নতিপ্রদাতা প্রভুর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত দেখা যায়। ইতিহাসও এইরূপ। এইস্থলে মাক্‌বেথ-কাহিনী মনে পড়িল—যেখানেও প্রায় এই কথা। মাক্‌বেথে সেই ডাকিনীগুলার অবতারণে ও ক্রমিক পদোন্নতিতে মাক্‌বেথের দুরাশা পরিবর্দ্ধিত; ঘটনাগুলি কিছু জাঁকাল; এখানে এই তিন চারি ছত্রে পশুপতির দুরাশার ক্রমশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা—কৌশলে ও সংক্ষেপে পরিব্যক্ত। আমাদিগের কবি এতদ্ভিন্ন সেই দুরাশা সঞ্চারের কারণ বর্ণন জন্য কোন ঘটনাও সৃষ্টি করেন নাই, কোন বিশেষ কথাও বলিয়া দেন নাই। ইঙ্গিতে কার্য্য শেষ করিয়াছেন। মাক্‌বেথের সহিত ইহার তুলনা করিতেছি না, কারণ এখানে মাক্‌বেথের কবির যাহা চেষ্টা, আমাদিগের কবির ঠিক সেইরূপ চেষ্টা নহে—আমরা কবির

কৌশল মাত্র প্রদর্শন করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, না জানি এরূপ কত সারগর্ভ সুন্দর কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া যাইয়া থাকি। যাঁহারা এত ভাবিয়া লেখেন, তাঁহাদের গ্রন্থ আমরা ভাবিয়া পড়ি না কেন?

পশুপতির বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চত্রিংশ বৎসর। পূর্ণ যৌবন। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নী সহবাসে বঞ্চিত। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে এরূপ হয় নাই—বাল্যকালেই পশুপতির বিবাহ হইয়াছিল। ধন মর্য্যাদার অভাবে এরূপ ঘটে নাই, পশুপতি গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ও পাপ প্রণয়াসক্ত বলিয়া পশুপতি এ কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পশুপতি হিন্দু সন্তান, জাতিতে ব্রাহ্মণ—মনোরমা নাম্নী বিধবা বলিয়া পরিচিতা একটি কামিনী তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। কবি এখানেও পশুপতিকে পাপমতিপরায়ণ এবঞ্চ কূটবুদ্ধিপ্ররত করিয়া পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখনকার অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, এরূপ লোকের সুপত্নী হইলে (মাক্‌বেথের মত পত্নী নহে) যেটুকু সুফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাও আমরা আশা করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশুপতি সেরূপ সুপত্নী হইতে বঞ্চিত—সুপত্নী থাকিয়াও তাঁহার পক্ষে ছিল না। হায় রে দুরদৃষ্ট!

দ্বিতীয় ভাগ।

দুরাশার সঞ্চার—সদ্বৃত্তির সহিত দুরাশার বিরোধ—
আত্মপ্রতারণা—দুরাশার জয় লাভ।

এই দ্বিতীয় ভাগে পশুপতি একটি ভয়ঙ্করী দুরাশা লইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই দুরাশার প্রথম সঞ্চারের কথা বা তাহার ক্রমবিকাশের কথা, আমরা গ্রন্থ মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেটা ইঙ্গিতে সম্ভাবনা ব্যক্তি মাত্র—বিশেষ কোন কথা নহে। আর যাহা কিছু আছে, পরে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইবে।

"যবনী সহযোগে বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইব,"—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পশুপতি এখন আমাদিগের সমীপে উপস্থিত। মুসলমান চরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন শেষ হইয়া গিয়াছে—ষড়যন্ত্রও একরূপ

সুস্থির হইয়া গিয়াছে। এ তাবৎ পশুপতির হৃদয়ে কোনরূপ সংঘর্ষণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম না। কিছু যে পাইলাম না এমত নহে— মহম্মদ আলীর সহিত কথোপকথনে পশুপতির ইতস্তত ভাবটা সুন্দররূপেই পবিস্ফুট আছে—কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিতে চাহিলাম, তাহা পাইলাম না। মনের কথা গোপন করা রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান গুণ। তাই কবি প্রথমে এটী খুলিয়া দেখান নাই। কিন্তু ইহার পরে দেখ—পশুপতি মুসলমান চরকে বিদায় দিয়া, স্বীয় স্থাপিত অষ্টভুজা প্রতিমাগ্রে যুক্ত করে স্তুতি করিয়া কহিতেছেন।——

"জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! উদ্ধার করিও। আমি **জননীস্বরূপা** জন্মভূমি **দেবদ্বেষী** যবনকে বিক্রয় করিব না। কেলবমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, "**অক্ষম প্রাচীন** রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি আমি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা! যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎ প্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

ইহাই পশুপতির দুরাশার সহিত সদ্বৃত্তির সংগ্রাম। রাজনৈতিক অনেক কথা কহে না—তাই কথাগুলি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কত অর্থ যুক্ত। কথাগুলি হৃদয়ের দুই দিকই কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। পশুপতির উপযুক্ত কথা বটে।

আমরা যে সকল কথা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা বিশেষ অর্থযুক্ত। সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, তবু দুই একটি কথা বলিব।

পশুপতি স্বদেশভক্ত—জন্মভূমি তাঁহার নিকট মাতৃস্বরূপ। পশুপতি দেবভক্ত—স্বয়ং অষ্টভুজার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্য তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। যবনের বিশেষণে তিনি 'দেবদ্বেষী' বিশেষণটিই প্রয়োগ করিতেছেন। এ সকল কথা দুরাশার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। আবার অনুকূলেও একটা চাপা কথা আছে। রাজা অক্ষম, প্রাচীন। যে রাজ্যরক্ষণে অশক্ত, বিপ্লব সময়ে তাহাকে রাজা রাখা ঠিক স্বদেশভক্তের সঙ্গত কার্য্য নহে। তিনি রাজ্যরক্ষণে পটু, তবে তাঁহার রাজা হওয়াতে দোষ কি? কথাটি বলিয়া পরক্ষণেই আবার পশুপতি

দোষ বুঝিতে পারিলেন। যবনের সাহায্যে রাজ্যলাভ—যবনের অধীনে মাতৃভূমি রাখা! আবার তাহা দূর হইল। যেরূপ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে, পশুপতি সেইরূপ যবন সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবন দূর করিবেন। ইহাতে পাপ কি? কিন্তু তবু যেন পশুপতির মনে হয়, এতে পাপ আছে। তাই পশুপতি বলিতেছেন, যদি ইহাতে পাপ হয়, সে পাপ তিনি প্রজারঞ্জন করিয়া ক্ষয় করিবেন।

পাঠক এখন দেখ দেখি, এই কয় ছত্রে পশুপতি কত কথা বলিয়াছেন। রাজনৈতিকের উপযুক্ত বাক্য নয় কি? সাবধানতা ও কৌশল দেখ!

আরও একটি কথা। পাঠক, সেক্ষপীয়রের মাক্‌বেথকে দেখিয়াছ, একবার এই হিন্দু পাপীকে দেখ! গোড়াতে মাক্‌বেথকে আমরা ভাল লোকই দেখিয়াছি, কিন্তু কই, তাহার পাপাচরণের সময়ে বা প্রারম্ভে এরূপ ত কিছু শুনিতে পাইলাম না। কারণ পরিষ্কার—মাক্‌বেথ হাজার হউক ম্লেচ্ছ— আর পশুপতি হিন্দু।

হিন্দুপাপী প্রায়ই ধর্ম্মের নিকট একটা জবাব না দিয়া পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হিন্দুর ডাকাত কালী পূজা না করিয়া ডাকাতি করিতে যায় না। হিন্দুর হিংসুক পরের অবনতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। এত ধর্ম্মভয় ত অন্য জাতিতে দেখিতে পাই না। ইহার কি কোন কারণ নাই? আছে বই কি। হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা এক দিন উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল— হিন্দুর ধর্ম্ম এক দিন হিন্দুর রক্তমাংসে জড়িত হইয়াছিল, তাই পড়িতে পড়িতেও হিন্দুর ধর্ম্মভাব রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মভাব এখন দূষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে ভাব এখনও বিদূরিত হয় নাই। এখনও হিন্দু পাপকার্য্য ধর্ম্মের ভাণে করে—এখনও হিন্দু পাপী পাপাচরণেও ভগবানকে ডাকে। এটি ভাল কি মন্দ—কে বলিবে! আর তাহা বলিবার স্থানও স্বতন্ত্র, লোকও স্বতন্ত্র। আমরা এখন এই মাত্র দেখাইব যে, পশুপতির এই ধর্ম্মের ভাণ বা আত্মপ্রতারণের চেষ্টা, বড়ই স্বাভাবিক। স্নেহবশে পশুপতিকে কবি এইরূপ চিন্তাধিকারী করেন নাই—যাহা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর চরিত্রে যেরূপ দেখিয়া থাকি—রোহিণী-রূপ-প্রমত্ত রোহিণীভোগাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দলালের অধঃপতনের পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, বিধবা কুন্দনন্দিনী বিবাহেচ্ছু নগেন্দ্রনাথকে বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এও সেইরূপই দেখিলাম। "পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ করে।" এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,

ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুমতি কুমতি, সংগ্রামে অনেক স্থলে প্রকৃতি সুমতিও জয়লাভ করে না, প্রকৃত কুমতিও জয়লাভ করে না,—জয়লাভ করে সুমতিরূপা কুমতি।

"যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এ কথাটীও হিন্দুপাপীর কথা। শত সহস্র হিন্দু পাপী আজ এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া পাপাচরণ করিতে যাইতেছে। শিক্ষিতের প্রবোধ একরূপ, অশিক্ষিতের অন্যরূপ। অশিক্ষিত "গঙ্গাস্নানে পাপ যাইবে" স্থির করিয়া পাপাচরণ করে, শিক্ষিত ঐরূপ আর কোন একটা সুযুক্তি অবলম্বন করিয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়। হায়, কে কবে এই ভ্রান্তির রহস্য সমুদ্‌ঘাটিত করিবে? চুরি করিয়া টাকা আনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে কি অপহরণ দোষ লুপ্ত হয়? পশুপতি এইটি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান, কিন্তু এখানে বড়ই ভুল বুঝিলেন।

এখন সব জড়াইয়া একবার ভাবিয়া দেখদেখি, দুরাশা প্রেতিনী গর্ব্বিত স্বরে ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে কিনা—

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।"

মহম্মদ আলীর নিকটে যখন পশুপতি ঐরূপ ষড়যন্ত্রের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন দেখিলাম, পশুপতি সমাজকেও বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলেন। যেমন ধর্ম্মের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে হইল, সমাজের জন্যও তাহাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল।

তৃতীয় ভাগ।

সঙ্কল্পস্থির—কার্য্যারম্ভ—নূতন প্রতিবন্ধক (মনোরমা)—প্রতিবন্ধক তিরোহিত—কার্য্যের পরিণাম (অতঃপতন)।

পাপে পাপ বৃদ্ধি করে। একটী মিথ্যা কথায় দশটি মিথ্যা কথা কহায়। আমাদিগের কবি অন্যত্র লিখিয়া গিয়াছেন—যেরূপ জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতিবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে পাপাকর্ষণে প্রতি পাপে পাপীর পাপকামনা পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্কল্প সম্যক্ সুস্থির হইতে না হইতেই পশুপতি শরণাগত, উপচিকীর্ষু, অতিথি রাজকুমার, হেমচন্দ্রকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় অনুচর শান্তশীলকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

সঙ্কল্প সুস্থির হইলে, আবার এক নূতন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রতিবন্ধক—মনোরমা।

আমরা এই স্থলে পশুপতি-মনোরমা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিয়া লইব।

পশুপতি-মনোরমা সম্বাদ কবির আশ্চর্য্য কাব্যচাতুর্য্য প্রকাশিত করিতেছে। মনোরমা ফুটিয়াছে পশুপতির জন্য, আবার পশুপতিও খানিকটা ফুটিয়াছে মনোরমার জন্য। পশুপতি-মনোরমা উভয়ই ফুটিয়াছে, মনোরমার পূর্ব্বপরিচয় জন্য। পশুপতি-মনোরমার সেইরূপ বিবাহের পরিণাম, মনোরমার বিধবাবেশে অবস্থিতি, ও বিধবাভাবে তৎপ্রতি পশুপতির আসক্তি ইহাতেই সব ফুটিয়াছে। পশুপতির দুরদৃষ্ট, তাই পত্নী প্রতি তাঁহার আসক্তিতেও পাপফল প্রসব করিল। পাপটা মনে কি না—আই।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অনুরাগ কিরূপ প্রবল, কবি তাহা স্বয়ং না বলিয়া একটী কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন সব স্থির হইয়াছে, যখন পশুপতি ইষ্টদেবীকেও সান্ত্বনা করিয়াছেন ভাবিয়া মনের সঙ্কল্প সুদৃঢ় করিয়াছেন, তখন পশুপতি শয্যাগৃহদ্বারে দেখিলেন—"অপূর্ব্বদর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।"

রমণী—ধন্য তোমাদের মহিমা। পশুপতির কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই সাধিলে! একেবারে তাহাকে নরক হইতে স্বর্গে তুলিলে? কোথায় প্রভু প্রতিপালক বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুতের, শরণাগত অতিথির হত্যার, মন্ত্রণা—আর কোথায় এ অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস! মাত্রায় দুইই সমান—একটি সুকঠিন কঠোরতা—অন্যটি সুকোমল কোমলতা। পরিবর্ত্তনকারিণী একটি রমণীমূর্ত্তি। রমণীগণ এ সংসারে যথার্থই দেবী।

এই উচ্ছ্বাসের সময় পশুপতির সহিত মনোরমার যেরূপ কথোপকথন হইল, তাহা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে আমরা অন্য একটি কথা পাড়িব।

মনোরমা পশুপতিকে কহিতেছেন—"তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?"

"পশুপতি। কেন মনোরমে? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। আমি বিধবা বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং

রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে ? যেমন বল্লাল সেন কৌলিন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, আমরা দেখিতে পাই একমাত্র মনোরমা-প্রাপ্তিই পশুপতির রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ। কারণটি সাধারণ নহে, স্বীকার করিতে হইবে। এ জগতে রমণীপ্রণয় না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। লোককে স্বর্গেও তুলিতে পারে, নরকেও ডুবাইতে পারে। পশুপতির এই কথাটি দ্বারা যেমন এক দিকে তাহার প্রণয়-বলটি সূচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমন প্রণয়ের স্বকীয় মাহাত্ম্যও প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। মনোরমা-প্রাপ্তি-আশা যে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পশুপতি যখন স্বীয় ইষ্টদেবীর নিকটে মনোবাসনা ব্যক্ত করিতেছেন, তখন এ কথা প্রকাশিত নাই কেন ? তোমরা বলিবে—মনোরমার জন্যই ত রাজ্যা-কাঙ্ক্ষা—সেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষার জন্য যখন পশুপতি ঐরূপ বলিয়াছেন, তখন আবার পৃথক করিয়া সে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ না বলিলেও ত চলিতে পারে। তাহা পারে না। মনোরমার জন্য রাজ্যাকাঙ্ক্ষা হইলে, সে কথাটা তখন একবারও মুখে না আনা সম্ভবপর নহে। ফলকথা—রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, রাজ্য ও মনোবমা উভয়েরই জন্য। দুইই একত্র মনে উদিত হয়, তাই পশুপতি দুইটিকে সম্যক্ মিশাইয়া এক স্থলে রাজ্য ও এক স্থলে মনোরমাকে প্রাধান্য দিতেছেন। প্রণয়পাত্রের নিকট অজ্ঞাত কপটতা জগৎপ্রসিদ্ধ। এই দুই ভাব যে পর্য্যন্ত মিশিয়া রহিল, সে পর্য্যন্ত ইহার কোন্‌টি প্রধান বুঝা গেল না। কিন্তু কবি ছাড়িবার পাত্র নহেন—কথাটি আরও খুলিলেন। যখন মনোরমা পশুপতিকে প্রারব্ধ কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিল "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর"—কবি কহিতেছেন—

"পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনো-রমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে, মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও অত্যজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। 'যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?' এই রূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে

লাগিলেন, 'কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে, সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?' পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।"

কবি দেখাইলেন যে, দুইটির কোনটিই কম নহে। পশুপতি একবার ভাবিতেছেন মনোরমা, আর একবার ভাবিতেছেন, স্বীয় মান-সম্ভ্রম। পশুপতির ন্যায় লোকের উভয়ই অত্যাজ্য।

এইখানে আর একটি অতি সুন্দর কাব্যকৌশল প্রকাশিত হইল। কবি দায়ে পড়িয়াছিলেন—কৌশলে মুক্ত হইলেন। কথাটি এই—

পশুপতি কিরূপ লোক ও তাঁহার পরিণাম কি হইবে, তাহা পাঠকবর্গ একপ্রকার বুঝিয়াছেন। এই পশুপতির প্রণয়বল দেখাইতে হইবে। সে প্রণয় মনোরমার প্রতি। প্রণয়বল দেখাইতে হইবে হৃদয়ের প্রণয় ভিন্ন অন্য যে তুঙ্গবল থাকে, তাহার বিরোধে।—কবি তাহাই করিলেন। রাজ্যাকাঙ্ক্ষার সহিত মনোরমার বিরোধ ঘটাইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড়ই দায়ে পড়িতে হইল, পশুপতি রাজ্যাকাঙ্ক্ষাও ছাড়িতে পারে না—তাহা হইলে পশুপতি চরিত্রের উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়; (সে উদ্দেশ্যের কথা আমরা উপসংহারে বলিব) আবার মনোরমাও ইহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না—তাহা হইলে কবির সাধের মনোরমা বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশুপতির প্রণয়বলটিও পরিষ্কার দেখান চাই। এখন উপায় কি?

অন্য কবি হইলে, এইখানেই গ্রন্থ মাটি করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এইখানে আমাদিগের কবি যে রূপে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

কবি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন—গ্রন্থ হইতে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিলেন, 'শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না।'

"এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন; পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন। অমনি মনোরমা আবার ফিরিলেন। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিলেন। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রোষ-গর্ব্ব-বিশিষ্টা, কুঞ্চিত-ভ্রূ-বীচি-বিক্ষেপ-কারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই;

কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।"

"মনোরমা কহিলেন 'পশুপতি কাঁদিতেছ কেন?' পশুপতি চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, 'তোমার কথায়।'"

"ম। কেন আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।

"পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল।"

আহা মরি মরি, কি অপূর্ব্ব কবিত্ব রে—কি চমৎকার কৌশল রে।

এ কৌশলে হিন্দুরমণী মনোরমা খুলিল—পশুপতি খুলিল—গ্রন্থকারের কার্য্য শেষ হইল। প্রথমটির কথা আমরা মনোরমা-ব্যাখ্যা স্থলে বলিব। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। পশুপতিকে রাজ্য ছাড়িতে হইল না—মনোরমাও ছাড়িতে হইল না। আর—আর—গ্রন্থকার এই প্রকারে পশুপতির সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। ফোঁটা কয়েক চক্ষের জলেই না এতটা কাণ্ড করিল। বলিহারি যাই বঙ্কিম—সাধে কি তোমাকে এত পূজা করি!—আমাদের নিকটে যে তুমি পৃথিবীস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের উপাদান। ম্লেচ্ছ কবি আমরা বুঝি না। *

এই চক্ষের জলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইল। কারণ যে ব্যক্তি দেশ রাখিলেও রাখিতে পারিত, সে এতদ্বারা সম্যক্ বিনষ্ট হইল। পশুপতিকে যে রাখিলেও রাখিতে পারিত, সেই মনোরমা আজ চক্ষের জলে মোহিতা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে—কিন্তু সে কথা আমাদিগের বক্তব্য নহে।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অনুরাগ সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা অন্যত্র বলিব। এ স্থানে আরও একটি কথা বলিতে হইবে সেটি এই—পশুপতির এই প্রণয়, পাপজ।

পাপ-প্রণয়ে সুফল ফলিতে পারে না, তাই অমন মনোরমার স্বামী এক প্রকার মনোরমার জন্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইল। পশুপতি জানেন, মনোরমা বিধবা—পশুপতি হিন্দুসন্তান, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে জাত। বিধবা-

বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, মনোরমাকে ভালবাসিবার পূর্ব্বে এ কথা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন না। মনোরমাকে ভালবাসিয়াই তাঁহার এই ধারণা হইল। নগেন্দ্রনাথেরও এইরূপ এক দিন ধারণা হইয়াছিল। এখানেও পাপে আত্ম-বুদ্ধি প্রদান করিয়া পশুপতিকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করাইল। অহো—পাপীর আত্মপ্রতারণা কি ভয়ানক ব্যাপার!

এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা দূর হইয়া পশুপতির সঙ্কল্প সুস্থির হইল। পশুপতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। অতঃপর যাহা যাহা ঘটিল, তদ্বর্ণনে আবশ্যক নাই। পশুপতি ঊর্ণনাভের মত জাল পাতিয়াছিলেন, জাল ছিঁড়িয়া গেল। বিশ্বাসঘাতক পশুপতি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে পাপের ফলভোগ করিলেন। বড়ই সুন্দর রহস্যের কথা! পশুপতি নিজে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে গিয়া রাজ্যলোভী বিধর্ম্মী মুসলমানকে বিশ্বাস করিলেন! বুদ্ধিমান পশুপতি পাপাতিশয্যে নির্ব্বুদ্ধিতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন! এইটিও বিধাতার নিয়ম। চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

চতুর্থ ভাগ।

পশুপতি ও মনোরমার শেষ কথা—পশুপতির চৈতন্য লাভ —পশুপতির শাস্তি ও পরিণাম।

সে দিনকার মনোরমা-সম্বন্ধীয় ঘটনার পরে পশুপতি নির্ব্বিরোধে স্বীয় কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিলেন। এ সকল কথা আমাদিগের পূর্ব্ব ভাগেরই বর্ণিতব্য বিষয়—কিন্তু মনোরমা সম্বন্ধীয় যে কয়টি কথা অবশিষ্ট ছিল, তাই বলিবার জন্য দুই একটী পূর্ব্বের কথাও বলিতে হইবে। শান্তশীল পশু-পতির মন্ত্রণা অনুসারে রাজাকে কৌশলে পলায়নপর করিয়া পশুপতিকে সংবাদ দিয়াছেন। পশুপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। তখন মনোরমা-চিন্তা পশুপতির প্রবল হইয়া উঠিল। ঘটনাধীন মনোরমাও তখন পশুপতির গৃহে উপস্থিত। পশুপতির আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। কিন্তু এখনও মনোরমা-প্রাপ্তি-পক্ষে দুই একটি অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে। মনোরমা বিধবা—সে পশুপতিকে বিবাহ করিতে চাহিবে কেন? এই অন্ত-

রায়টি তিরোহিত করিবার জন্য পশুপতি মনোরমাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। মনোরমা সে কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিলেন না—তিনি তখন অন্য মনে মালা গাঁথিতেছিলেন, সম্মুখে একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার ছিল, মালা গাঁথিয়া তাহাকে পরাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। "পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল ঊর্দ্ধ লাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল। মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধর হাস্যময়ীর তৎকালের অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল। পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষণেক মনোরমার মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ় বয়সী মহিমাময়ী সুন্দরী। পশুপতি কহিলেন 'মনোরমে, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর'।" সময় উপস্থিত হইল। গুপ্ত কথা সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পশুপতি জানিতে পারিলেন যে, মনোরমা বাস্তবিকই তাঁহার পত্নী। পশুপতি বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্ত হারাইলেন। একটু অনুতাপেরও কথা ছিল—কিন্তু আনন্দের বেগে তাহা তখন মনে আসিতে পারিল না। মনোরমা এখন আবার পশুপতিকে পূর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। উত্তরে পশুপতি কহিলেন—

'——মনোরমে, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি। আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে।——'

সত্যই কি তাই? কতকাংশে সত্য বটে। তখন প্রায় সব স্থির হইয়া গিয়াছিল। তখন পশুপতি ফিরিতে পারিলেও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন না।

আরও এক কথা। তখন আর পশুপতি ফিরিবেন কেন। মনোরমা

যদি তাঁহার পরিণীতা পত্নীই হইল, তবে ত কোন গোলই রহিল না, রাজ্য-লাভের সঙ্গে তাহার ত বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথা বরং পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, রাজ্যাকাঙ্ক্ষাটা অত প্রবল না হইলেও হইতে পারিত; কিন্তু এখন যে এ রহস্যভেদে পশুপতির মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। হিন্দুপত্নী আবার স্বামীকে ত্যাগ করিবে কিরূপে?

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইলাম, পশুপতির সব দিকেই হিতে বিপরীত হইতে লাগিল। দুর্জ্জনের, হয়ই এইরূপ।

অভিলষিত পাপপথে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, পাপীর প্রায়ই চৈতন্যলাভ হইয়া থাকে। পশুপতিরও তাহাই হইল। মুসলমানদিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া যখন পশুপতি দেখিলেন, তাঁহার সব ফুরাইয়াছে, তখন পশুপতির চৈতন্য হইল। এ চৈতন্যের সঞ্চার হয়, শাস্তিভোগের জন্য।

এই চৈতন্য সঞ্চারের পরেই পশুপতির শাস্তি আরম্ভ। আমরা গ্রন্থ হইতে সেই স্থানটী সবিস্তারে পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মহম্মদআলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতিপদে মৃতনাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিত-সিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জন-শূন্য,—বহু গৃহ ভস্মীভূত, কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃত দেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণযন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূলই তিনি। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে,—কেন মহম্মদআলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক,—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক,—মনে করিলেন, ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহ-মণ্ডলী-বিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না—

তীব্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন,—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিঃসৃত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত কলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না। দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ বাটী? তাহা কি যবন হস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণপুত্তলীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার কি হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহে সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়া ছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে,—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে। দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল, যবনেরা তাঁহার পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সম্বাদ প্রদান করে। আপন বিকলচিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল কলস পরিপূর্ণ হইল,—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত-নয়নে দহ্যমান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—মরণোন্মুখ পতঙ্গোবৎ অল্পক্ষণ বিচল শরীরে এক স্থানে অবস্থিতি করিলেন,—শেষে মহাবেগে সেই অনল-তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

"মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল,—অঙ্গ দগ্ধ হইল,—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্যিক দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নিকর্তৃক

আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনি-সম্পাত শব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূম, ধূলি, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল। দাবানল-সম্বেষ্টিত আরণ্য গজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্তত দাস দাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না।—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপত পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে দগ্ধ স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন,—

"মা জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়-মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়া-ছিলাম—এখন মা এক দিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?'

'মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'ঐ দেখ! ধাতুমূর্ত্তি।—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র। দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জ্জিতেছে। যে পথে আমার প্রাণাধিক গিয়াছে—সেই পথে তোমা-কেও প্রেরণ করিব। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।'

"এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলনের আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে যেমন তাহা ধারণ করিলেন, অমনি সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখনই পর্ব্বত বিদারানুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির আকাশ-পথে ধূলি-ধূম-ভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাশি রাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবনে সমাধি হইল।"

পাঠক, তুমি কখন অর্থলোভে নরবলিপ্রদায়ী তান্ত্রিকের নিকট সন্তান-বিক্রয়কারীর শেষাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছ—সেই ছিন্নমুণ্ড প্রিয়তম তনয়-

সমীপে পিতার সেই গভীর শোকাচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি পশুপতির এই গভীর শোক-মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবে। পশু-পতি হাতে করিয়া যে বঙ্গদেশকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই সন্তানতুল্য বঙ্গদেশের মৃত শরীর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ অবস্থার কারণও আবার তিনি—এ কি সহজ কষ্ট! যেমন পাপ, তেমনই শাস্তি। কবির এই শাস্তি-প্রকরণে বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়! শৈব-লিনীর শাস্তিতেও এই রূপ দেখিয়াছি। এতদপেক্ষা যদি পশুপতির শরীর খানি চিরিয়া চিরিয়া তত্তৎ প্রদেশে লবণ মাথাইয়া মৃত্তিকা প্রোথিত করিয়া কুক্কুর-ভুক্ত করান হইত, তাহা হইলেও তাহার এত কষ্ট হইত না। এ শাস্তি-বর্ণনার—আর কি ব্যাখ্যা করিব?

পশুপতির হৃদয়ে যখন এইরূপ প্রলয়াগ্নি সমুদ্দীপিত হইতেছিল, ভীষণ গর্জ্জনে পশুপতির হৃদয়, মর্ম্ম, অন্তঃস্তল সব একে একে ভস্মীভূত করিতেছিল, তখন প্রকৃতিপ্রিয় কবি পশুপতির অট্টালিকায় আর এক প্রকারের অগ্নি পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিলেন। কি সুন্দর সুর মিলিল—ঐ পশুপতি, আর ঐ তাহার হৃদয়াগ্নি—ঐ অট্টালিকা—আর তাঁহার অভ্যন্তরস্থ আগুন—কেমন এক সুরে গাঁথা। দুইই ভীষণ—দুইই তিল তিল করিয়া পশুপতিকে পোড়া-ইতে লাগিল। তোমরা এক আগুনে মানুষ পোড়াইতে পার, কবি একদেহ-বিশিষ্ট পশুপতিকে একবারে দুই আগুনে পোড়াইতেছেন। এদিকে পুড়ি-তেছে পশুপতির হৃদয়—ওদিকে পুড়িতেছে কি শুধু অট্টালিকা? তাহা নয়, ওদিকেও পুড়িতেছে পশুপতির আর একটি হৃদয়! পশুপতি জানিতেন, মনোরমা ঐ অট্টালিকা মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। আহা মরি মরি কি সুন্দর কবিত্ব রে! জ্বালাও কবিবর, এই আগুনে স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ কুসন্তানদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও কবিবর, যাহারা লোভী, দুরাশাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও কবিবর, যাহারা প্রভুহন্তা, শর-ণাগত অতিথির প্রাণবধে উদ্যত, তাহাদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও। ইহাতে কতক লোক পুড়িয়া মরুক, কতক দূরে থাকিয়া সেই যন্ত্রণা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক। তোমাদের এই ত কাজ—এই জন্যই ত তোমাদিগকে ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়াছেন, তবে জ্বালাইবে না কেন? জ্বালাও, সমস্ত বঙ্গদেশ এই আগুনে জ্বালাও। ভয় নাই, দেশ নষ্ট হইবে না—সোণার কলঙ্ক দূর হইবে মাত্র—আগুনে কি সোণা নষ্ট হয়?

এবং বাঙ্গালার অবস্থা-প্র/ যুগপৎ হাসিয়া কাঁদিয়া সে সাহায্য গ্রহণ করি-
নহেন। শয়ন গৃহে দুর্গ, বিশ্বাসঘাতক পশুপতি সৃষ্ট হইল।
বিরাজ কর্যা পতির নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা সজ্জিত হইল—
হুঙ্কার কর্ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পশুপতিতে কবিবরের প্রবল স্বদেশ-
হইল্লার স্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।
কি? ত আমরা পশুপতির জীবনচরিত হইতে যাহা শিখিলাম, তাহাই উল্লেখ
নাই—প্রবন্ধ শেষ করিব। কথাগুলি এই—
যন্ত্র কৈ পাপে যখন মন বড় আসক্ত হয়, লোকের কুমতি সুমতিরূপ ধারণ
গতাইয় চেষ্টা করে। যেরূপেই হউক, পাপের বিষয়টিকে তখন একরূপ ধর্ম্মের
পড়া শি ান করিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মে। এই সময়ে কত নূতন (Original the-
চাকরি মনোমধ্যে উদিত হয়—কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ সাবধানে আত্মরক্ষা
করিব য্য। ২। কোন লক্ষ্য বিশেষ স্থির করিয়া লোকে পাপাচরণ আরম্ভ
জ্বালিপা শেষে সেই লক্ষ্য সংসাধনের উপায় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।
বার য় সেই লক্ষ্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই তাহাকে গ্রহণ
সকল হয়। অতএব আরম্ভেই এ সকল কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।
আজ একটি পাপ করিলাম—আর কখন এরূপ করিব না—অন্ত
ভাল থাকিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব' এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শত সহস্র
পাপের প্রসূতি। ৪। অসৎ বুদ্ধির জোরে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার
কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্মানুমোদিত না হইলে, বুদ্ধি অনেক সম-
য়েই পাপযুক্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করে। ৫। সংসারী
হইয়া, অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, লক্ষ্মী ছাড়া থাকিলে, লক্ষ্মী-
ছাড়া হইতে হয়। ৬। জগতের যেটী প্রধান ধর্ম্ম—ভালবাসা, তাহাও
পাপ সংযুক্ত হইলে কুফল প্রসব করে। ৭। পরের অনিষ্ট করিয়া আমার
ইষ্টসাধনের জন্য ভগবানকে ডাকা বড়ই গর্হিত কার্য্য। ইহা দ্বারা ভগ-
বানকে ঘৃণিত চক্ষে দেখা হয়। আরও কত শিখিলাম—কিন্তু তাহা না বলি-
লেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

শিখিলাম এই, কিন্তু মনে রহিল আর একটি কথা। সে কথাটি দেখি-
য়াছি অনেক, কিন্তু তখন তাহা মনে রহে নাই—এখন বড়ই মনে সংলগ্ন
হইয়া রহিল।

কথাটী সেক্ষপীয়রের সেই (দুরাশা) ডাকিনীর কথা।

"Fair is foul, and foul is f
Hover through the fog and fi.

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর,
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।"

উপন্যাস।

মুদ্রাযন্ত্র বড় কল্যাণ-কর। মুদ্রাযন্ত্র সহস্র সহস্র শয়তানে পাঁচটার গোলামিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নহিলে এই সকল হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়িত; দেশে মহা বিভ্রাট হইত। মুদ্রাযন্ত্রে কিছু পাঠাইয়া দিবে, শয়তানিতে ঐ সকল তখনই ধাতুময় হইবে, প্রুফ পণ্ডিত তখনই তাহা শোধিত করিবে, পীব বক্স তখনই শাদার উপর কালি পাড়িতে থাকিবে, তাহার পর উপহার-পুস্তকের অবলম্বে হৌক, মাসিক পত্রের প্রবন্ধে হৌক, বা সংবাদপত্রের প্রেরিত স্তম্ভে হৌক, সেই যাহা-কিছু, দিব্য হ্রস্ব দীর্ঘির নিশান উড়াইয়া, রফলা-হ্রস্ব ুর লাঙ্গুল ছড়াইয়া, "রেফের সঙ্গীন বাঁকাইয়া ধরিয়া, বঙ্গসাহিত্যের অনন্ত আসরে, উজ্জ্বল কজ্জল বেশে বিরাজ করিবে। মুদ্রাযন্ত্রের মত কল্যাণকর আর কিছু আছে কি? মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে যাহা কিছু সমস্তই—

সমানি সম-শীর্ষাণি
ঘনানি বিরলানি চ।

সুতরাং সুলিখিত। এমন সুবিধা সুযোগের সময়ে যে হতভাগারা সুলেখক, —অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের উপাসক—হইল না, তাহাদের গর্ভধারিণীরা বন্ধ্যা হইল না কেন? কেন—তাহা জানি না; এই মাত্র জানি, তাঁহারা বন্ধ্যা নহেন,

এবং বাঙ্গালার অবন্ধ্যা-পুত্রগণ নির্ব্বোধ নহেন, সুবিধা সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। শয়ন গৃহে অন্ধকারে চোর প্রবেশ করিলে, তখন খট্টাতলে নিঃশব্দে বিরাজ করাই সুবিধা—বাঙ্গালি তাহা করেন না কি? আর সুদূরে রুষ-ঋক্ষ হুঙ্কার করিলে, তখন দেশভক্তি রাজভক্তি দেখাইবার জন্য সখের সৈনিক হইবার জন্য দরখাস্ত করাই সুবিধা—বাঙ্গালি এরূপ সুযোগ কখন ছাড়িয়াছেন কি? অতএব মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সুলেখক হইবার সুযোগও বাঙ্গালি ছাড়েন নাই—বাঙ্গালি সকলেই সুলেখক। কিন্তু লিখিবার যন্ত্র আছে—পড়িবার যন্ত্র কৈ? হতভাগা ইংরেজ! এক্জিবিশন্ খুলিবি ত আগে হাতে পয়সা গতাইয়া দিলি না কেন? শুধু কি জিনিসপত্র দেখিয়াই তৃপ্ত হইব? লেখা পড়া শিখাইবি ত ভাল চাকরী দিবি না কেন? লেখাপড়া কি ধুইয়া খাইব? চাকরি দিবিত মোটা মাহিয়ানা দিবি না কেন? পুরুষানুক্রমেই কি চাকরি করিব? মদের আমদানিই যদি করিবি, তবে আবার টেক্স নিবি কেন? স্যাম্পিন্ কি কেবল তোরাই খাবি, আমরা কি দেশের কেহ নই? ছাপি-বার যন্ত্র করিলি ত, পড়িবার যন্ত্র করিলি না কেন? হতভাগারা তোমাদের সকল কাজেই আধা আধি?

বক্র চরণ বিক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে প্রবিষ্ট গ্রন্থকার বাবু। তাঁহার অঙ্গরক্ষ কক্ষ মধ্য হইতে নব মুদ্রিত পুস্তকের বড় বড় দুই একটি নামাক্ষর —নবোঢ়া বধূর ত্র্যঙ্গুলী-বিদীর্ণ অবগুণ্ঠনের মধ্যস্থ চক্ষুর মত—উঁকি মারি-তেছে। "আসুন, বসুন, ভাল হয়ে বসুন, আপনার পিরাণের পকেটে ওখানি কি?" "আজ্ঞে, একখানি নূতন পুস্তক—নাম 'বিষম সমস্যা,' আপনাকে উপহার দিতে আনিয়াছি।" হস্তে প্রদান। গৃহীতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া— এখানে সেখানে দেখিয়া—"এ সকল সমস্যার অনেকগুলির উত্তর 'পুষ্পাঞ্জলি'তে আছে।" "আজ্ঞে কুসুমাঞ্জলি ন্যায়শাস্ত্র—তত বিদ্যা আমাদের নাই।" "আমি ভূদেব বাবুর পুষ্পাঞ্জলির কথা বলিতেছি।" "আজ্ঞে তাহাও পড়ি নাই।" তখন বাবুকে শিষ্টাচারে মিষ্টালাপে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম —এ দেশে ছাপিবার কল আছে—অথচ পড়িবার কল নাই, তাহাতেই এই বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের দেশের জ্বর, দেহের জরা, নদীর চড়া, নদের ভাঙ্গান, চিনির গবাস্থিকতা, ঘৃতের ভেজালতা, যুবকের বাচালতা, যুবতীর চপলতা—এ সকলের জন্য ইংরেজ যখন দায়ী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখন, এই লিখিবার যন্ত্র থাকা, অথচ পড়িবার যন্ত্র না থাকার জন্য ইংরাজ যে দোষী তাহা

কি আবার বলিতে হইবে? ইংরাজ দোষী সুতরাং আমরা খালাস; কাজে কাজেই আমরা নির্দ্দোষ; অতএব নিশ্চিন্ত।

যন্ত্র আছে বলিয়া আমরা সকলেই সুলেখক—যন্ত্র নাই বলিয়া আমরা সকলেই অপাঠক। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাউক, যে বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিত হয়, পঠিত হয় না———

বিলক্ষণ! সে কথা কে বলিবে? গোড়াতেই অশুদ্ধ হইয়াছে—তাইতে মীমাংসায়ও গোল পড়িতেছে। ইংরেজ আমাদের উপর যতই কেন, দ্রোহিতার আচরণ করুন না, ভগবান্ ত আছেন। ইংরেজ এই যে, ভাত রাঁধিবার, মাড় গালিবার, জ্বরে ভুগিবার, মড়া পোড়াইবার কল আনে নাই—তা বলিয়া কি আমরা ভাত খাই না, না জ্বরে ভুগি না—না মরিলে পুড়ি না—সকলই ত আমরা করি। তোমরা ইংরেজের গোঁড়া,—তাই ইংরেজের কলের গৌরব কর—আবার ইংরেজকেই গালি পাড়—ইংরেজ বিরূপ হইলই বা—ভগবান্‌ত স্বরূপে স্বপ্রকাশ আছেন।

ভগবানের যে অপার করুণাবলে, বাঙ্গালি সন্তানের জন্মদাতা হইয়া নিশ্চিন্ত, পালনের ভার গৃহিণীর উপর, সেই করুণাবলেই বাঙ্গালী লিখিয়া নিশ্চিন্ত, পাঠ করিবার ভার সেই গৃহিণীদের উপরেই আছে; বলিহারি—সামঞ্জস্য সাধন! আর বলিহারি শ্রম বিভাগ! এমন নৈলে কি সংসার চলিত গা? সকল বিষয়েরই যেমন হোক, একটা ভাগ বাটোয়ারা চাই—এই আমরা টেক্স দিই, ইংরেজেরা বৃত্তি ভোগ করেন; আমরা দক্ষিণা দি, পুরোহিত ঠাকুর ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন—সেইরূপ আমরা লিখি, উহাঁরা পাঠ করেন।

অতএব বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিতও হয়, পঠিতও হয়; তবে

যারা লেখে তারা পড়ে না;

যারা পড়ে তারা লেখে না।

লেখক পাঠকের এইরূপ অদ্ভুত বিড়ম্বনা অভূতপূর্ব্বরূপে সমঞ্জসীভূত হওয়াতে—বাঙ্গালায় প্রতিনিয়তই একরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সে গুলির নাম—উপন্যাস। উপ-সর্গে একটু রঙ্গদারি আছেই আছে; উপন্যাস অর্থে রঙ্গদারি কেতাব—সাধু ভাষায় রঞ্জন-কর পুস্তক।

প্রকৃতি রঞ্জনেই রাজার রাজত্ব—পুরুষের পুরুষার্থ। সেই প্রকৃতিপুঞ্জই যখন আমাদের লেখনের লক্ষ্য, তখন, রঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ। অতএব বঙ্গ ভাষায় মনোরঞ্জক গ্রন্থের বা উপন্যাসেরই প্রাদুর্ভাব।

রঞ্জন-নীতি ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কিছুই কি নাই? আছে বৈকি—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি—সকলই আছে। কিন্তু সকলই ঐ মূল নীতি—রঞ্জন নীতিতে ওত-প্রোত। বাঙ্গালায় ধর্ম্মনীতির অমৃত, রাজনীতির গরল, গার্হস্থ নীতির মধু—এবং শিক্ষানীতির নিম্ব—সকলই সমভাবে উপন্যাসে উপন্যস্ত হইতেছে। প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকাগ্রগণ্য স্বীয় স্বীকারোক্তি কলমবন্দি করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য যাহা কিছু প্রায়ই উপন্যাসে প্রকাশিত করেন; আর মুদ্রা-বিভ্রাট-গ্রস্ত মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীগণও অনবরত উপন্যাস বিন্যাস করিয়া প্রমাণীকৃত করিতেছেন, যে বাঙ্গালায় উপন্যাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। [এই স্থলে পাঠকগণকে—শ্রীবিষ্ণু, আপনার কথা আপনিই ভুলিতেছিলাম—পাঠিকাগণকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন বঙ্গে নাটক নামে প্রচারিত গ্রন্থ গুলিকেও উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করেন, কেননা সে গুলিতে কেবল উপন্যস্ত বিবরণ আছে—নাটকত্ব কিছুই নাই।]

দুই আর দুয়ে চারি, যদি এই গণিততত্ত্ব দেশে বুঝাইতে হয়—'তোমার দেশকে তুমি ভাল বাসিও'—এ কথা যে দেশে দিবারাত্র শিখাইতে পড়াইতে হইতেছে, সে দেশে যে গণিতের ঐ গভীর তত্ত্বও অচির কাল মধ্যে বুঝাইতে হইবে, এমন ভরসা আমাদের সম্পূর্ণই আছে—যদি তেমনই সুদিন, আর তেমনই সুযোগই হয়—যদি দুই আর দুয়ে চারি এই কথা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে লিখিতে হইবে—

"সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বিজয়পুরের বিজন গঙ্গাতীরের কুল কুল ধ্বনিতে তটস্থ ঝিল্লীরবের স্বর সম্মিলন হইতেছে, অষ্ট বর্ষ বয়স্ক বিপিন চারি বৎসরের ললিতার গলা জড়াইয়া বেড়াইতেছ; ধূসরাকাশে একটি তারা টীপ্ করিয়া দেখা গেল। বিপিন বলিল "ললিতে—তোমার আমার কয় চক্ষু?" ললিতা বিপিন দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকে হাসিল—বলিল 'জানি না।' —তখন বিপিন ললিতার হস্ত লইয়া একে একে আপনার চক্ষু দুটি ও ললিতার চক্ষু দুটিতে স্পর্শ করিতে লাগিল—আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—'এক, দুই, তিন, চারি—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"এখন বল—তোমার আমার কয় চক্ষু?" ললিতা হাসিয়া বলিল 'চারি চক্ষু?'—বিপিন বলিল দেখ ভুলিও না—দুই আর দুয়ে চারি হয়, তখন আবার সেই চারি চক্ষু মিলিত হইল—মরি মরি! বালপ্রণয়ের কি মাধুরি!"—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

ললিতা বিপিনের উপন্যাস—উভয়ের বিবাহে অর্থাৎ চারি চক্ষুর শুভ

সম্মিলনে সমাপ্ত। এরূপ মনোহর উপন্যাস পাঠের পর দুই আর দুয়ে যে চারি হয়—তাহা তোমরা কি আর কখন ভুলিতে পারিবে? যদি তোমরা তবু ভুলিয়া যাও—তবে কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইবে—তোমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই--যদি উপন্যাস পাঠ করিয়াও ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি তোমরা না শিখিতে পার—তবে তোমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

আমরা—অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি গ্রন্থকারেরা—এবং ছোট বড় মাঝারি সমালোচকেরা—দুঃখিত—অর্থাৎ বিড়ম্বিত। যদি পাঠকের প্রবৃত্তি দোষে উদ্দেশ্য উপলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে, গ্রন্থকার মহা বিড়ম্বিত হন।

বঙ্গের সাধারণ পাঠকের কেবল বাল-স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার এবং মজা দেখিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকাতেই, তাঁহারা নারী জাতির অন্তর্গত এবং পাঠকের ঐরূপ অগভীর প্রবৃত্তি হওয়াতেই—সকল শ্রেণীর গ্রন্থকার অগত্যা তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ ব্যগ্র। ফল এই হইতেছে—পুস্তক পাঠে পাঠকের ক্ষণিক রঞ্জন হইলেই, পাঠক একটু মজা পাইলেই, আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সকল সদ্গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য-লোক শিক্ষা। লোকে কিন্তু রঞ্জন অরঞ্জনই বুঝে, রঞ্জন হইলেই চরিতার্থ হয়। সুতরাং বাঙ্গালার অধিকাংশ সদ্গ্রন্থই অধিকাংশ স্থলে বিড়ম্বিত।

ও দিকে আবার অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থ মাত্রের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাজে উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত হন। পালা ভুলিয়া গিয়া সঙের পর সঙ দিয়া যাত্রা শেষ করেন। পূর্ব্বে প্রতি পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন হইত, দুধ দয়ে মুখ দিবে বলিয়া সকাল হইতে বিড়াল বাধা হইত; এখন ব্রাহ্মণভোজন আর হয় না, দুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু পূর্ণিমায় বিড়াল বেচারা বাঁধা পড়ে; অনেক গ্রন্থেরও ঠিক এই দশা—দুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু বিড়াল বাঁধা। আছে—সারা দিন তার মেও মেওয়ানি—গল্প ত কেবল গল্প—হাঁফ ছাড়িতে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি দুইখানি উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করা গেল; দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। এই দুখানির তুলনা করিলে, আমরা উপন্যাস গ্রন্থের গ্রন্থন-রহস্য বোধ হয় অনেক বুঝিতে পারিব।

একখানির নাম চন্দ্রা, অন্য খানির নাম জলাঞ্জলি।* দুই খাঁনিতেই

* চন্দ্রা—উপন্যাস। কলিকাতা—বন্দ্যো ও মুখর্জি প্রকাশক। ১২৯৪।
জলাঞ্জলি—নবন্যাস, এল এম্ দাস এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ঢাকা।

গ্রন্থকারের নাম বা কোনরূপ পরিচয় নাই। অল্প মাত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—যে চন্দ্রার গ্রন্থকার পাকা লেখক ও তুখড় লোক এবং জলাঞ্জলি-কার চিন্তাশীল লোক হইয়াও এখনও মক্স করিতেছেন। অথচ এটিও দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবীণ নবীন উভয় গ্রন্থকারই চির প্রথানুসারী পূর্ব্ব লেখকগণের উপর একটু সাহঙ্কার, একটু সশ্লেষ ভ্রূকুটি করিতেছেন। চন্দ্রা-কার বলিতেছেন—"আমরা এত কথা বলিতেছি, কারণ এমনি কতকগুলা বলিতে হয়" (৩৬ পৃষ্ঠা)। ভাবটা, যেন পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস লেখকগণ বড় বাজে কথার ভক্ত। জলাঞ্জলি দাতা প্রায় প্রথমেই বলিয়াছেন,—"আমরা স্বকপোল কল্পিত কিছুই বলি নাই, লোকের যাহা বিশ্বাস ছিল ও যাহা জনশ্রুতি ছিল, তাহাই যথাযথ বর্ণন করিয়াছি।" ভাবটা, যেন পূর্ব্ব লেখকগণের স্বকপোল-কল্পনা বড়ই নিন্দনীয়। উভয় গ্রন্থকারেরই যখন পূর্ব্ব লেখকগণের উপর ঐরূপ শ্লেষ কটাক্ষ, তখন উভয়েই যে উপন্যাস রচনে নূতন প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। নূতন পন্থা খুঁজিতে গিয়া দুই জনে দুই বিভিন্ন দিকে গিয়াছেন। চন্দ্রা কারের চেষ্টা—ভাষার চুটকিতে চটক দেখাইব; ঘটনার পর ঘটনা জুটাইয়া স্তম্ভিত করিব; পাঠককে হাঁফ ছাড়িতে দিব না; মনের কথা ইঙ্গিতে বলিব, তোমরা আপন মনে পরের মনের ইচ্ছামত বিশ্লেষণ করিও। জলাঞ্জলি-কারের নবীনত্ব ভাষার অকাপট্যে এবং কায়দাহীনতায়; ২৫০ পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধ গ্রন্থে ঘটনা মোটে তিনটি। সে গুলি আবার বঙ্গে নিত্য লক্ষিত,—বিবাহ, বৈরাগ্য ও মৃত্যু। কিন্তু লোকের মনের ভাব তিনি বিশ্লেষণের উপর বিশ্লেষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই।

চন্দ্রার গ্রন্থে ভারতের সেই অদ্বিতীয় ঘটনা—সাতান্ন সালের সিপাহী সমর; অভিনায়কগণ—ইংরেজ দ্বেষ্টা সিপাহী সকল—মহা কৌশলী সন্ন্যাসী-কুল,—উন্মাদিনী তেজস্বিনী ভিখারিণী—ইংরেজপালিতা পাঞ্জাবী কুমারী চন্দ্রা—নানা সাহেব প্রমুখ বিদ্রোহীদল ও লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি ইংরেজের উচ্চ কর্ম্মচারী। চন্দ্রায় আছে—পুত্রত্যাগ, কন্যাত্যাগ, স্ত্রীত্যাগ, স্বামীত্যাগ, গৃহত্যাগ, সমাজত্যাগ—ডাকাতি, দস্যুতা,—যুদ্ধ, বিদ্রোহ—সন্ধি বিগ্রহ—ক্ষমা নিগ্রহ—সঙ্গীন কাণ্ড, তুমুল ব্যাপার ও বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য। জলাঞ্জলির রঙ্গভূমি—অধিকাংশ বঙ্গ লেখকের তুচ্ছীকৃত, 'নগণ্য' পূর্ব্ব বঙ্গের সামান্য দুইটি পল্লী—অভিনায়ক ও অভিনায়িকা—এতদঞ্চলীয় অধিকাংশের উপহাস ভূমি—

'বাঙ্গাল' নর-নারী ; আর ঘটনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাঙ্গালির নিত্য কর্ম্ম ; দৃশ্য গৃহস্থের গৃহস্থালি, সামাজিকের সভাস্থল, কুলবধূ পরিবেষ্টিত বিবাহ-বাসর এবং ভক্তি-সেবিত দেবী মন্দির। চন্দ্রা পড়িয়া, ঘটনার ও মানুষের খতিয়ান করিয়াও জমা খরচ মিলাইতে পারি নাই, জলাঞ্জলিতে লেন দেন বড় সামান্য, জমা খরচ মিলাইলেও যা—না মিলাইলেও তাই। চন্দ্রার বীর ভয়ানক রৌদ্র অদ্ভুত রসে আমরা চকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত হইয়াছি ; জলাঞ্জলির সামান্য, শান্ত-করুণে, নিঃশব্দ শান্ত-করুণে, অনাড়ম্বর শান্ত-করুণে, শান্তিপ্রদ শান্ত-করুণে—আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, চোখের জল ফেলিয়াছি। চন্দ্রার সকলই অদ্ভুত—রামচাঁদের পর-পুত্রে স্নেহ অদ্ভুত—নবীন সন্ন্যাসীর স্বদেশ-বাৎসল্য-ব্যঞ্জক গান অদ্ভুত, তাঁহার কথা বার্ত্তা অদ্ভুত—ভিখারিণীর স্বামী ভক্তি অদ্ভুত— চন্দ্রার অভিমান অদ্ভুত—সকলই অদ্ভুত,—

কিন্তু চন্দ্রা নিশ্বাস ফেলিতে দেয় না, হাঁফ্ ছাড়িতে দেয় না, কাঁদিতে দেয় না—গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু শোয়াস্তি হয়। রেল গাড়িতে ত আমরা কত কি দেখিতে থাকি,—ঐ পাহারাওয়ালা গলা ধাক্কা দিল—ইস্, মানুষটা পড়ে ছিল একটু হলে ; ঐ জল্ জল্ করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ঐ এক জন সাহেব চলন্ত গাড়ীতে দৌড়িয়া উঠিল—সেই পাহারাওয়ালাই সেলাম করিতেছে ; ঐ কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়াছে—কি ভীষণ ধূম!—আহা বুড় মিন্‌সে আঁচাতে এসে পড়ে গেল গা—দূর ম্যাগী, শীগ্‌গির তুল্‌সে, হাসিস্ কেন? বা! কাজি পাড়ায় দম্-মাদার বাহির হইয়াছে—বাঁশটা পড়িল পড়িল, খুব সাম্‌লেছে, সাম্‌লেছে কৈ? এ পাড়ায় এদের ছেলে মরেছে! ঐ মেয়ে মানুষটিরই ছেলে হবে—দূর মাগী আর জলে ডুবে মরে না—কেবল বামে জমা করিতে শিখিযাছিস, এখন ডাহিনে খরচ লিখিতে শেখ্—ত্রিশ বিঘা ধরিল না—ঐ হুগলি—কত কি অদ্ভুত দেখিতে-ছিলাম বটে, তবু বাড়িতে আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া শোযাস্তি হয়। চন্দ্রার পর জলাঞ্জলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের ঠিক্ সেই রূপ মনের অবস্থা হয়। সেই ঘর্ঘরানি ঝড়ঝড়ানি এড়াইয়া, সেই চলৎ চলৎ চলৎ ভাব ছাড়াইয়া, নিরেট মাটীর উপর বসিয়া একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ পাইলাম। এতক্ষণ নানা ভাবে কেবল হা করিয়া দেখিতেছিলাম, এখন ঘরে আসিয়া ক্লেশে কষ্টে কাঁদিতে পারিলেও আরাম আছে। চন্দ্রা বিপ্লব—জলাঞ্জলি আরাম।

চন্দ্রা ও জলাঞ্জলির আরও একটু তুলনা আবশ্যক। আজ কাল বাঙ্গালার প্রায় সকল গ্রন্থেই দেশভক্তির ভাব—কোন না কোনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থেও আছে। কিন্তু বড় ভিন্ন মূর্ত্তিতে। সাতান্ন সালের সিপাহী সমরের কথা যে গ্রন্থের উপজীব্য, তাহাতে দেশভক্তি অবশ্য প্রসঙ্গতই থাকিবে, চন্দ্রাতে সেই ভাবেই আছে; তবে চন্দ্রা উপন্যাসের সকল দেশভক্তির মূলেই সংসার বিরাগ আছে। একজনকে অতি শিশু কালে তাহার মা পাগল হইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া গেল; যে দয়া পরবশ হইয়া কুড়াইয়া লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল, ঘটনাক্রমে তাহার জেল হইল। তাহার স্ত্রী দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ছেলেটির বড় মানুষের বাড়ীতে লাঞ্ছনার শেষ হইল, মিছামিছি চোর বদনাম পর্য্যন্ত দিলে—ছেলেটি প্রাণের ভয়ে সংসারত্যাগী হইল—সেই সোমনাথ একজন দেশভক্ত। আবার সোমনাথকে যিনি দেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার সমাচারও বলি। এক ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে কারাগারে হত্যা করা হয়। জনার্দ্দন নামে তাহার একটি পালিত পুত্র ছিল, সে সেই পালক পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইল। হঠাৎ প্রেমের ফাঁদে বাঁধিয়া গেল। একটি কুমারীকে বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিল। অযোধ্যায় একটি তালুক কিনিয়াছিল, ইংরেজেরা তাহা কাড়িয়া লইতে চান—সে রাগান্ধ হইয়া একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে বধ করিল। সুতরাং গা-ঢাকা দিয়া বাস করে। এক দিন রাত্রিতে ঘরে আসিয়া দেখে, যে তাঁহার স্ত্রীর কাছে একজন সাহেব বসিয়া আছে। আবার সন্ন্যাসী হইল, ইংরেজের শত্রু হইল, সুতরাং দেশভক্ত হইল। আর একজনের কথা বলি। রমানাথ কলিকাতার একজন বড় মানুষের অতি বয়াটে ছেলে; সহরে নূতন আমদানী বিবিয়ানা চালের একটি রমণীর উপর রমানাথের শুভ দৃষ্টি পড়িল। রমানাথ দেখেন সেই রমণীকে একজন সন্ন্যাসী গাড়ী করিয়া আনিল—এ কথায় সে কথায় সন্ন্যাসীকে মারিতে গেলেন, স্বয়ং মার খাইলেন। কতকগুলা গুণ্ডায় ধরিয়া লইয়া গেল; পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া মুক্তি পান। সন্ন্যাসী বেশে সেই রমণীর বাড়ীতে গেলেন, চোর বলিয়া ধৃত হইলেন, কারাগারে বন্দী হইলেন। শেষে প্রণয় বৈরাগ্যের সন্ন্যাসী হইলেন। ইনও একজন সুতরাং দেশভক্ত। তাহাতেই বলিতেছিলাম চন্দ্রার দেশভক্তি—সংসার বিরক্তির ফল। সকলেই যেন তাড়া খাইয়া, সোজা

পথে কাঁটা দেখিয়া, দেশভক্তির বাঁকা পথে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং নানা সাহেব রাজ্যলালসায় উন্মত্ত; তাঁহার সহচর আজিম উল্লা শ্বেত-রমণী-সম্ভোগ লালসায় ততোধিক উন্মত্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রা উপন্যাসের দেশভক্তি—কোথাও জন্মিতেছে সংসার জ্বালায়, কোথাও লালিত হইতেছে—ভোগ লালসায়। এইরূপ দেশভক্তি লইয়াই কি সাতান্ন সালের বিপ্লব? ঠিক জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করি অন্যরূপ।

জলাঞ্জলির দেশভক্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ; হিন্দুর সংসার ধর্ম্মেই ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি। এ দেশভক্তির বড় মৃদুমন্দ মূর্ত্তি। এ দেশ-ভক্তিতে চন্দ্রার বিল্পব ত নাইই—এখনকার দিনের মত বক্তৃতা, বলণ্টিয়ার, ভারতোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ধৈবত নিখাদের কিছুই ইহাতে নাই; সহজ সুরের সঙ্গে কেবল কড়িমধ্যমের একটু যোগ আছে। নমুনা দিতেছি;—

"সিকদার। দূর পাগল! সাহেবের স্ত্রীকে মেম বলে তাই, জান না?

জয়চন্দ্র। স্ত্রী! তা স্ত্রীপুরুষে এক সঙ্গে এ রকম করে বাহির হয়!

সিকদার। এরা মানুষ নয়। দেবতা। দেবতাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে লজ্জা নাই। * * * * [সুরের সঙ্গে লুকান কড়িমধ্যম রহিল যে, উপদেবতা হইলেও হইতে পারে।]

জয়চন্দ্র। হবে! আচ্ছা, ওরা এই গরমের দিনে ঐ বনাতের কাপড়গুলি গায়ে দিয়া রহিয়াছে কেন? মেঘ নাই, রৌদ্র নাই, দুজনেই একটা 'মাতলা' মাথায় দিয়া যাইতেছে কেন?

সিকদার। কে জানে বাবা, আমি তোমার এ বিট্‌কেলে কথার উত্তর দিতে পারি না। ওরা ঐরূপ কাপড় পড়ে।"

বিটকেলে কথা বলাতেই আচরণটি বিটকেল বলা হইল—ইহাতেও কড়ি মধ্যম লাগিয়াছে। অন্য স্থানে আর একটু চড়া সুর আছে—শুনাইতেছি।

কালুসর্দ্দার অপূর্ব্ব খেল দেখাইল। "লক্ষ্মণ রায় মহাশয় সাবাস্ সাবাস্ বলিয়া কালুকে দশ টাকা বক্‌সীস্ দিলেন ও চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন, "তোমরা নিজেরাই পুর্ব্বাপর লাঠিয়াল, মানুষ মারা কত রকম কল জান। তোমাদের লোক জন আর এ বিষয়ে দক্ষ হইবে না কেন?" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "লাঠিয়াল একটা গালি নয়, আমাদের মত পুর্ব্বাপর সকলেই লাঠিয়াল হইলে বিশুদ্ধ সুসভ্য হিন্দু জাতি যবনের পদানত হইয়া আত্মকুলে কালি দিত না। সোমনাথ দেবমন্দিরের চন্দন কাষ্ঠের কবাট ম্লেচ্ছ

মসজিদে ঝুলিত না। যোগ, জ্যোতিষ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি রত্ন-গুলি যবনাগ্নিতে ভস্মীভূত হইত না। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন ভুলিয়া যাইতেন না। হিন্দুর শুভ্র আচারে যবনাচারের কালিমা পড়িত না, কুলাঙ্গার হিন্দু কুল এক যবনের নিধন দেখিয়া অবসর পাইয়াও অন্য যবনকে ডাকিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইত না। খাল কাটিয়া কুমীর আনিত না। হিন্দুর শিরোভূষণ কোহিনূর অহিন্দুর শিরে আলোক প্রদান করিত না, মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গা বল্লভীচর বক্ষে ধারণ করিয়া অসার হিন্দুগণকে দেখাইতেন না।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দেখিলেন চৌধুরী মহাশয়ের চক্ষু হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য কিন্তু সময় গিয়াছে; এত আবর্জ্জনা পড়িয়াছে যে, তোমার আমার মত দুই জন বৃদ্ধ মেথরের এ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার কাজ নয়।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "সময় কখন যায় না।"

এই রূপ সুর চড়াইতে গিয়া, তানের উপর গিট্‌কিরি দিতে গিয়া, জলাঞ্জলিকার জলাঞ্জলির পূর্ণারাম ভঙ্গ করিয়াছেন। যেখানে প্রদর্শন, সেই খানেই বিড়ম্বনা—কাজেই এরূপ স্থলে গ্রন্থকার বিড়ম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থলে চন্দ্রার উচ্ছ্বাস বড়ই স্ফূর্ত্তিময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রার গ্রন্থকার রস রচনে বিশেষ পটু; প্রদর্শনের প্রদর্শনা লুকায়িতে বিশেষ পারদর্শী, একটু নমুনা দিতেছি;—

"কাঁদিতে সাহস হয় না," সিপাহীরা একথা বুঝিতে পারিল না।

যুবা বলিতে লাগিল—"আপ্পা সাহেবের মৃত্যুর পর যখন ম্লেচ্ছ পোষ্যপুত্র রহিত করিয়া মৃত রাজার স্বর্গপথ রোধ করিল, যখন সেতারা রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল, অট্টালিকা লুণ্ঠন করিয়া নিলামে ধরিল, অনাথিনী রাণীগণের রোদন যখন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কে কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? সর্ব্বগ্রাসী শ্বেত রাক্ষস যখন নাগপুর গ্রাস করিল, হিন্দুর চির প্রচলিত প্রথা ধ্বংস হইল, রাজপুত্রদিগকে ভিখারী করিল, কেহ কি কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? কেরোলি যখন শ্রীভ্রষ্ট করিল, ঝান্সা যখন পদতলে দলিল, প্রজার হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল, সম্বলপুরের কথায় কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কি কাঁদিতে পারিয়াছিল? ম্লেচ্ছ পীড়নে বাজিরাও পেশওয়া যখন রাজ্যচ্যুত হন, কার প্রাণ না কাঁদিয়াছিল?

কিন্তু কাঁদিতে কে সাহস করিয়াছে? কুবেরপুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগার হইল, ওয়াজাদালি বন্দী, দিঙ্‌মণ্ডল হাহাকারপূর্ণ—কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু কাঁদিতে কি কেহ সাহস করিয়াছিল? যখন ম্লেচ্ছ ভয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দন্তে 'কার্তুজ' কাটিবে, কাঁদিতে কে সাহস করিবে?

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।"

সন্ন্যাসীর মুখে এ সকল কথা শুনিলে যে সিপাহী সকলে স্তম্ভিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পড়িতে পড়িতে আমাদিগকেই স্তম্ভিত হইতে হয়—সত্য সত্যই মনে হয়—যেন কান্না আসিতেছে অথচ কাঁদিতে পারিতেছি না। চন্দ্রা গ্রন্থের ইহাই উৎকৃষ্ট গুণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার দোষ——চটক চমকের অনবরত প্রদর্শন, অঘটন ঘটনার নিয়ত ঘটঘটানি; ইহাতে ঘটনার বিপ্লবে মানসিক বিপ্লব ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকার প্রদর্শন পটু বলিয়া অনবরত দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, দেশভক্তির বীজ সংসার বৈরাগ্যে বপন করিয়া নিঃস্বার্থ দেশভক্তির অনুপপত্তির অসাধু সঙ্কেত করিয়াছেন এবং চন্দ্রার প্রগাঢ় প্রণয়ে দারুণ অভিমান আরোপ করিয়া চন্দ্রার হিন্দু-রমণীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু নারী ক্ষমা, চন্দ্রা নহে।

জলাঞ্জলি-কারের লেখা কাঁচা—হৃদয় পোক্ত। তিনি প্রদর্শনের পন্থা সাধারণত পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি মনোরঞ্জনে লক্ষ্য না করিয়া আবার উপন্যাস আকারে তাঁহার হিন্দুভাব ব্যক্ত করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। লেখা লিখিতে লিখিতেই পাকিবে। চন্দ্রার উপন্যাস-কর্ত্তাকে অনুরোধ, তিনি ঘটনার আবর্জ্জনা কিছু কমাইয়া, তাঁহার জমাট লেখায় জমাট ভাষায় একখানি চমক চটক বিবর্জ্জিত উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠককে এবার যেন উপহার দেন।

সেকালের দারোগার কাহিনী।

পরিচয়ে সমালোচনা।

নবজীবনের তৃতীয় বৎসরের আরম্ভে, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ হইতে। সেকালের দারোগার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে, চতুর্থ বৎসরের শেষে ১২৯৫ সালের আষাঢ়ে কাহিনাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। কাহিনীগুলির খণ্ডশ প্রচারে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্যোগা ছিলাম, এক্ষণে এই পুস্তক প্রচারের অবসরে, দারোগা মহাশয় এবং দারোগা মহাশয়ের কথিত কাহিনীগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল, গিরিশবাবু নবদ্বীপের দারোগা হন। গিরিশবাবু ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মালখা নগরের বসু গোষ্ঠী সম্ভূত। এই বসু গোষ্ঠী অতি প্রাচীন। মালখা নগরের সে-ঘরের ইষ্টকফলকে বঙ্গাক্ষরে খোদিত বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, ইহাঁরা ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহের আমল হইতে ঐ নগরে বাস করিতেছেন। এই বংশ যেমন প্রাচীন, তেমনি সম্ভ্রান্ত এবং পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার পর, গিরিশবাবু হিন্দু কলেজের সীনিয়ার স্কলার, ইংরাজিতে সুপণ্ডিত এবং বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যখন গিরিশ বাবু চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষের পিতা এবং গিরিশবাবুর মাতুল রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর কৃষ্ণনগরের সদর আলা। তাঁহার নাম ডাকে তখন কৃষ্ণনগর অঞ্চল প্রতিধ্বনিত হইত। সুতরাং গিরিশ বাবু বড় লোকের ভাগিনা, বড় ঘরের ঘরানা, এবং ইংরাজি শিক্ষায় বড় মর্দ্দানা ছিলেন; তাঁহার মত উচ্চ বংশোদ্ভব, উচ্চ সম্বন্ধে পরিচিত, এবং উচ্চ শিক্ষায় উন্নত লোক তখনকার দিনে দারোগাগরিতে অতি অল্পই প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর তখনকার দিনেই বা বলি কেন? এখনকার দিনেও,—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা ছড়াছড়ির দিনে—গিরিশবাবুর মত লোক সব্ইনস্পেক্টরি বা ইনস্পেক্টরিতে কয়জন আছেন? ভাল লোক প্রায়ই পুলিশের কর্ম্মে যান না—ইহা কতকটা আমাদের অর্থাৎ লোকেদের দোষ, আর কতকটা

লোক শিক্ষক, লোক-প্রতিপালক সরকার বাহাদুরের দোষ। বড় নিষ্ঠুর না হইলে, পুলিশের কার্য্যে সফলতা হয় না; গিরিশবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন,

"আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে একদিন একরাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম, এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এখানে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা! পরমেশ্বর এই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি।"

"বরমেব ভিক্ষা, তরুতলে বাস—তথাপি যেন ভদ্র সন্তানেরা পুলীশের চাকরি না করেন!!!"

গুণধর গিরিশবাবু দারোগাগিরিতে প্রবেশ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, কি অকৃতি হইয়াছিলেন, সে কথার বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি, সে পরিচয় নবজীবনের পাঠকেরা পাইয়াছেন ও পুস্তকের পাঠকেরা পাইবেন; পুস্তকের সম্যক্ পরিচয়ার্থ গিরিশ বাবুর যতটুকু চৌহদ্দী জানা আবশ্যক আমরা তাহাই দিলাম। আমাদের কথাটা এই দারোগার কাহিনী—হরিদাসের গুপ্তকথা অথবা রামদাসের ব্যক্ত কথা নহে; দারোগার কাহিনী—সত্য সত্যই দারোগা গিরিশচন্দ্র বসুর লিখিত আপন জীবনের আংশিক কাহিনী।

দারোগার কাহিনীর উদ্দেশ্য গিরিশবাবু স্বয়ং সরল ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। "আজকাল কতজন কত রূপক, কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবি কালে বঙ্গ দেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে, অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠক গণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের সাহায্য উদ্দেশে, এই দেশের মনুষ্যদিগের কীর্ত্তি কলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিশের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজ নীলকরদিগের ও বাঙ্গালী জমীদারদিগের প্রবল প্রতাপ ও ততোধিক বিস্ময়কর পতনের বিবরণও দারোগার কাহিনীতে আছে। অনুসঙ্গে তখনকার সাহেব শুভার আচার ব্যবহার, গরীব দুঃখীর

রীতি নীতি এবং সাধারণত দেশের লোকের আমোদ আহ্লাদের এবং সুখ দুঃখের অনেক কথা আছে।

কথায় বলে,—বলে,—আসলের কাছে আবার নকল? Truth is strange, stranger than fiction. সত্যাহি ঘটনা চিত্রা কল্পনাতো হতিরিচ্যতে। সত্য যদি বুঝিতে জান, দেখিতে জান, বলিতে জান, লিখিতে জান—তবে সত্যের অপেক্ষা অদ্ভুত আর নাই। গিরিশ বাবুর বলিবার, লিখিবার গুণে দারোগার সত্যকাহিনী বড় অদ্ভুত বৃত্তান্ত। অনেক উপন্যাস হইতে এই অনুন্যাস বড়ই অদ্ভুত। গিরিশ বাবুর বর্ণনার রসময়ী বঙ্কিম ভঙ্গিমা দেখিয়া কল্পনা বহুদূরে দিদীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আসরে জগৎ মনমোহিনী কীর্ত্তন গাহিতেছে দেখিয়া বামা আর পা ধুইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া চলিয়া গেল।

গিরিশ বাবু মনোহরকে বর্ণন করিতেছেন,—"মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; আরও সুখ-সচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ; কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকার দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষঃস্থল; পুষ্ট বাহুযুগল; কোমর চিকণ; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণ বিশিষ্ট; গলদেশ মোটা ও খাটো—যাহাকে পারসী ভাষায় কোতাগর্দ্দন বলে। চক্ষু ছোট, পিট্ পিট্ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ —কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। * * * * মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল, যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কেননা গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথানুসারে তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।"

দেখ, কেমন একটী আদর্শ গোয়ালার মরদ খাড়া হইয়াছে—আর কল্পনা কি করিবে বল? তাহাতেই বলিতেছিলাম—আসলের কাছে কি নকল?

গিরিশ বাবুর ভাষার কথা পরে বলিতেছি, এইস্থলে ভাষার একটী বিচিত্র কায়দার কথা বলা আবশুক। "কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত।" হঠাৎ এই ব্যাটা কথাটি ব্যবহার করাতে গ্রন্থকার—মনোহরকে আপনার সম্মুখে আনিয়াছেন, সে যে হীন জাতীয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন এবং অবজ্ঞা সূচনায় তাহার প্রতি ঘৃণা দেখাইয়াছেন। ঐ ক্ষুদ্র কায়দার গুণে আমরা মনোহরকে যেন

চোখের উপর দেখিতে পাই—আর সে যেন অপদস্থ হইয়াছে—আর গিরিশ বাবু টিপি টিপি হাসিতেছেন—এমনই মনে হয়। গিরিশ বাবুর বর্ণনা কল্পনার সাহায্য লয় না, কিন্তু নিজে কল্পনার সাহায্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশ বাবু ইংরাজিতে সুশিক্ষিত এবং গ্রন্থেই প্রকাশ তিনি দারোগাগিরিতে দীক্ষিত। এই শিক্ষায়, দীক্ষায় গিরিশ বাবুর ভাষা সাধারণত ইংরাজির পরিষ্কৃতি ও ভাব-ব্যঞ্জকতা এবং দারোগা মহাশয়ের রিপোর্টের জটিলতা ও দীর্ঘচ্ছন্দতা পাইয়াছে। গিরিশ বাবুর ভাষায় ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন নাই, কুসুম সুষমার মৃদুমন্দ হাসিও নাই কিন্তু তথাপি ভাবের পরিপোষণে একরূপ দীর্ঘচ্ছন্দতা আছে, রিপোর্টের মত একটি বাক্যের (Sentence) মধ্যে দুইটী গর্ভ বাক্য আছে—কিন্তু ভাবের ধূসরিমা কোথাও নাই; শরতের আকাশের মত সর্ব্বত্রই পরিষ্কার, সর্ব্বত্রই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। তাঁহার ভাব তাঁহার ভাষার কাছে কোথাও কিছুমাত্র ধার করে নাই—তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্রই তাঁহার ভাবের কাছে ঋণী—এই ঋণ আর একটু শুধিতে পারিলেই ভাল হইত।

দারোগার কাহিনীর আর একটি গুণ, ইহাতে গ্রন্থকার প্রায়ই কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই—নীলকর, জমীদার,—ধনী, দুঃখী—পোলিস প্রহরী—সকলেরই দোষগুণ তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। নিজের দোষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে তাঁহার উপরওয়ালাদের সমস্ত দোষের কথা তিনি যে বিবৃত করিয়াছেন—একথা বলিতে আমরা পারিব না। নাই পারি, তথাপি বলিব যে, দারোগার কাহিনী, এক চোখো—এক ঘেয়ে—একপক্ষপাতের লেখা নহে।

গ্রন্থকার ছোট কথা তুচ্ছ করেন না। মনোহর যখন ঢেঁকিতে বাঁধা তখন খোট্টা জমাদার আসিয়া একজন চৌকীদারের বস্ত্র দিয়া সেই ঢেঁকীর ধূলা পরিষ্কার করিয়া, সেই ঢেঁকীতে বসিল। এ সকল অতি ক্ষুদ্র কথা—দারোগা মহাশয় তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত ভুলেন নাই এবং আমাদের কাছে বলিতেও ভুলেন নাই। যে ছোটকে ভুলে না, সেইত ভাল; সেইজন্য আমরা বলি,—যথা কথা বর্ণনায় গিরিশ বাবু একজন ভাল লেখক। আর তাঁহার কাহিনী, অরঞ্জিত ঘটনার নিরপেক্ষ, ধীর, বিশদ বর্ণনায়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অথচ সর্ব্ব-জন-রঞ্জন উপাদেয় গ্রন্থ।

মূর্খ।

(সমাজ রহস্য)

প্রথম অধ্যায়

"মূর্খ"—অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাকেও লোকে বলিয়াছে, আমিও হয়ত দু একজনকে বলিয়া থাকিব,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উহার সূত্র অবগত নহি। লেখা পড়া না জানিলে যদি মূর্খ হয়, তবেত জগতের বেশী লোকই মূর্খ। "দশ জনের মত হওয়া চাই"; এই কথার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে মূর্খ হইলেই বা ক্ষতি কি? আর যদি লেখা পড়া শিখিয়াও মূর্খ হইতে পারা যায়, বা অন্য লোকের তাহাকে মূর্খ বলিবার অধিকার থাকে, তবে একজনকে মূর্খ বলিলে 'সে চটে কেন? মূর্খ শব্দের সহিত ইংরেজী "ডনস্" শব্দের যদি সাদৃশ্য থাকে, তবেত মূর্খ অর্থ—ঘোর তার্কিক পণ্ডিত, কেননা "ডন্স-স্কোটস্" একজন কুট তার্কিক পণ্ডিত ছিলেন। ডন্স স্কোটস্ ইংরেজদের, এবং ষণ্ডামার্ক আমাদের,—উভয়ই পণ্ডিত, কিন্তু দশজনের জিহ্বার বলে ইহারা মূর্খের আদর্শ শ্রেণীভুক্ত।

আমাদের ভূতনাথকে এইরূপ মূর্খের শ্রেণীভুক্ত বলিতে পারি না। কেননা ভূতনাথ পণ্ডিত নহেন, বা তার্কিকও নহেন। তথাপি তাঁহার দেশের লোকে তাঁহাকে বলে "মূর্খ"!

বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিবার অগ্রে সকলেই মূর্খ। কিন্তু তখন হইতেই ভূতনাথ মূর্খ এবং তাহার সমবয়সীগণ পণ্ডিত। কেননা ভূতনাথ পিতৃহীন, অনাথিনী দুখিনীর সন্তান, বস্ত্রহীন, তৈলহীন, আদর হীন, অঙ্কহীন, ধুলিতে লুটাইয়া ভূতের মত থাকিত। আর তাহার সমবয়সীরা নিকর-বুকর পরিয়া, জরির টুপি জরির পাদুকা পরিয়া, দাস দাসীর কক্ষে বক্ষে স্কন্ধে শিরে গহনার ন্যায় শোভা পাইত। সুতরাং তাহারা পণ্ডিত, ভূতনাথ মূর্খ।

ভূতনাথ স্কুলে যাইতে শিখিল। তাহার সমবয়সীরাও যায়। ভূতনাথের পড়া হইতেছে কি না, গ্রাম্য শিক্ষক দেখিয়াও দেখেন না। আর তাহার সমবয়সী যাহারা,—তাহাদিগকে ক্রোড়ে করেন, চুম খান, একবারের যায়গায় দশবার পড়া বলিয়া দেন। আর ভূতনাথ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, নাসিকা

কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার ভাবে "ধাৎ ছোঁড়া, এটা মূর্খ হইবে" বলিয়া চলিয়া যান। তখন হইতেই গ্রামের লোকে টের পাইল, ভূতনাথ মূর্খ হইবে।

এই ভাবে পড়া শুনা চলিতে লাগিল। গ্রামেব ছেলেরা ইংরেজী তিন চারিখানা বহি সায় করিল, ভূতনাথও নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা করিল। তবে দোষের মধ্যে এই স্কুলের ডিপুটী হাকিম আসিলে সকলে যাহা পাবে না, সে তাহা কহিতে পারে, আব সকলের আগে অঙ্ক কষিয়া দেয়। সুতরাং ভূতনাথ মূর্খ আর তাহার সহপাঠিগণ পণ্ডিত। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই স্কুলে পড়িয়া পণ্ডিত হইতে লাগিল, কেবল ভুতনাথেরই মূর্খত্ব বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভূতনাথ গরীব। সুতরাং তাহার আর পড়া চলে না, সে কেতাব কিনিতে পারে না, স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে পাবে না। গ্রামে দশ ঘর অবস্থাপন্ন লোক আছে, জমীদার ধনকুবের জ্ঞাতিও আছেন, কিন্তু কেহ কিছু সাহায্য করে না। সাহায্যের মধ্যে ভূতব মা জ্ঞাতি বাড়ী রাঁধিয়া দুটী নিজে খায়, পাতে যাহা থাকে, ভূতো খায়। ভূতনাথের মা ম্রিয়মানা হইয়া কাহারো কাছে ভূতর মাহিয়ানা বলিয়া, কি কেতাবের দাম বলিয়া কিছু সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া আপত্তি করেন, "ও ছোঁড়া মূর্খ হইবে, ওর আর পড়িয়া দরকাব কি।"—ভূতর মা কাঁদিয়া ফিরিয়া আসেন।

ভূত এখন ছোট নয়, তের বৎসরের হইযাছে। লোকের চক্ষু দেখিযা হৃদয় বুঝিতে পারে। লোকের কথা বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে কতটুকু মধু কতটুকু নিম্বরস আছে বুঝিতে পারে। মায়ের কষ্ট—নিজের হীনভাব—বুঝিতে পারে। এক দিন বাটীর উঠানে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ও স্বর্গ পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল সব অন্ধকার। পৃথিবী অন্ধকার। দয়া মায়া স্নেহ সহানুভূতি কিছুই নাই। শূন্যে বিহগ, বনে শৃগাল, পথে কুকুর বিড়াল, মাঠে গরু মহিষ গাধা, গৃহে মানুষ, সকলই চিত্রপট, সকলই সমান। দেখিল সকলই বৃথা, সকলই—রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন! মনে বিরাগ জন্মিল,—ভাবিল পশু হইলাম না কেন, সকলই পশু হইল না কেন? পশু যদি মানুষের অধম হয়, তবে মানুষের এত ঝঞ্ঝাট কেন? টাকা নাই, কাপড় নাই, খাবার নাই তাই বলিয়া কি সংসারে মিষ্ট মুখও নাই। মিষ্ট কথার দাম নাই: উহা ত অকাতরে সকলকেই বিলাইতে পারা যায়—তবে লোকে তাহাতে কুণ্ঠিত কেন? কেতাবে পড়িয়াছি, "দীন দেখিয়া দান করিও"—কিন্তু সকলেই

ইহার বিপরীত আচরণ করে, যাহার আছে তাহাকেই আরো দেয়। লোকে যাহা কেতাবে লিখিবে পড়িবে, কার্য্যকালে তাহার বিপরীত করিবে এই কি তবে নিয়ম? তবে চুরি করিলে জেলে দেয় কেন? নিয়ম—নিয়মত কিছুই দেখিতেছি না। নিয়ম—তবে মানুষের নিয়ম বুঝি—নিষ্ঠুরতা, রূঢ় কথা, কৃপণতা। যদি কখন বড় হই, টাকা হয়, বড় লোক হই, বড় রাড়ীর বড় বাবুর ছবি যেমন একজন চিত্রকর আসিয়া আঁকিয়াছে—আমার ছবি আঁকিতে আসিলে বলিব "একটা ভালুক আঁকিয়া নীচে আমার নাম লিখিয়া রাখ নতুবা পয়সা দিব না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আজি পৌষ সংক্রান্তি—গ্রামে উৎসব। কার বাড়ী কতগুলি পীঠে হইবে, আপন আপন বাড়ীতে সকলে তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছে। বেলা নয় দশটা হইয়াছে। তবু কুয়াসায় জগত আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। ভূতনাথের মা আপন ক্ষুদ্র গৃহে সাত বৎসরের বালিকা কন্যা নীলাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া কান্দিতেছেন। নীলা বুঝিতে পারিয়াছে, যে মা মনোদুঃখে কান্দিতেছেন, বালিকা ক্ষুদ্রহস্তে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া ক্ষুদ্র কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছে।

"মা কান্দিও না, দাদা চাকরী করিতে শিখিলে আমাদের সুখ হইবে। দাদা পিঠা ভালবাসে না, আমিও ভালবাসি না। আজ পরবের দিন—যদি পিঠা না করিতে পারিলে দোষ হয়, দেবতারা রাগ করে, আমি না হয় ধূলীর পিঠা গড়িব, তুমি দেবতার নামে নিবেদন করিয়া দিও। দেবতারাত আর পিঠা খায় না,—দেবতারা বেজার হইবে না, আমাদের যা আছে তাই দেবতাকে দিব।—দাদা সে দিন রামায়ণ পড়িতে ছিল,—রামায়ণে লেখা আছে, রামচন্দ্র ধূলী দিয়া বাপের পিণ্ড দিয়াছিলেন।"

মাতা বলিতেছেন "না মা, সে জন্য কাঁদিতেছি না,—সে দিন তুই বলেছিলি মা দুধের স্বাদ যে কেমন মনে নাই"—তাই ও বাড়ীর বড় দিদির কাছে একটু দুধ চাহিয়াছিলাম, তিনি বলেছিলেন পৌষ পার্ব্বণের দিন তাঁর পিঠা করিয়া দিলে, দিবেন। তাই বড় আশা করিয়া আজ তাঁর কাছে

গিয়াছিলাম; দুধ ত দিলেনই না, উপরন্তু কত গাল দিলেন; বলিলেন, 'এত বেলায় কি বেড়াইতে আসিয়াছিস্, আর তোকে দরকার নাই, আর আমার বাড়ী কিছু চাইতে আসিলে এক কুল ছাই দিব,' তাই মনের দুঃখে কান্দিতেছি।" নীলা কিছু অপ্রস্তুত হইল, মায়ের দুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইল, কি করিবে, মার মুখপানে চাহিয়া পবিত্র জাহ্নবীর ধারা ছাড়িয়া দিল। কবিশ্রেষ্ঠ গৈরাও যথার্থই বলিয়াছেন,...

"শিশু দেহ পুণ্য তীর্থ;
মহা পূত তার অশ্রুনদী
পর দুঃখে উদ্বেলিত যবে।
ক্ষত শিরে দাও ঢালি নর!
যদি নীরোগ হইবে; ঐত
ঐত স্বর্গের দেবতা ঐত,
ঐত স্বর্গ মন্দাকিনী"

* * * * * * * * * *

পশ্চাতে পদ শব্দ হইল। মা, মেয়ে, ফিরিয়া চাহিল। সম্মুখে ভূতনাথ। ভূতনাথের মুখ শুষ্ক ও চিন্তিত। নীলা সহর্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদা কোথা গিয়াছিলে।" যে ভূতনাথ সমস্ত জগত আঁধার দেখিয়াছিল, মানব পাষাণময় দেখিয়াছিল, এখন সে সমস্ত জগত আলোকমালায় সজ্জিত দেখিল, মানবকে কুসুমদাম তুল্য দেখিল, মাতা ভগিনীর পবিত্র স্নেহপূর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় ক্ষণেকের জন্য শান্তিরসে পূর্ণ করিল। নয়নকোণে দুফোঁটা স্ফটিক ফুটিল। ধীরে নীলাকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইল, এবং মাকে মধুর-বচনে বলিল, "মা, শরত কাকা মকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতেঢাকা যাইতেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাব; এভাবে বাড়ীতে থাকিলে যথার্থই মূর্খ হইব, শুনি-য়াছি ঢাকায় অনেক বড় মানুষ আছে, চেষ্টা করিলে সেখানে থাকিয়া লেখা পড়া করিতে পারিব।"

ভূতনাথের মায়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তকাল চক্ষে আঁধার দেখি-লেন, পরে বলিলেন, "বাবা! দেশে, লোকে মারিতে দাঁড়াইলে কেহ চাহিয়া দেখে না, তাই বলি, বিদেশের লোকে তোমার খরচ যোগাইবে?" "চেষ্টা করিয়া দেখিব, সুবিধা না হয় চলিয়া আসিব।" "শরত কবে যাইবে," "পরশু প্রাতে।"

ভূতনাথের মা, চমকিয়া বলিলেন, "পরশুই, দুখানি কাপড়, তারও একখানি ধোপা বাড়ী, কি লয়ে যাবি,—হাতে একটি পয়সা নাই সঙ্গেই বা কি দিই?"

ভূতনাথ বলিল, "মা তোমার হাতের ও গলার কি গয়না বিশুবাবুদের বাড়ী আছে, তারই একখানি বাঁধা রাখিয়া কিছু টাকা আন, তুমি কিছু রাখ, আমায় কিছু দেও।"

ভূতনাথের মাতা বলিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হইত, গয়না তাঁর মায়ের কাছে রাখিয়াছি তিনি গঙ্গা স্নানে কলিকাতা গিয়াছেন, এখন আমার একটি হাতের আংটি আছে যদি তাই রাখিয়া কিছু আনিতে পারি।"

আজি একাদশী সুতরাং ভূতনাথের মাতার আহারের আয়োজন করিতে হইবে না এবং একাদশী বলিয়া আজ তাঁহাকে যে বাড়ী রাঁধিয়া দিতে হয়, তাঁহাদের বাড়ীতেও রাঁধিতে হইবে না, কেননা বিশুবাবুর পিতামহী বিশুবাবুর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, "ভূতর মা ছেলে বয়সে বিধবা হইয়াছে, তোরা তাকে একদশীর দিন রান্না করিতে দিস্ না।" বলা আবশ্যক, যে ভূতনাথের মা বিশুবাবুর বাড়ীর (অনরারি) সম্মানিতা পাচিকা। বিশুবাবু ধনকুবের জমীদার এবং ভূতনাথের জ্ঞাতি খুড়া। এখানে বলিয়া রাখা উচিত, বিশুবাবু বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

* * * * * * *

ভূতনাথ ও নীলার আজ নিমন্ত্রণ আছে। তাহারা নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলে ভূতনাথের মা আংটী লইয়া বিশুবাবুর বাটী চলিলেন; যাইবার কালে দুই বিন্দু অশ্রুপাত হইল।

অশ্রুপাত কেন হইল, মূল্যবান জিনিষ বলিয়া কি? তাহা নহে, ভূতনাথের মাতা ভূতনাথের জন্য বিনা অশ্রুপাতে, সহস্র সাম্রাজ্যত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু এই অঙ্গুরী তাহা হইতেও অধিক মূল্যবান। ইটী স্বামি-চিহ্ন, স্বামীর অঙ্গুলীতে চিরদিন ছিল, তাই যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, আমরণ রাখিবেন; মাঝে মাঝে দেখিবেন; স্বামীর দেবমূর্ত্তি মনে পড়িবে, আজ সেই চিহ্ন লুপ্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অঙ্গুরীতে এক খণ্ড হীরক সংলগ্ন ছিল, স্বামীর নিকট শুনিয়া ছিলেন উহার মুল্য একশত টাকার ন্যূন নহে। স্বামী অক্ষম লোক ছিলেন না, ভাল চাকরী করিতেন, গবর্ণমেণ্টের. কোন আইন বহির্ভূত প্রদেশের বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই হাতে ছিল। উপার্জ্জন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোপকারেই তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রামের অনেকেরই অবস্থা তিনিই ভাল করিয়া দিয়াছেন, নিজের জন্য অনেকগুলি জমীদারি বেনামিতে নিলামে কিনিয়া ছিলেন, অল্প হইলেও তাহার বার্ষিক আয় প্রায় সহস্র টাকা হইবে। দুর্ভাগ্যবশত বিশু বাবুর নামে ঐ সকল সম্পত্তি কেনা হয়। মনে করিয়াছিলেন নগদ সম্পত্তি না থাকিলেও, স্ত্রী পুত্র কষ্ট পাইবে না। কিন্তু তিনি সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিতে না আসিতেই বিশুবাবুর সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। বিশুবাবু সম্পত্তির লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সমস্ত বিষয় অস্বীকার করিয়া বসিলেন। এই সাংঘাতিক ব্যাপারে তাঁহার পরমায়ু নিঃশেষিত হইল; বিষাদের প্রবল যাতনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মনে করিয়াছিলেন জীবনের অবশিষ্টকাল স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরমাত্মীয় ও স্বজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে দেশে কাটাইবেন। বিধাতা তাহাতে বৈরী হইলেন। মৃত্যু সময়ে বিশুবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ, যাহা মনে ছিল, তাহাই করিয়াছ, কিন্তু আমার শেষ ভিক্ষা এই, আমার নিঃসহায় স্ত্রী পুত্র কন্যা যেন অনাহারে মারা যায় না।"

যাহা হউক ভূতনাথের মাতা অঙ্গুরীটি লইয়া বিশুবাবুর স্ত্রীর হাতে হাতে দিয়া কহিলেন, "সম্প্রতি এই জিনিষটি রাখিয়া আমাকে দশটি টাকা দাও; পরে যদি পারি, খালাস করিয়া লইব, নয় বিক্রী করিব।"

বিশুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ইহার এত দর কি হইবে?"

ভূতনাথের মা বলিলেন, "ইহাতে হীরা আছে, শুনিয়াছি, একশত টাকায় এই আঙ্গটী কেনা হইয়াছিল।" বিশুবাবুর স্ত্রী, পরীক্ষার জন্য দরজার কাচে দাগিয়া দেখিলেন, কাচ কাটিয়া গেল; পরে আপন অঙ্গুলীতে পরিধান করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি রাখিব," এই বলিয়া পাঁচটী টাকা হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার হাতে আর টাকা নাই, আর

কিছু পরে তিনি (বিশুবাবু) আসিলে, আপনাকে আর পাঁচ টাকা, দিয়া আসিব।”

ভূতনাথের মা বাড়ী আসিয়া দেখে, ভুতনাথ, নীলা খাইয়া বাড়ী আসিয়াছে। ভূতনাথ বলিল, “মা আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া আট আনা দক্ষিণা পাইয়াছি। ইহাতেই আমার হইবে, আঙ্গটীর জন্য তোমার চক্ষের জল পড়িয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি; এখন আঙ্গটি কোথাও রাখিবার দরকার নাই।” তাহার মা বলিলেন, “আমি ও বাড়ীর বড় বৌর কাছে আঙ্গটি রাখিয়া পাঁচটী টাকা আনিয়াছি।” ভুতনাথ বলিল, “টাকা দিয়া আঙ্গটী লইয়া আসুন।”

এমন সময় বিশুবাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, “আঙ্গটী আমি রাখিব না, আমার টাকা পাঁচটী দিন।” ভুতনাথের মা একটু খুসী হইয়াই টাকা পাঁচটী তাঁর হাতে দিলেন, তিনি টাকা লইয়াই চলিয়া গেলেন।

ভূতনাথের মা, তাহার পাছে পাছে যাইয়া বলিলেন, “আমার আঙ্গটী” ?

বিশুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, “কার আঙ্গটী, ও আমাদের আঙ্গটী অনেক দিন হইল চোরা গিয়াছিল, আঙ্গটী নিতে হয় ত তাঁর কাছে যান, তিনিত আপনাকে পুলিশের হাতেই দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি কেবল বলিয়া কহিয়া বারণ করিয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া ভুতনাথের মা, মাথায় হাত দিয়া রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়িলেন। একটা কথা তাঁহার মুখে ফুটিল না। কিছুকাল পরে একটি মাত্র অস্ফুট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

বিশুবাবুর স্ত্রী আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে কেবল নীলা মায়ের সঙ্গে ছিল। নীলা মায়ের ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া “দাদা মা মলো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ভুতনাথ বাড়ীতে ছিল দৌড়িয়া আসিয়া কান্দিতে লাগিল।

তাহাদের উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুনিয়া পাড়ার দুটী তিনটী স্ত্রীলোক ও পুরুষ মানুষ আসিল; ধরা ধরি করিয়া ভূতনাথের মাকে বাড়ীতে আনিয়া শয়ন করাইয়া, কেহ বলিতে লাগিল, ভূতে পাইয়াছে, কেহ বলিতে লাগিল, “মৃগী” হইয়াছে।” গাঁয়ে এক মূর্খ কবিরাজ ছিল, সে স্থির করিল, “প্রেমোন্মাদ” হইয়াছে এবং তদনুসারে কিছু নস্য ও কিছু বটিকাও দিল।

নস্য ও বটিকার প্রয়োজন হইল না। ভূতনাথের মা যথার্থ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন। জাগিয়া কিছু কান্দিয়া মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, "যথা সর্ব্বস্ব যে লইয়া আমাকে ভিখারিণী করিল, সে অঙ্গুরীটি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাকে চোর অপবাদ দিবে আশ্চর্য্য কি?"

ভূতনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা তোমার কি হইয়াছিল?" পাছে ছেলের মনোকষ্ট হয় এজন্য গোপন করিয়া বলিলেন, "একাদশীর উপবাস লাগিয়াছিল, তাই ঘুরিয়া পড়িয়াছিলাম।" ভূতনাথ আর কথা কহিয়া মাতাকে বিরক্ত করিল না।

* * * * * * *

পর দিন, শেষ রজনীতে ভূতনাথ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিল। স্বপ্ন দেখিতে ছিল, —সে এক নূতন দেশে গিয়াছে, সেখানে ক্ষুদ্র পুকুর নাই, বড় নদী, কুটীর নাই, শাদা শাদা বড় বড় ইটের বাড়ী। নদীর স্রোত চলিতেছে, পথে মানুষের স্রোত চলিতেছে, পিপাসা লাগিল, জল খাইতে নদীতে নামিল, নদী কাচের ন্যায় কঠিন হইল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঠিয়া এক বাড়ী গেল, কত লোক হাসিতেছে আমোদ করিতেছে;—জল চাহিলে, সকলের মুখ বিষণ্ণ হইল, নিকটে যাইয়া দেখিল উহারা পাষাণ হইয়াছে। এইরূপ ভূতনাথের স্পর্শে সকলই পাষাণ হইতে লাগিল। পিপাসায় দগ্ধ হৃদয় হইয়া প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, হঠাৎ কে করুণস্বরে বলিল, ভূতনাথ আমি জল আনিয়াছি, চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ীর মূর্ত্তি,—জননী। ভূতনাথের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইল, কত আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিল একি স্বপ্ন? অমনি জাগরিত হইল। প্রাণ সুস্থ হইল; প্রদীপ জ্বালিয়া অনিমিষ লোচনে মায়ের স্নেহপুর্ণ মুখ দেখিতে লাগিল। "আজ ঢাকা যাইব—কত দিন আর এই মুখ দেখিব না"—এই ভাবিয়া চিন্তার সহিত দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্র সূর্য্য সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী ; কি ধনী কি নির্ধন সকলের বাড়ীতেই সমভাবে উদয়াস্ত হয়। দিনও সেইরূপ, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে না। বিশু বাবুর দিনও যাইতেছে, ভূতনাথের মায়ের দিনও যাইতেছে। তবে বিশু পরের মাথায় বসিয়া, দুধ ভাত খাইয়া রাত্রি প্রভাত করিতেছে, আর ভূতনাথের মা দিনান্তে আধ পেটা খাইয়া দিন রাত্র কাটাই-তেছেন।

এক মাস দু মাস করিয়া ক্রমে বহু মাস কাটিয়া গেল। ভূতনাথ ঢাকা হইতে বাড়ী আসে না, তবে মাঝে মাঝে পত্র লেখে।

ভূতনাথের বাড়ী হইতে যাওয়া অবধি নীলা এক দিনের তরেও সুস্থ নহে, আজ জ্বর, কাল পেটের পীড়া লাগিয়াই আছে। নীলা ভূতনাথকে বড় ভাল বাসে। ভূতনাথের চিঠি আসিলে প্রফুল্ল হয় ; তাহার পরেও দু চারি দিন বেশ থাকে, আবার পীড়িতা হয়। বাল্য প্রেমের ভালবাসার কথা অনেক শুনিয়াছি। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার কথাও অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু নীলার ভালবাসার মত ভালবাসার কথা কোথাও শুনি নাই। নীলা জানিত, মা দাদা আর সে, এ তিন জনের এক প্রাণ। একজনের অভাবে আর, দুইজন বাঁচিতে পারে না। তাই দাদার কথা সদাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার আর অসুখ সারে না। এক দিন ডাকিয়া বলিল "মা আমি বুঝি বাঁচিব না ; দাদাকে আর দশ পনর দিনের মধ্যে না দেখিলে প্রাণটা আমার ছট ফট করে বেরিয়ে যাবে।" ভূতনাথের মা বলিলেন, "বালাই, এইত তোমার দাদা আশ্বিন মাসেই আস্‌বে।"

নীলা বলিল, "মা চল না, দাদার কাছে যাই, ঢাকায় দাদা তুমি আমি তিনজনই একত্রে থাকব।"

এমন সময়ে একটী দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার সময় ঘরের বারান্দায় বসিয়া, মাতা ও কন্যা কথা কহিতেছিলেন,---নীলা ভীতা হইয়া মায়ের পৃষ্ঠ ধরিয়া বসিল, মাও শিহরিয়া উঠিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ বলিল "বিনোদ"----বিনোদ কথাটি পরিচিত স্বরে উচ্চারিত হইল।

বিনোদ ভূতনাথের মায়ের নাম ; এখন হইতে—আমিও বিনোদকে বিনোদই বলিব।

বিনোদ বলিল,—"কে ভূবন দাদা, তুমি না যুদ্ধে গিয়া ছিলে, এস; কবে এসেচো,"—এই বলিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধে নহে, মরিতে।"

"বালাই! কি দুঃখে মরিবে?"

"তুমি কি তা জান না?"

"আমি মরি নাই কেন?"

"তুমি নিষ্ঠুর।"

"তুমি মূর্খ।"

"তুমি মূর্খ" বিনোদ এই কথা বলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল,—আর বলিতে লাগিল, "দেখ আমি স্ত্রীলোক হইয়াও কত সহিতে পারি, মরাত সহজ কথা, মরিব কেন? সহিব। দেখিব মানুষের শরীরে কত সহিতে পারে, সহাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে সহিব না কেন? কষ্টের সীমা থাকিতে পারে, পুরস্কারও থাকিতে পারে, আমি সেই সীমা অপেক্ষা করিতেছি।"

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল——

"আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

"প্রায়।"

"সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও।"

"কি সম্পূর্ণ?—সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়াছি।"

"শেষ, একটি ভিক্ষা।"

"কি বল?"

"তোমার চিহ্ন স্বরূপ নীলাকে আমায় দাও?"

"বিবাহ করিবে?"

"দিবে কি না, তাই বল?"

"বার বৎসর বয়েস হইলে দিব।"

"তবে দিবে ঠিক?"

"ঠিক।"

"তবে শুন,—নীলাকে বিবাহ করিবার—আমার অধিকার নাই। আমাদের দেশে বিবাহ নাই, পীড়া নাই, শোক নাই, সেখানে শান্তি, অর্চ্চনা,

ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ সব—এক, নর নারী ভেদ নাই, ইচ্ছা নাই, অজ্ঞান নাই, আঁধার নাই—নীলা যাবে ত?"

এই বলিয়া দীর্ঘাকার পুরুষ হাত বাড়াইল। নীলা ভয়ে মাকে যাপটিয়া ধরিল। বিনোদ চাহিয়া দেখিল দীর্ঘাকার পুরুষের মুখ শুষ্ক, নয়ন শুষ্ক ও ঘূর্ণিত; তাহার শরীরে যে চাঁদের আলো পড়িয়াছে, কাচে আবরিত তাহাতে আলোকের মত তীব্র জ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে; বিনোদ ভীতি বিহ্বল চিত্তে ডাকিল, "ভুবন," "ভুবন" "ভুবন।" ভুবন আর কথা কহিল না, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদ অবাক্ হইলেন; ভাবিলেন, "একি—এই কি সেই ভুবন,—একি মানুষ!"

* * * * * * *

সেই রজনীতে বিনোদ শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, "ভুবন প্রলয় অগ্নিকুণ্ডে স্থিরভাবে বসিয়া হাঁসিতেছে; তাহার ক্রোড়ে বিনোদ বসিয়া রহিয়াছে"—বিনোদ একবার আপনার দিকে, আর বার অগ্নি নিমজ্জিতা বিনোদের দিকে চাহিলেন; তাঁহার আপনার অস্তিত্বে ভ্রম হইল; আবার চাহিয়া দেখিলেন, এ বিনোদ বিধবা নহে, কুমারী, জানিয়া ভয়ে গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। নীলা তখন কাঁপিতে ছিল; বলিল "মা আমার গায়ে আর এক খানি লেপ চাপিয়া দাও, বড় জ্বর আসিয়াছে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

ভুবন কে? এই প্রশ্ন পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে, সুতরাং ভুবনের পরিচয় দেওয়া এ স্থলে অসঙ্গত না হইতে পারে। যদি কেহ অসঙ্গত মনে করেন তিনি এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টী বাদ দিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। তাহাতেও গ্রন্থের রস ভঙ্গ হইবে না।

বিনোদের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন হইতে বিনোদ ভুবনকে ভাল বাসে, ভুবন বিনোদকে ভাল বাসে,—এই ভালবাসা ক্রমে বয়েসের সঙ্গে পাকিয়া উঠে। বিনোদের তের বৎসর বয়স কালে বিনোদে ভুবনে গোপনে চুক্তি হইয়াছিল, উহারা কেহই অন্যকে বিবাহ করিবে না। ভুবন বেটা ছেলে সুতরাং চুক্তি রক্ষা করিতে পারিল। কিন্তু বিনোদ তাহা পারিল না।

বিনোদের পিতা মাতা ছিল না, মামা মামি, ভাল চাকুরে দেখিয়া অন্য স্থানে বিনোদকে বল পূর্ব্বক বিবাহ দিল। সেই অবধি পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। বিনোদ বিবাহের রাতে মামার অহিফেনের কৌটা হইতে অহিফেন সেবন করিয়াছিল—ভুবন ডাক্তারী শিখিত, সুতরাং ভুবন উপস্থিত ছিল বলিয়া, বিনোদ মরিতে পারে নাই।

বিবাহ হইয়া গেলে এক বৎসরের মধ্যে, বিনোদ ভুবনকে ভুলিবার বহু চেষ্টা করিল, এবং দশ বার বৎসরের মধ্যে তাহার হৃদয়ে যে ভুবনের ছবি অঙ্কিত ছিল, তাহার বর্ণ একবারে উঠাইয়া ফেলিল কেবল অস্ফুট দাগ মাত্র রহিয়া গেল। বিনোদ এ দাগ তুলিবার জন্যও কম চেষ্টা করেন নাই, তাহা করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভুবন, বিনোদের বিবাহ হইলেও আশা ছাড়েন নাই। একদিন বিনোদকে জনশূন্য স্থানে পাইয়া বলিয়াছিলেন, 'বিনোদ, দুই স্ত্রীর কি আমাদের দেশে এক স্বামী থাকে না, এক স্ত্রীর দুই স্বামীও ত সে হিসাবে থাকিতে পারে,—ইহ জীবনে আমি আর বিবাঁহ করিব না, তুমি শুদ্ধ মনে ভাবিও, আমি তোমার স্বামী, ইহা বই আর পার্থিব কোন সুখের আশা আমি তোমার নিকট করি না।"

বিনোদ নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন, "দেখ ভুবন, তোমার এই যুক্তি, এই পবিত্র প্রণয়—বিভীষিকা; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম কলুষিত করিয়াছে। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াছি; তুমিও আমাকে ভুলিয়া যাও।" ভুবন কাঁদিয়া বলিলেন,—"আমি ভুলিতে পারিব না।"

বিনোদ অধিকতর রুক্ষভাবে বলিলেন, "মরিবার পথ অপ্রশস্ত নহে, তুমি মর, তাহা হইলে আমার পাপের একটি সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে।"

ভুবন প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বিনোদ তবে যাই, তোমার সহিত আর একবার দেখা করিব,—কিন্তু এ শরীরে নহে।"

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ভুবন—ডাক্তার হইয়া কি রসদের কর্ম্মকারক হইয়া, ঠিক্ বলিতে পারি না, মিসরে সমরে গমন করেন।